দেবারতি মুখোপাধ্যায়

রুদ্র-প্রিয়ম সিরিজ

গ্লা নি র্ভ ব তি ভা র ত

রুদ্র-প্রিয়ম সিরিজ

গ্লানির্ভবতি ভারত

দেবারতি মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন

২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

অষ্টাদশ শতকের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ বাঙালি,
অসামান্য শ্রুতিধর ও আসমুদ্র হিমাচলখ্যাত
শতায়ু পণ্ডিত **শ্রী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন**-এর
স্মৃতির উদ্দেশে।
না। একবিংশ শতকের বাঙালি আপনাকে ভোলেনি।
বিস্মৃত হয়নি আপনার অসাধারণ মেধা,
যুগের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা যুক্তি ও মননকে।
'গ্লানির্ভবতি ভারত' আপনাকে ভুলতে দেবে না, এই আশা রাখি।
শতকোটি প্রণাম।।

সূচিপত্র

৩১

৩২

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

৫১

৫২

৫৩

৫৪

৫৫

৫৬

৫৭

৫৮

৫৯

৬০

১

১৫ই জানুয়ারি, ত্রিবেণী

ঘড়ির বড় কাঁটাটা সবেমাত্র নয়ের ঘর পেরিয়েছে। তবু এরই মধ্যে গঙ্গার ধার দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সরু পাকা রাস্তাটা আজ শুনশান। শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে বলেই বোধ হয় বেশ কিছুক্ষণ অন্তর দু-একটা বাইক ছাড়া আর তেমন কারুর দেখা নেই।

গঙ্গার ধারে বেশ কিছু পানবিড়িসিগারেটের দোকান। সেগুলোরও ঝাঁপ বন্ধ। অন্যদিন ঘাটের সিঁড়িগুলোতে বসে গুলতানি করে কিছু ফচকে ছেলে। আজ কেন কে জানে, তারাও অনুপস্থিত।

খুব নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকলে নিজেরও শব্দ করে কিছু করার ইচ্ছেটা চলে যায়। শিবনাথ তাই বেশ সাবধানে বলতে গেলে একেবারে নিঃশব্দে কম্পিউটার সেটগুলোর ওপর তোয়ালে ঢাকা দিচ্ছিল। তারগুলো খুলে ভালভাবে মুছে পরম মমতায় জড়িয়ে রেখে অফ করছিল সুইচ।

এই সবকিছু ওর তিলতিল কষ্ট দিয়ে গড়া, যত্ন তো থাকবেই।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীবার বলে দোকান বন্ধ থাকবে। অন্যান্য বুধবার শিবনাথের মেজাজ বেশ প্রসন্ন থাকে। তার মেয়ের বয়স সবে সাড়ে চারমাস, সপ্তাহে এই একটা দিনই মেয়েকে সে সারাদিন ধরে দেখতে পায়। যখন হাসপাতাল থেকে ন্যাকড়া জড়িয়ে নিয়ে এসেছিল, তখন সে অ্যাত্তটুকুন, যেন চোখ বোজা একটা নরম বিড়ালছানা।

তাকে প্রথম দেখে শিবনাথ কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। নিজের গায়ে নিজেই চিমটি কাটছিল বারবার। পরখ করে নিতে চাইছিল, স্বপ্ন দেখছে কিনা। ওর বউ আরতি কাণ্ড দেখে যতই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিলিয়ে হাসুক, শিবনাথের ঘোর কাটছিল না কিছুতেই।

ওর ভাগ্যে এত সুখও লেখা ছিল? যে প্রচণ্ড টালমাটালের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল ওর জীবনটা, যে ভীষণ প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুঝতে হয়েছে শৈশবে, সেইসব দিনগুলোর পর যে এমন সোনালি মুহূর্ত অপেক্ষা করছে, তা কি ও কখনো ভাবতে পেরেছিল? তখন তো প্রতি মুহূর্ত কাটত ভয়ে, অস্থির আশঙ্কায়। এই বুঝি কেউ চিনে ফেলল ওকে। এই বুঝি কেউ আবার টেনে হিঁচড়ে ওকে নিয়ে যেতে লাগল সেই নরক কুণ্ডে।

শিবনাথের নরম বিড়ালছানার মতো সেই মেয়ে এখন দিব্যি এদিক ওদিক তাকায়, ফোকলা দাঁতে লাল টুকটুকে মাড়ি বের করে হেসে দেয়। আর সেই হাসি দেখে শিবনাথের মন খারাপ হয়ে যায়।

মনে হয়, মেয়ের একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠাটা ও দেখতেই পাচ্ছে না।

তাই বৃহস্পতিবারটা মেয়ের বিছানার সঙ্গে প্রায় লেপটে বসে থাকে ও। হিসি করে ভিজিয়ে দেওয়া কাঁথা পালটানো থেকে শুরু করে দুধ গুলে বোতলে করে খাওয়ানো,

শীতের বেলায় সর্ষের তেল দলাইমলাই করে গায়ে মাখানো, কিচ্ছু বাদ দেয় না। কখনো কখনো আরতি বিরক্ত হয়ে যায়। কিন্তু শিবনাথ পাত্তা দেয়না। ছয়দিনের না পাওয়াটাকে সে একদিনে উশুল করে নিতে চায়।

কিন্তু আজ বুধবার হওয়া সত্ত্বেও শিবনাথের মনটা খিঁচিয়ে রয়েছে। সারাদিন রোজগার প্রায় হয়নি বললেই চলে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা চলছে, যে গুটিকয় বাচ্চা আসত, তারাও গেম খেলতে আসছেনা। কিন্তু কলেজের যে দু-একটা ছেলেমেয়ে সন্ধের দিকে আসত, তারা তো আসতে পারত!

লাইট পাখা অফ করে দরজায় তালা মেরে শাটার নামাতে নামাতে নিজের মনেই শিবনাথ গজগজ করে। সব দোষ ওই ফোরজি প্ল্যানওয়ালাদের। যবে থেকে সস্তায় ইন্টারনেটের প্ল্যান বিক্রি শুরু হয়েছে, তবে থেকে তার সাইবার ক্যাফের ব্যবসায় ভাঁটা পড়েছে।

বারো বছর হতে চলল, ধারদেনা করে এই গঙ্গার ধারের রাস্তায় ও এই দোকানটা খুলেছিল। তখন সবাই বারণ করেছিল। বলেছিল, পয়সা যখন ঢালছেই, আরেকটু বেশি ইনভেস্ট করে বাজারের দিকে খুলতে। কম্পিউটারের দোকান, একটু জমজমাট এলাকায় না থাকলে হয়? এই দিকটায় কে আসবে?

শিবনাথের সেই যুক্তি মনে ধরলেও কিছু করার ছিল না। থাকার বলতে তখন ওর ছিল শুধুমাত্র একটা এস টি ডি বুথ। বাবা মারা যাওয়ার আগে খুলেছিলেন। বাবা ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এমন কিছু নেই যে করেননি। ট্রেনে হকারি থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি সাবান বিক্রি। বলতে গেলে মুখে রক্ত তুলে সংসার চালিয়েছেন। এক মুহূর্তের জন্য শিবনাথকে বুঝতে দেননি যে ও বাবা-মায়ের নিজের সন্তান নয়। নিঃসন্তান দম্পতির স্নেহবুভুক্ষ হৃদয় যেন শিবনাথকে ভালোবাসায় মুড়ে রেখেছিল প্রতিটা দিন।

অনেক রকম ব্যবসা করে একেবারে শেষদিকে সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে বাবা শুরু করেছিলেন ওই এস টি ডি বুথ। সেই বুথ বেশ ভালো চলত। তরুণ শিবনাথ বসত। কখনো কখনো বাবাও।

কিন্তু, কয়েকবছর পর মোবাইল ফোন আসার পর ব্যবসা ধুঁকতে শুরু করল। সারাদিনে একটা টাকাও রোজগার হয় না। পেটটা তো চালাতে হবে। ততদিনে বাবা চলে গিয়েছেন।

শিবনাথ তখন অনেক ভেবেচিন্তে সেই বুথ বিক্রি করে দিয়েছিল। সেই টাকাটুকুই তখন ওর পুঁজি।

ত্রিবেণী স্টেশন রোড বা বাজার এলাকায় আগুন দাম, ওখানে দোকানঘর ভাড়া নেওয়ার ক্ষমতা ওর ছিল না। শুধু যে দোকানঘর ভাড়ার মোটা সেলামি, তা তো নয়, কম্পিউটার, চেয়ার-টেবিল সবই কিনতে হয়েছিল।

তা হরির কৃপায় ওর সেই পরিশ্রম তখন বিফলে যায়নি। মাসছয়েকের মধ্যেই ওর এই 'শ্রীহরি সাইবার ক্যাফে' রমরমিয়ে চলতে শুরু করেছিল। গঙ্গার ধারেই ত্রিবেণীর তিনটে সরকারি স্কুল, এছাড়া অনেকগুলো ছোটবড় কোচিং ক্লাস। সেখানকার ছেলেপুলে হুড়মুড়িয়ে ভিড় জমাতে আরম্ভ করেছিল। বাজারের দিকে তখন দুটো সাইবার ক্যাফে ছিল, শিবনাথ ইচ্ছে করেই সেই দুটোর থেকে ঘণ্টাপিছু গেম বা ইন্টারনেট সার্ফিং এর খরচ কিছুটা কম রেখেছিল। আর তাতেই বাজিমাত। বছরদুয়েকের মধ্যেই শিবনাথের ক্যাফেতে তিনটে থেকে বেড়ে হয়েছিল দশটা কম্পিউটার। রাখতে হয়েছিল একটা পাড়ার ছেলেকেও। শিবনাথ তখন শুধু ক্যাশে বসে থাকত। কম্পিউটার খুলে দেওয়া

থেকে শুরু করে সময় পেরিয়ে গেলেই জোর করে খেলায় তন্ময় হয়ে দেওয়া ছেলেটাকে উঠিয়ে দেওয়ার মতো কাজগুলো ওই ছেলেটাই করত। এই দোকান থেকেই বাড়ি মেরামত, বিয়ে সব ধীরে ধীরে সেরে ফেলেছিল শিবনাথ।

কিন্তু ব্যবসায় মন্দা এসেছে বছরদুই হল। চারদিকে ফোরজি প্ল্যানের বাড়বাড়ন্তে এখন আর ছেলেমেয়েদের ক্যাফেতে গেম খেলতে আসার বিশেষ দরকার হয়না। নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে ফোনেই তা দিব্যি খেলা যায়। ইন্টারনেট সার্ফিং থেকে শুরু করে বইপত্র, সোশ্যাল মিডিয়া সব চাহিদাই মেটায় ফোন। দৈবাৎ চাকরির পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করা কোনো ছাত্র বা ছাত্রী শিবনাথের সাইবার ক্যাফেতে আসে প্রিন্ট আউট নেওয়ার জন্য। কিংবা এখনকার প্রযুক্তিতে একেবারেই অস্বচ্ছন্দ কোনো বয়স্ক ব্যক্তি ট্রেন বা প্লেনের টিকিট কাটতে আসেন।

বাজারের সাইবার ক্যাফেদুটো উঠে সেখানে এখন গেম পার্লার হয়েছে। কিন্তু ভারী ভারী গেম খেলার জন্য শিবনাথকে নিজের কম্পিউটারের অনেক কিছু পালটাতে হবে। কিনতে হবে প্লে-স্টেশন। এখন অত পয়সা তার নেই।

শিবনাথ ছেলেটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। নিজেই এখন পুরো ক্যাফেটা দেখে।

আজকের দিনটা একেবারেই মড়া। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ন'টা। একটা খদ্দেরও আসেনি শিবনাথের সাইবার ক্যাফেতে। গোমড়া মুখে দোকানের একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখা স্কুটিতে চাবি ঘোরায় শিবনাথ।

এভাবে আর কদ্দিন চলবে? বাচ্চা হওয়ার পর একলাফে সংসারখরচ যেন একশো গুণ বেড়ে গিয়েছে। আরতির সঙ্গেও সারাক্ষণ খিটিমিটি।

শালা একটার পর একটা ব্যবসা কষ্ট করে দাঁড় করাচ্ছে, কয়েকবছর পরই সেগুলোয় লাল বাতি জ্বলে যাচ্ছে। এইভাবে কাঁহাতক চলা যায়?

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে দোকানের চাবিটা পকেটে ঢুকিয়ে স্কুটিতে চেপে বসল শিবনাথ। দোকানের গায়েই গঙ্গার এক পুরোনো ঘাট। সেখান থেকে হু হু করে হাওয়া আসছে।

ত্রিবেণী বহু প্রাচীন জনপদ। এক কালে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, এই তিন নদী এখানে চুলের বেণীর মতো মিলেমিশে গিয়েছিল। তাই ত্রিবেণী। এখন অবশ্য সেই যমুনাও নেই, সরস্বতী শুকিয়ে খালের চেয়েও সরু। শুধু মা গঙ্গাই নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চলেছেন।

স্কুটিতে স্টার্ট দিয়ে বেরোতে যাবে, হঠাৎ পাশে যেন ভূতের মতোই উদয় হল একটা মানুষ। পরনে কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। মাথা থেকে পেট অবধি চাদর জড়ানো।

কাছেপিঠে আর কোনো দোকান নেই। শিবনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। লোকটা কি ক্যাফেতে কোনো প্রিন্ট আউট নিতে এসেছে? দেরি হলেও তাহলে ও আবার দোকানের ঝাঁপ খুলবে। অন্তত বউনিটা তো হবে।

কাছাকাছি আসতে শিবনাথ বলল, ”তুমি! এত রাতে? কী ব্যাপার?”

শিবনাথ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। কারণ সে বিস্ফারিত চোখে দেখল, লোকটার চাদরের তলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা ধাতব লম্বা কিছু।

শিবনাথ আত্মরক্ষার আগেই প্রচণ্ড আঘাতে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ‘আঁক’ করে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

তার স্কুটিটার ইঞ্জিন তখনো চালু। স্কুটির পেছনের চাকার ঠিক পাশে পড়ে থাকা তার পা দুটো কাটামাছের মতো লটপট করতে লাগল।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে কিনা বুঝতে। নিঃসন্দেহ হয়ে চারপাশ দেখল। মিনিটদুয়েক পর নীচে পড়ে থাকা শিবনাথের পকেট থেকে হাতড়ে হাতড়ে বের করল একটা চাবি। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ‘শ্রীহরি সাইবার ক্যাফে’-র দিকে।

লোকটা বেরিয়ে এল প্রায় দশমিনিট পরে। ধীরেসুস্থে শাটার নামাল। তারপর মার্জারপদে চলে গেল গঙ্গার জনহীন ঘাটের দিকে।

ঘাটে একখানা ছোট নৌকো নোঙর করা ছিল। বাতাসে সেটা কাঁপছিল তিরতির করে। লোকটা সন্তর্পণে নৌকোটায় উঠে বসে দাঁড় বইতে শুরু করল।

কালো জলে শব্দ হতে লাগল, ছপছপ।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নৌকোটাকে আর দেখা গেল না। শুধু ঘাট লাগোয়া নদীর জলের মৃদু কম্পন বোঝা যেতে লাগল।

২

সারা রাতের ঘুম যতই গভীর হোক, ভোরবেলা ঘণ্টাখানেকের যে ঘুমটা হয়, তার কোনো তুলনা হয় না। পাশেই নদী। ঠান্ডা হাওয়া ভেসে আসে। সেই আমেজে এই গরমেও একটা আলগা চাদর আলতো করে গায়ে জড়িয়ে নিতে হয়।

ও বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমের মধ্যে একটা ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন দেখছিল। দেখছিল, ও আর ক্ষমা বেড়াতে গিয়েছে দূরের এক পাহাড়ে।

পাহাড়টা কোথাকার, তা ঠিক বুঝতে পারছে না, তবে উঁচু নিচু টিলা দেখে মনে হচ্ছে ছোটনাগপুর মালভূমির দিকে কোথাও। লাল রঙের পথ, এদিক ওদিক কিছু গাছ ছড়ানো ছিটানো।

ক্ষমা আর চলতে পারছে না। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে, ”আর পারব না গো মাসি, খুব কষ্ট হচ্ছে! ওই দ্যাখো, আমার মা বসে পড়েছে।”

ও তাড়া দিচ্ছে, ”এইটুকুতেই হাঁপিয়ে গেলি? তোদের বয়সে আমরা কত ছোটাছুটি করতাম! আরেকটু চল। ওই যে, ওই দূরের লম্বা গাছটা ...!”

ক্ষমা চোখ বড়ো বড়ো করে বলছে, ‘এখনো অতদূর?’

ও বলছে, ”কোথায় অতদূর? আয় না, গল্প করতে করতে হাঁটি। আচ্ছা, তোর ওই কবিতাটা মনে আছে? আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা?’

‘হ্যাঁ’ ক্ষমা হাঁটতে হাঁটতে বলতে আরম্ভ করল।

‘আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা,

দেবদারুর কুঞ্জে ধেনু চরায় রাখালেরা।

কোথা হতে চৈত্রমাসে হাঁসের শ্রেণি উড়ে আসে,

অঘ্রাণেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোথা

আমরা কিছুই জানিনে কো সেই সুদুরের কথা।’

‘বাহ!’ ও বলল, ‘দেখলি, কবিতা বলতে বলতে কেমন গাছটার কাছে চলে এলাম।’

ক্ষমা দাঁত বের করে বলল, ‘তাই তো!’

একটানা একটা কর্কশ শব্দে ওর ঘুমটা ভেঙে গেল।

স্বপ্নটা বুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেল কোথায়। ঘুমের ঘোরটা কাটতেই ও ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর খাটের লাগোয়া টেবিলের ওপর রাখা মোবাইলটা নিয়ে রিসিভ করল।

—হ্যালো?

—হ্যালো, আপনি কি শ্রীরামপুরের অ্যাডিশনাল এস পি রুদ্রাণী সিংহরায় বলছেন?

রুদ্র একটা হাই তুলল। জড়ানো কণ্ঠে বলল, ”বলছি।”

—গুড মর্নিং ম্যাডাম। আমি চন্দন বলছি। চন্দন শাসমল। হুগলী ডি এম অফিসের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট।

—বলুন।

—ডি এম আপনার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাইছেন। একটু কনফিডেনসিয়াল। আপনি কি আজ একবার ডি এম অফিসে আসতে পারবেন? আপনার বাংলোয় অফিসরুমে ফোন করছি, বেজে বেজে কেটে গেল। তাই এখানেই করলাম।”

রুদ্রর ঘুমের রেশটা কেটে গেল। জেলাশাসক ওর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, গোটা জেলার প্রশাসনিক প্রধান। ডেকে পাঠাতেই পারেন। কিন্তু এইভাবে টেলিফোনে কেন? অফিশিয়াল চিঠি কই?

চন্দন শাসমল বোধ হয় ওর মনের কথা বুঝে ফেলল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ”আপনার স্যার মানে শ্রীরামপুরের এস পি সাহেবও থাকবেন মিটিং এ। চাইলে আপনি একবার কথা বলে নিতে পারেন।”

রুদ্র বলল, ”না ঠিক আছে। কখন যাব?”

”ঠিক দশটা।”

চন্দন শাসমল ফোন কেটে দেওয়ার পর রুদ্র ঘড়ি দেখল। সবে পৌনে সাতটা। আরও আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়াই যায়।

ও আবার শুয়ে পড়ার তোড়জোড় করছিল, কিন্তু মোবাইলটা আবার বেজে উঠল।

ফোন অন করতেই প্রিয়মের গলা শুনতে পেল।

”বেরিয়ে পড়েছি।”

”ওমা!” রুদ্র অবাক, ”এত তাড়াতাড়ি?”

প্রিয়ম বলল, ”মা তোমার জন্য অনেক মিষ্টি ভরে দিয়েছে। যা গরম পড়েছে, যদি নষ্ট হয়ে যায়? সকাল সকাল চলে যাওয়াই ভালো।”

”সে ভালোই করেছ। রাস্তাও ফাঁকা থাকবে।”

প্রিয়ম বলল, ”না আজ আর গাড়ি নিয়ে বেরোইনি। ভাবলাম একটু অন্যভাবে ফিরি। বাড়ি থেকে পেরিয়ে জেটিতে চলে এলাম। কল্যাণী থেকে গঙ্গার ওপারে বাঁশবেড়িয়া যাওয়ার স্টিমার ছাড়ছে। উঠে পড়লাম। আহ! নদীতে কি সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে!”

”তারপর? ওখান থেকে কী করবে?”

”কেন, বাঁশবেড়িয়া থেকে একটা অটো করে ব্যান্ডেল স্টেশন। আর সেখান থেকে ট্রেনে চেপে আমার বউয়ের কাছে। যাওয়ার সময় মাটন নিয়ে যাব। মল্লিকাদি’কে জমিয়ে পাঁঠার ঝোল করতে বলব।” প্রিয়ম হাসল।

রুদ্র আবার একটা হাইতুলে বলল, ”বাবা! লোকে ঘুরিয়ে নাক দেখায় শুনেছিলাম, এই প্রথম সেটা কাউকে করতে দেখলাম। যাইহোক, মাটন আনবে আনো, কিন্তু আমাকে বেরোতে হবে।”

”কেন? আজ তো ছুটি।”

”কিসের ছুটি?” রুদ্র ভ্রূ কুঁচকল।

”আজ তো শনিবার।”

রুদ্র হাসল, ”এসেনশিয়াল সার্ভিসে আবার শনিবার! এ কি তোমাদের মতো ডেস্কজব নাকি? ডি এম ডেকেছেন, যেতে হবে।”

”ধুর!” প্রিয়মের বিরক্তি ফোনের তার বেয়ে এদিকে এসে উপচে পড়ল, ”কী করতে যে তুমি ব্যাঙ্কের চাকরিটা দুম করে ছাড়লে! যত যাইহোক, ঠিকঠাক ছুটিছাটা ছিল। একটা ভদ্র সময়ে আসা যাওয়া ছিল। আর ছাড়লে তো ছাড়লে, রাতদিন পড়ে পরীক্ষা দিয়ে ঢুকলে পুলিশ সার্ভিসে। কেন, আর কোনো ক্যাডার ছিল না?”

রুদ্র হাসল, ”এই প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে এই তিনবছরে অন্তত একশোবার দিয়েছি প্রিয়ম। ব্যাঙ্কের চাকরিতে আমার সম্মান একটু হলেও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। আমার কাছে আত্মসম্মান সবার ওপরে। আর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাডার পেলে কি নিতাম না? জানোই তো, অপশনাল পেপারটা ঝুলে গেল বলে র‍্যাঙ্কটা পিছিয়ে গেল। বারবার মনে করাও কেন?”

”মনে করাই কারণ আমার ভালো লাগেনা তুমি বাইরে বাইরে থাকো।” প্রিয়ম উষ্মাভরা কণ্ঠে বলল।

”ওমা!” রুদ্র অবাক স্বরে বলল, ”বাইরে বাইরে কোথায়? শ্রীরামপুরের মতো জায়গায় পোস্টিং আমাদের ব্যাচের ক’জন পেয়েছে বলো তো? দিব্যি একসঙ্গে রয়েছি দুজন, তুমি এখান থেকে অফিসও করতে পারছ। এটাকে প্রাইজ পোস্টিং বলে, তা জানো?”

”আরে সে তো মেরেকেটে তিনবছর। একবছর তো হায়দ্রাবাদের পুলিশ অ্যাকাডেমিতে কাটিয়ে এলে, কিছুদিন পরেই আবার কোন বনবাদাড়ে পাঠিয়ে দেবে।” প্রিয়ম বিরক্ত স্বরে বলল, ”যাকগে। আমি ঘাটে নামছি। এখন রাখছি।”

ফোনটা রেখে দিয়ে রুদ্র বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বাইরে এল। সকাল সাড়ে সাতটা, রোদ এখনো নরম রয়েছে।

ওর বাংলোর সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে এখন মল্লিকাদি’র নয় বছরের মেয়ে ক্ষমা খেলে বেড়াচ্ছে।

একটা প্রজাপতি উড়ছে, ক্ষমা ছুটে ছুটে সেটাকে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু কাছাকাছি গেলেই প্রজাপতিটা আবার উড়ে যাচ্ছে।

”কীরে, তোর মা কোথায়?” রুদ্র অলসভাবে এসে বসল লম্বা বারান্দায়।

ওর এই সরকারি বাংলোটা ব্রিটিশ আমলের, ভিক্টোরিয়া ধাঁচের স্থাপত্যে তৈরি। দোতলা হলেও এখনকার আধুনিক বাড়ির উচ্চতায় চারতলারও বেশি। বিশাল বিশাল ঘর,

ভারী ভারী মেহগনি কাঠের আসবাবপত্র। বাংলোর চারপাশে বাগান। সেই বাগানের পরিচর্যায় রয়েছে মালি সনাতন। সে অবশ্য এই ক্যাম্পাসে থাকে না। একটু দূরে তার নিজের বাড়ি। সেখান থেকে আসা যাওয়া করে।

বাংলোয় থাকে রাঁধুনি জ্যোৎস্নাদি আর আর্দালি কাম ড্রাইভার পাঁচু। পাঁচু বউকে নিয়ে থাকলেও জ্যোৎস্নাদি বিধবা। সে একাই থাকে। ক্যাম্পাসের মধ্যেই বাংলোর আউটহাউজে ওদের থাকার ব্যবস্থা।

গঙ্গার পাশ দিয়ে সরু পিচের রাস্তা, তার ওপরেই এই বাংলো। দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়ালে নদী দেখা যায় স্পষ্ট। ওপারে ব্যারাকপুর, কখনো কখনো ক্যান্টনমেন্টের গুলির মহড়ার শব্দও কানে আসে।

গত তিনবছরে রুদ্রর জীবনটা অদ্ভুতভাবে বদলে গিয়েছে। প্রথম জীবনে বাবার মতো ইতিহাসের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা থাকলেও স্বপ্ন ছিল আই এ এস অফিসার হওয়ার। প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকলে সমাজের নীচুস্তরের মানুষদের জন্য অনেক কিছু করা যায়। মূলত এই তাগিদেই চেয়েছিল আই এ এস হতে।

কিন্তু প্রথম জীবনের সেই স্বপ্ন হারিয়ে গিয়েছিল চটজলদি কেরিয়ার গড়ার জাঁতাকলে। তাই আগ্রায় তাজমহলের সেই ভয়ংকর ঘটনায় ব্যাঙ্ক থেকে শো-কজের পর* যখন দুম করে রিজাইন করেছিল, তখন মনের মধ্যে প্রথম ভাবনা এসেছিল, এখনো তো বয়স রয়েছে। আরেকবার চেষ্টা করতে দোষ কী? না হলে না হবে।

সেই ভাবনা থেকে প্রিয়ম যখন নিজের কাজে লন্ডনে ফেরত চলে গেল, বাবা-মা ফিরে এলেন কলকাতায়, রুদ্র তখন দিনরাত এক করে পড়াশুনো করতে শুরু করেছিল। ইচ্ছে করেই কলকাতায় আসেনি। বাবা-মা'র কাছে বা নিজের ফ্ল্যাটে থেকে পড়ার চেয়ে দিল্লিতে গিয়ে কোন পেশাদার কোচিং সেন্টারে ভরতি হয়ে প্রস্তুতি নেওয়াটা ওর কাছে অনেক বেশি ফলপ্রসূ মনে হয়েছিল। বয়স পেরনোর আগেই ওকে যেভাবে হোক আই এ এস পেতে হবে, কলেজ জীবনের সেই স্বপ্নটা ওর মাথায় তখন গেঁড়ে বসেছিল।

ফলস্বরূপ দেড়বছরের মধ্যে এসেছিল সাফল্য।

না। ওর স্বপ্নের আই এ এস হয়নি। র‍্যাঙ্ক একটু পিছনে থাকায় আই পি এস ক্যাডার পেয়েছিল ও। তাতে কী? আবার পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা ওর আর হয়নি। ততদিনে প্রিয়ম ফিরে এসেছে লন্ডন থেকে। কিন্তু রুদ্র কলকাতায় যেতে পারেনি। পরবর্তী একবছর কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে ওর ট্রেনিং চলেছে হায়দ্রাবাদের পুলিশ অ্যাকাডেমিতে, তারপর কিছুক্ষণ মুসৌরিতে।

সব মেটার পর প্রথম পোস্টিং হয়েছে হুগলীর শ্রীরামপুরে। অ্যাডিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ। প্রিয়ম তখন ঠিকই বলছিল। এটা প্রোবেশন পিরিয়ডের পোস্টিং। তিনবছরের মধ্যেই ওকে আবার অন্য কোথাও চলে যেতে হবে এস পি হয়ে।

তা হোক। পরিযায়ী জীবনে এই সময়টুকু তো দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারছে। পারছে ছুটিছাটায় কলকাতায় বাবা-মা'র কাছে বা কল্যাণীতে শ্বশুরবাড়িতে যেতেও। এই বা মন্দ কি!

"এই নাও গো।" ক্ষমার কথায় ওর চিন্তার জাল হঠাৎ ছিঁড়ে গেল।

ক্ষমার হাতে একটা খবরের কাগজের ছেঁড়া পাতার ওপর রাখা অনেক ক'টা লাল রঙের তরতাজা ফুল।

রুদ্র কপট চোখ পাকাল, "তুই আবার ফুল ছিঁড়েছিস? সনাতনকাকার চোখে পড়লে তোকে আর আস্ত রাখবে?"

ক্ষমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ফ্রকের কোঁচড় থেকে বের করল আরও পনেরো-কুড়িটা ফুল, "বকলে বকবে। আমার বুঝি কেষ্টঠাকুরের জন্য মালা গাঁথতে সাধ যায়না?"

রুদ্র বিস্মিত হল না। ন'বছরের একটা শিশু হয়েও ক্ষমার মুখে একটু বয়সছাড়া কথা। নামের মতোই তার কথাগুলোও একটু সেকেলে।

আর মা যেমন, মেয়েও তো তেমনই হবে।

ক্ষমার মা মল্লিকাদি অন্যদের মতো বাংলোর সরকারি কর্মচারী নয়। রুদ্র এখানে পোস্টেড হয়ে এসেছে সাড়ে তিন মাস হল। আসার ঠিক একমাসের মাথায় ভোরবেলা গঙ্গার ধারে মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছিল ও আর প্রিয়ম। তখনই বাংলোর বাইরে গুটিসুটি মেরে ঘুমতে দেখেছিল মল্লিকাদি আর কোলের কাছে শুয়ে থাকা ক্ষমাকে। ক্ষমার তখন গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। রুদ্রর নির্দেশে পাঁচু আর জ্যোৎস্নাদি ধরে ধরে ওদের নিয়ে গিয়েছিল ভেতরে।

দিনদুয়েকের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছিল ক্ষমা। মল্লিকাদির বাড়ি হুগলীরই কোন এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সেখানে আর নিজের কেউ নেই। পেটের দায়ে শ্রীরামপুরে কাজ খুঁজতে এসেছিল। ক্ষমার ভাসা ভাসা আয়ত চোখদুটোর ওপর ভারী মায়া পড়ে গিয়েছিল রুদ্রর। অন্যদের সঙ্গে ওদেরও থাকতে বলে দিয়েছিল আউটহাউজের একটা ঘরে।

তারপর থেকে মা-মেয়ে ভালোই আছে। মল্লিকাদি'র হাতের রান্না খুব ভালো, সে এমনিতে টুকিটাকি কাজ করলেও প্রায়ই প্রিয়মের আবদারে এটা সেটা বানায়। এই নিয়ে স্থায়ী রাঁধুনি জ্যোৎস্নাদি'র সঙ্গে মাঝেমাঝেই তার খটাখটি লেগে যায়।

রুদ্র শুধু দেখে আর উপভোগ করে। মাঝেমাঝে ভাবে, মল্লিকাদি না এলে ও জানতেও পারত না, এখনো গ্রামের মানুষরা কত সেকেলে। কত ধরনের ব্রত, উপবাস, পুজো।

ও এখন গম্ভীরমুখে ক্ষমাকে বলল, "যা সাধ মেটানোর মিটিয়ে নাও। আর মাসখানেকের মধ্যেই তোমায় স্কুল যেতে হবে। তখন আর দিনরাত খেলে বেড়ানো চলবে না। ছি ছি, এত বড় মেয়ে, পড়তে পারেনা। লোকে বলবে কী?"

ক্ষমা ফিক করে হেসে একছুটে চলে গেল বাগানের দিকে। রুদ্র ওকে আর ডাকল না। শিক্ষিতের হার যতই বাড়ুক দেশে, এমন কত শিশু যে নিরক্ষর রয়ে গিয়েছে এখনো, তার কোনো হিসেব নেই। সরকারের চেষ্টা, বিভিন্ন প্রকল্পই তো সব নয়, এর জন্য দায়ী পরিবারের মানসিকতাও। এই ক্ষমাই প্রথমদিকে বলতো, মেয়েদের লেখাপড়া শিখে কী হবে? তাই শিখিনি।

এখন আর বলেনা।

ফুলসমেত খবরের কাগজটা পড়ে রইল টেবিলে। সেখানেই ফুল পেরিয়ে খবরের কাগজের একটা খুচরো খবরে চোখ আটকে গেল রুদ্রর। খবরটার শিরোনাম 'কোন্নগরে ব্যবসায়ী খুন'।

কোন্নগর শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত একটা ছোট মফঃস্বল এলাকা। সেখানে কোন ব্যবসায়ী খুন হল?

রুদ্র ফুলগুলো সরিয়ে কাগজটা তুলে নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে পড়তে শুরু করল:

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর : গতকাল গভীর রাতে নিজের বাড়িতেই নৃশংসভাবে খুন হলেন গাড়ি ব্যবসায়ী স্বপন সরকার (৪৫)। তিনি একটি গাড়ি প্রস্তুত সংস্থার ডিলার ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লিরোডে নিজের শো-রুম থেকে ফিরে বুধবার তিনি তাঁর ক্রাইপার রোডের বাড়িতে একাই ছিলেন। আজ ভোর পাঁচটা নাগাদ এক প্রতিবেশী এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া না পাওয়ায় পাড়ার লোকেরা দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

রুদ্র একটু অবাক হল। কোন্নগর বেশ শান্তিপূর্ণ এলাকা। সেখানে এইভাবে খুন? আর খুন হয়েছে লেখা রয়েছে, কিন্তু কীভাবে খুন করা হয়েছে, সেই ব্যাপারে কোনো বিশদ নেই। সংবাদপত্রের খবরের মান দিনদিন নেমে যাচ্ছে। কবেকার কাগজ এটা? বোঝার উপায় নেই। ক্ষমা মাঝখান থেকে ছিঁড়ে এনেছে।

রুদ্র আর কিছু ভাবার অবকাশ পেল না। জ্যোৎস্নাদি এসে বলল, ”আজ অফিসে কী খেয়ে যাবেন দিদিমণি? রুটি?”

রুদ্র হাসল। এখানে আসার পর অনেক কষ্টে ‘ম্যাডাম’ ছাড়াতে পেরেছিল ও, বলেছিল ‘দিদি’ বলতে। দিনরাত যাদের সঙ্গে থাকতে হবে, তাদের মুখ থেকে ‘ম্যাডাম’ শুনলে যেন কেমন হোটেলে থাকার মতো মনে হয়।

কিন্তু এদের এতবছরের অভ্যেস! মাঝে মাঝেই তাই ম্যাডাম, দিদিমণি এইসব বেরিয়ে আসে।

ও বলল, ”নাহ। আজ বরং স্যান্ডউইচ করে দাও। সঙ্গে একটা ওমলেট। একটু তাড়াতাড়ি বেরবো আজ।” জ্যোৎস্নাদি চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই ও পিছু ডাকল, ”ও হ্যাঁ, তোমার দাদা বোধ হয় মাটন আনছে। মল্লিকাদি’কে করতে বোলো দুপুরের জন্য। আমি রাতে ফিরে খাব।”

জ্যোৎস্নাদি’র মুখটা নিভে গেল। স্বাভাবিক। বাড়ির রান্নার দায়িত্ব যার কাঁধে, মাটনের ভার যদি তাকে ছাড়িয়ে অন্য কাউকে দেওয়া হয়, তা তো অপমানই।

রুদ্র বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে হাসল, ”না মানে তুমি তো দারুণ করো। কিন্তু তোমার দিনরাত যা খাটনি যাচ্ছে। মল্লিকাদি তো বলে যে ও খুব ভালো রান্না জানে, তাই প্রিয়ম বলল …!”

”বলতে তো সবাই পারে। বলতে তো আর টাকা লাগেনা।” জ্যোৎস্নাদি মুখ বেঁকাল, ”রান্নার যা ছিরি। চোদ্দোবার খালি মশলা বাটে। গুঁড়ো মশলার প্যাকেট দেখলে যেন আঁতকে ওঠে। আলু দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, যেন জন্মে দেখেনি। আধমিনিট অন্তর ঘোমটা টানে। আর গ্যাস জ্বালাতে জানত নাকি? আমিই তো শেখালাম! কাজেকম্মে নেই, কথার ফুলঝুরি!”

”তা তিনি কোথায়? সকাল থেকে একবারও দেখতে পাইনি।” রুদ্র আলগা ছলে কথা বলতে বলতে প্রস্তুত হতে লাগল স্নানে যাওয়ার জন্য।

বলতে বলতেই এসে উপস্থিত হল মল্লিকাদি। পরনে ডুরে ছাপা শাড়ি। মাথায় ঘোমটা। অনেক বলেও সেই ঘোমটা সরাতে পারেনি রুদ্র। ঘোমটা সরালে তার নাকি ভীষণ লজ্জা করে।

মল্লিকাদি প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না, ”মটর? মানে কড়াইশুঁটি?”

”আহা মটর নয়, মাটন। মানে পাঁঠার মাংস। রাঁধতে পারো?” রুদ্র নিজের ঘরের দিকে যাওয়ার আগে বলল।

”মহাপ্রসাদ!” মল্লিকাদি বলল, ”হ্যাঁ মা, পারি।”

জ্যোৎস্নাদি অবাকচোখে তাকাল। বলল, ”আ মরণ! প্রসাদ রাঁধতে তোমায় কে বলেছে? পাঁঠার মাংস রাঁধতে বলছে। পারো কি? না পারলে বলো, আমি করে নেব।”

”পারব।”

রুদ্র বাথরুমে ঢুকল। ওর মনটা কেমন খচখচ করছে। ও হুগলী জেলায় এসেছে সবে কয়েকমাস হল। সেভাবে কাজ কিছু শুরু হয়নি। তাছাড়া জেলার আরও তিনটে মহকুমায় ওর মতো দু’জন করে অ্যাডিশনাল এস পি আছেন।

কী এমন হল যে ছুটির দিনে জেলাশাসক গোপনে ওকেই ডেকে পাঠালেন?

---

* রুদ্রপ্রিয়ম সিরিজের ৩য় উপন্যাস ‘অঘোরে ঘুমিয়ে শিব’ দ্রষ্টব্য।

৩

হুগলীর ডি এম অফিসটা চুঁচুড়ায়। শ্রীরামপুরে আসা ইস্তক রুদ্রর কখনো এর আগে ডি এম অফিস আসার প্রয়োজন পড়েনি। ড্রাইভার পাঁচু দিল্লি রোড দিয়ে এসে ডানদিকে বেঁকে বেশ জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। রুদ্র বেশ আগ্রহের সঙ্গে দু'পাশ দেখছিল। সঙ্গে রয়েছে ওর দেহরক্ষী জয়ন্ত।

জয়ন্ত পদমর্যাদায় অনেক নীচে হলেও ওর বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা যে কোনো অফিসারকে টেক্কা দিতে পারে। সে ত্রিবেণীর ছেলে। নিম্নবিত্ত পরিবারের বড় ছেলে, কোনোমতে গ্র্যাজুয়েশন করেই এই চাকরিতে ঢুকেছে। পড়াশুনোতেও ভালো ছিল। রোজকার ডিউটি সামলে সে এখনো বড় চাকরির প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। রুদ্রও ওকে পড়াশুনোয় সাধ্যমতো সাহায্য করে।

রুদ্র একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। কোন জায়গা, তা সে যতই কাছাকাছি বা অকিঞ্চিৎকর হোক, সেখানকার ইতিহাস জেনে নেওয়া ওর বহুদিনের অভ্যাস। জয়েন করার পর হুগলী জেলার সম্পর্কে একটা মোটা বই দেখতে পেয়েছিল অফিসের কেবিনে। বাড়িতে নিয়ে এসে সেখান থেকে কখনো শ্রীরামপুর, কখনো চন্দননগর সম্পর্কে পড়ত।

আজও গাড়িতে সেই বইটাই পড়তে পড়তে যাচ্ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে পাশাপাশি চন্দননগর আর চুঁচুড়া— এই দুটো জনপদ কখনোই ইংরেজ বশ্যতা স্বীকার করেনি। চন্দননগর ছিল ফরাসি উপনিবেশ আর চুঁচুড়া ওলন্দাজ। ওদিকে হুগলী আবার ছিল পর্তুগিজদের দখলে। চুঁচুড়াতে বসেই নাকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন বন্দেমাতরম গান।

প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো এই চুঁচুড়া শহর। আগে এর নাম ছিল ওলন্দাজনগর।

ড্রাইভার পাঁচু নতুন এ এস পি'কে এই ক'দিনেই বেশ চিনে গিয়েছে। গাড়ি চালাতে চালাতে সে বলেছিল, "এদিকে অনেক কিছু দেখবার আছে ম্যাডাম। ফেরার পথে যাবেন?"

"কী কী দেখার আছে চুঁচুড়ায়?" জানতে চেয়েছিল রুদ্র।

"নদীর ধারে ষণ্ডেশ্বর শিবমন্দির আছে। বড়া ইমামবড়া আছে।" পাঁচু বলেছিল।

"হ্যাঁ, ইমামবড়ার কথা পড়েছিলাম। হাজি মহম্মদ মহসীন বানিয়েছিলেন। এইট্টিন্থ সেঞ্চুরির খুব বড় একজন সমাজসেবী। হুগলী মহসীন কলেজও ওঁরই তৈরি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ও অনেক দানধ্যান করেছিলেন। আর কী কী আছে?"

তখন জয়ন্ত মুখ খুলেছিল, "বাঁশবেড়িয়ার দিকে এগোলে রয়েছে হংসেশ্বরী মন্দির। রাজা নৃসিংহ দেব রায় বানানো শুরু করেছিলেন, শেষ করেন তাঁর ছোটরানী শঙ্করী দেবী। দেখতে যাবেন ম্যাডাম? আমার বাড়ির কাছেই।"

রুদ্র তখন হাসি চেপে বলেছিল, "নাহ, আপাতত ডি এম অফিসটাই দেখি চলো। সেটাও তো হেরিটেজ বিল্ডিং। পরে বাকিগুলো দেখা যাবে।"

হুগলীর জেলাশাসক এখন একজন তরুণী। বয়সে রুদ্রর চেয়ে বছরদশেকের বড় হবেন। পাঞ্জাবের মেয়ে। নাম গুরশরণ কৌর। কিন্তু প্রথম থেকেই বেঙ্গল ক্যাডার বলে বাংলাটা খারাপ বলেন না। প্রকাণ্ড ঘরের একেবারে মাঝখানে বিশাল টেবিলের ওই প্রান্তে বসে কথা বলছিলেন তিনি।

রুদ্রর বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠছিল।

ইশ! কেন ও আর একটু ভালো করে পড়ল না? তাহলে আই এ এস টা পেয়ে যেত! এইভাবেই একটা গোটা জেলার দায় ভার থাকত ওর ওপরে।

পরক্ষণে নিজের মনেই ও নিজেকে সান্ত্বনা দিল। চাহিদার কোন শেষ নেই। যখন ব্যাঙ্কে চাকরি করতে, কখনো ভেবেছিলে যে আই পি এস হবে? হয়েছ তো? যা হয়েছ, তাতেই খুশি থাকো। দুটোই দেশের সেবা। জনগণের সেবা। সেই কাজে মনোযোগ দাও।

ডি এম ম্যাডাম ভাঙা বাংলায় বললেন, "মিসেস সিংহরায়, আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি? এটা ভীষণ ডেলিকেট একটা সিচুয়েশন।"

মুহূর্তে বাস্তবে ফিরে এল রুদ্র, "ইয়েস ম্যাডাম।"

রুদ্রর বস শ্রীরামপুরের এস পি রাধানাথ রায় এতক্ষণ শুনছিলেন। এবার বললেন, "রুদ্রাণী, তুমি যদি ভালো করে অ্যানালাইজ করো, দেখবে, এই পাঁচটা খুনই কিন্তু হয়েছে হুগলীতে।"

রুদ্র আবার ঝুঁকে পড়ল সামনে রাখা কাগজটার ওপর।

প্রথম খুন	১৫ই জানুয়ারি	শিবনাথ বিশ্বাস (৩৮)	ত্রিবেণী
দ্বিতীয় খুন	১২ই ফেব্রুয়ারি	মহম্মদ তারেক (৩২)	চন্দননগর
তৃতীয় খুন	১১ই মার্চ	সুনীল ধাড়া(৪১)	বৈদ্যবাটি
চতুর্থ খুন	১৫ই এপ্রিল	হৃষীকেশ জয়সোয়াল(৪৮)	চুঁচুড়া
পঞ্চম খুন	১৩ই মে	স্বপন সরকার (৪৫)	কোন্নগর

রুদ্রর আজ সকালেই সেই পুরোনো খবরের কাগজে পড়া খবরটা মনে পড়ে গেল। তার মানে সেই কাগজটা ছিল ১৩ই মে'র দু'দিন পরের। ও মুখ তুলল, "কিন্তু এই পাঁচটা মার্ডার যে একই সুতোয় বাঁধা, তা আপনি ধরে নিচ্ছেন কী করে?"

"মিঃ রায়, রুদ্রাণীকে প্লিজ এক্সপ্লেইন করুন।" জেলাশাসক ম্যাডাম এস পি রাধানাথ রায়ের দিকে তাকালেন।

রাধানাথ রায় বললেন, "দ্যাখো রুদ্রাণী। এমন কোনো ক্লিয়ার এভিডেন্স আমরা এখনো পাইনি যা থেকে বলা যেতে পারে যে এই সবকটা খুনের মধ্যে কোনো যোগসূত্র রয়েছে। খুনের ধরনও একরকম নয়। কাউকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করা হয়েছে তো কাউকে ছুরি মেরে। কিন্তু ডি এম ম্যাডামের মতে, লিঙ্ক এটাই, যে প্রত্যেকে ব্যবসায়ী। আর এই পাঁচটা খুনের ক্ষেত্রেই লোকাল পুলিশ সেভাবে কোনো প্রোগ্রেস করে উঠতে পারছেনা। তাই আমরা খুব চিন্তিত। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট থেকেও চাপ আসছে। আমরা তাই চাইছি লোকাল থানা যেমন তদন্ত করছে করুক, কিন্তু একটা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশান টিম তৈরি করা হোক যেটা বিশেষভাবে এই খুনগুলোর তদন্ত করবে। তুমি নতুন এসেছ,

সেভাবে কোন ডিপার্টমেন্ট তোমার এখনো অ্যালোকেটেড নেই। তাই আমরা চাই, তুমিই এই টিমটা লিড করো। হুগলী জেলার সবকটা থানা তোমায় সহযোগিতা করবে।”

জেলাশাসক শুনছিলেন। এস পি থামতেই বললেন, ”মিসেস সিংহ রায়, এমনিতেও আপনার পুলিশ সার্ভিস জয়েনের আগের কিছু অ্যাচিভমেন্টের রিপোর্ট আছে আমাদের কাছে। ভেরি কমেন্ডেবল। আমার মনে হয়, এই কেসের জন্য আপনি আইডিয়াল হবেন।”

রুদ্র বলল, ”অ্যাজ ইউ অর্ডার ম্যাডাম। আমার টিমে কে কে থাকবেন?”

এস পি রাধানাথ রায় বললেন, ”আমরা তিনজনকে নমিনেট করেছি। প্রত্যেকেই ইয়ং এবং এফিশিয়েন্ট। তবে তুমি চাইলে নিজের মতো কাউকে বেছে নিতে পারো।”

”আমি আর ক’জনকে চিনি?” রুদ্র কাঁধ নাচাল, ”এই ক’মাস তো শুধু অফিসেই বসে রয়েছি। আপনারা যাদের সিলেক্ট করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্যুটেবল হবেন। আমার কোনো আপত্তি নেই।”

”ভেরি গুড।” রাধানাথ রায় বললেন, ”উত্তরপাড়া থানার এস আই বীরেন শিকদার, শেওড়াফুলি থানার ওসি লোকেশ ব্যানার্জি আর শ্রীরামপুর সাব ডিভিশনের সেকেন্ড অফিসার প্রিয়াঙ্কা চন্দ। এঁরাই তোমার টিম মেম্বার।”

রুদ্র মাথা নাড়ল। এদের মধ্যে ও শুধু প্রিয়াঙ্কাকেই চেনে। বেশ করিৎকর্মা মেয়ে। ও বলল, ”অল রাইট স্যার। শুধু সঙ্গে আমার গার্ড জয়ন্তকেও ইনক্ল্যুড করলে ভালো হয়। হোমগার্ড হলেও ও খুব কমপিটেন্ট।”

”বেশ। কোনো অসুবিধা নেই। বীরেন শিকদার বাইরে অপেক্ষা করছেন।” এস পি বললেন, ”ওঁর কাছে সব ক’টা মার্ডারের ফাইল রয়েছে। তুমি দেখে নিয়ে কাজ শুরু করে দাও।”

”ওকে স্যার!” রুদ্র উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকল।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে জেলাশাসক ডাকলেন, ”মিসেস সিংহরায়!”

রুদ্র চমকে তাকাল।

জেলাশাসক বললেন, ”যদিও এটা পুলিশ ম্যাটার, প্রশাসনিক পদে থেকে আমার এতটা সরাসরি ইনভলভ হওয়াটা হয়তো একটু আনইউজুয়াল লাগছে। কিন্তু আমার জেলায় এইভাবে বিজনেসম্যান মার্ডার হওয়া নিয়ে আমাকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গতকাল হোম সেক্রেটারি নিজে ফোন করে ইনভেস্টিগেশনের প্রোগ্রেস জানতে চেয়েছেন। আসলে একদম শেষে যিনি খুন হয়েছেন, ওই কোন্নগরের ব্যবসায়ী বেশ ইনফ্লুয়েনশিয়াল। আপনি এখনো প্রোবেশনে আছেন। পুলিশ কমিশনার চাইছিলেন অভিজ্ঞ কাউকে এই দায়িত্ব দিতে। কিন্তু আমি এবং এস পি মিঃ রায় একটু ঝুঁকি নিয়েই আপনাকে দায়িত্ব দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস আপনি পারবেন।”

রুদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল।

জেলাশাসক হাসলেন। বললেন, ”অল দ্য বেষ্ট!”

৪

বীরেন শিকদার, লোকেশ ব্যানার্জি, প্রিয়াঙ্কা চন্দ এবং জয়ন্ত সমাদ্দার। এদের মধ্যে লোকেশ ব্যানার্জিকে বাদ দিলে সকলেরই বয়স ত্রিশ বত্রিশের নীচে। লোকেশবাবুর বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু পেটাই চেহারা। ভদ্রলোক বৈষ্ণব, পুলিশ উর্দিতেও দু'চোখের ঠিক মাঝখানে রসকলি আঁকা।

জয়ন্ত আর প্রিয়াঙ্কা একেবারেই অল্পবয়সি। তারুণ্যের নিয়ম মেনে উৎসাহে ভরপুর। জয়ন্ত কাল থেকে বারকয়েক রুদ্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফেলেছে। নিজের পদমর্যাদার চেয়ে অনেক ওপরের এক টিমে ওকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ও রীতিমতো উত্তেজিত। এই কাজ ওর সার্ভিস রিপোর্টে একটা উজ্জ্বল পালক যোগ করবে।

আজ ওরা সবাই এসেছে রুদ্রর বাংলোর অফিসে। নিজের বাংলোতেই ছোট একটা অফিসঘর আছে ওর, জরুরি প্রয়োজনে সেই অফিসঘর ব্যবহার করা হয়।

রুদ্র খুঁটিয়ে সবকটা কেস পড়ছিল। বলল, "প্রথমেই বলি, এই পাঁচটা মার্ডার হয়েছে পাঁচটা আলাদা জায়গায়। লোকাল থানা তার তদন্ত করছে। আমাদের সেটা কাজ নয়। আমাদের এই স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের কাজ হল এই পাঁচটা কেসের মধ্যে কী লিঙ্ক আছে বা আদৌ কোনো লিঙ্ক আছে কিনা সেটা খুঁজে বের করা। যাতে পুনরাবৃত্তি আটকানো যায়। তাই তো?"

"ইয়েস ম্যাডাম!" বীরেনবাবু বললেন।

"আপনারা আমার আগেই প্রতিটা কেস স্টাডি করেছেন। বীরেনবাবু তো সরাসরি যুক্ত রয়েছেন কোন্নগরের মার্ডারের তদন্তে। তা এই পাঁচটা কেসে কী কী কমন বিষয় খেয়াল করেছেন আপনারা?"

প্রিয়াঙ্কার সবেতে একটু বেশি উৎসাহ। বলল, "ম্যাডাম! পাঁচজনই বিজনেসম্যান!"

"কারেক্ট! আর?"

"পাঁচজনই পুরুষ।"

"এত তুচ্ছ মিলগুলোই চোখে পড়ছে? আর কিছু নজরে আসছেনা?"

প্রিয়াঙ্কা এবার চুপ করে গিয়ে ভাবতে লাগল।

জয়ন্ত বলল, "প্রত্যেকটা খুনই হয়েছে রাতের বেলায়।"

"এটা একটা ভালো অজারভেশন।" রুদ্র গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "আমি যতটুকু নোটিশ করেছি তা থেকে তিনটে পয়েন্ট পেয়েছি। সেগুলো আগে বলি। ত্রিবেণীর শিবনাথ বিশ্বাস খুন হয় শীতকালে। তার ছিল সাইবার ক্যাফের ব্যবসা। পোস্ট মর্টেম বলছে, কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার পেটে একাধিকবার কোপ দেওয়া হয়। সম্ভবত ছুরি। মার্ডার ওয়েপন স্পটে পাওয়া যায়নি। পাশেই গঙ্গা, নদীতে ফেলে দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

”লোকাল থানা তদন্ত করতে গিয়ে দেখে, তার দোকানে পাড়ারই একটি ছেলে কয়েক মাস আগে অবধি কাজ করত। নাম রাজু। কিন্তু তাকে শিবনাথ ছাড়িয়ে দেয়। পুলিশ খুনের আগের দশদিনের কলরেকর্ড ঘেঁটে দেখেছে, তার সঙ্গে শিবনাথের স্ত্রী আরতির নিয়মিত কথা হত। রাজু আরতির সম্ভাব্য প্রেমিক, এবং দুজনে মিলে শিবনাথকে খুন করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু রাজুর একটি স্ট্রং অ্যালিবাই রয়েছে। খুনের দু’দিন আগে থেকে পরের পাঁচদিন সে ত্রিবেণীতে ছিল না। একটা ট্যুর এজেন্সির হয়ে লোক নিয়ে গিয়েছিল পুরীতে। প্রপার এভিডেন্সের অভাবে এখনো অবধি তাই আরতি ও রাজুকে গ্রেফতার করা যায়নি।
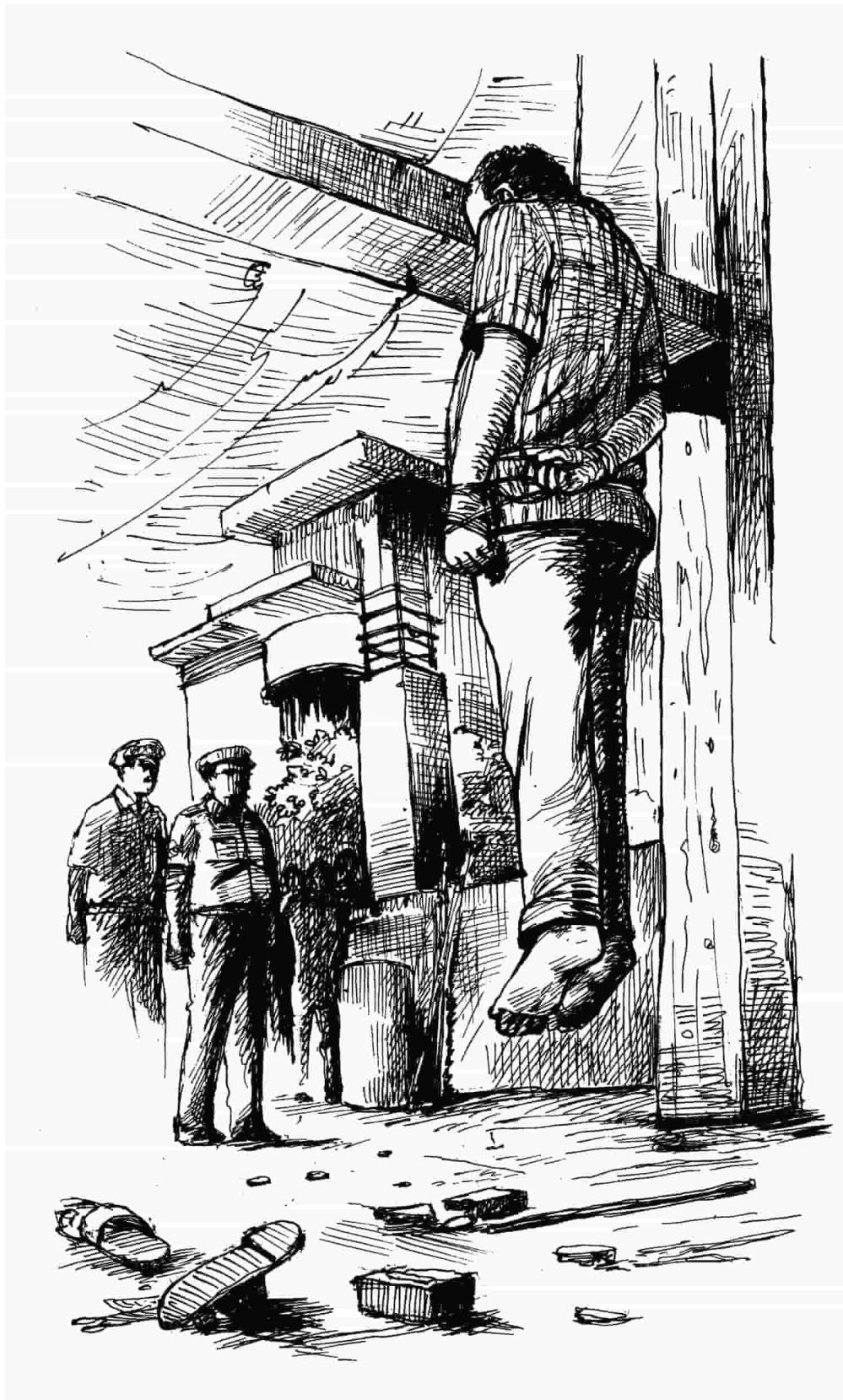
"চন্দননগরের মহম্মদ তারেক মোবাইল ফোনে রিচার্জ করত, সে খুন হয় তার গুমটি দোকানেই। পোস্টমর্টেম অনুযায়ী রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে। তার স্ত্রী আমিনা বিবি জানিয়েছে, তার মদ, গাঁজা আরও নানারকম নেশা ছিল। এই নিয়ে বাড়িতে ঝামেলা হত। সেইজন্যই প্রায়দিনই সে রাতেরবেলা গুমটিতেই কাটাত। এক্ষেত্রে কিন্তু খুনের ধাঁচ আলাদা। কোনো সরু দড়ির ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল। মহম্মদ তারেকের যাদের সঙ্গে চেনাজানা ছিল, বা পুলিশি রেকর্ড, কারুর সঙ্গেই সেই দড়ির ফিঙ্গার প্রিন্ট মেলেনি।

"এরপর খুন হল বৈদ্যবাটির সুনীল ধাড়া। তার অবস্থা ভালো। বৈদ্যবাটি স্টেশন রোডে চশমার দোকান। ছোট হলেও বেশ চালু। দু-তিনজন ডাক্তারও বসেন। একজন কর্মচারীও রয়েছে। সুনীল যেদিন খুন হয়, সেদিন অবশ্য ওর কর্মচারী দানু দোকানে ছিল না। তার একদিন আগেই দোল গিয়েছে, সেই উপলক্ষ্যে সে কৃষ্ণনগরের বাড়িতে গিয়েছিল। সুনীল ধাড়া দোকান বন্ধ করে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেইসময়েই একটা অন্ধকার গলির মধ্যে কেউ তাকে পেছন থেকে চেপে ধরে। তারপর পাশের পুকুরে ফেলে দেয়। সুনীল ধাড়া সাঁতার জানত না। পরেরদিন সকালে তার লাশ পুকুরের জলে ভেসে ওঠে। তার মুখে গামছা বাঁধা ছিল, যাতে চেঁচাতে না পারে।

"চুঁচুড়ার হৃষীকেশ জয়সোয়ালের বাড়ি ঘড়ি মোড়ের পেছনে। তিনি প্রোমোটার। বেশ কয়েকটা ফ্ল্যাট বানিয়েছেন। খুন হওয়ার আগে তিনি বানাচ্ছিলেন গঙ্গার ধারে একটা বেশ অভিজাত আবাসন। অনেক টাকা লগ্নি করেছিলেন তাতে। প্রোমোটারদের শত্রু থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। জয়সোয়ালেরও নিশ্চয়ই ছিল। যাইহোক সেদিন রাতে তিনি হঠাৎই বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। তাঁর গাড়ির ড্রাইভার বাড়ি চলে গিয়েছিল, তাই তিনি একটা অটোরিকশা করে পৌঁছন গঙ্গাপাড়ের সেই নির্মীয়মাণ আবাসনে। অটোরিকশা তাঁকে ফেরত চলে যায়। আবাসনটির তখন সবে একতলার গাঁথনি তৈরি হয়েছে। সেই ভিতের মধ্যেই একটা বিমে তাঁকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখা যায়।"

"তবে তো ম্যাডাম, সুইসাইডও হতে পারে!" কথার মাঝখানে বলে উঠলেন লোকেশবাবু।

রুদ্র বলল, "সুইসাইড করার হলে ভদ্রলোক বাড়িতেই করতে পারতেন। বাড়ি থেকে অতদূরে গিয়ে করবেন কেন? আর তাছাড়া আপনি কি রিপোর্টটা ভালো করে পড়েননি? হৃষীকেশ জয়সোয়ালের হাতদুটো বাঁধা ছিল। বাঁ হাতের পাঞ্জার সঙ্গেও দড়ি বাঁধা ছিল। ডান হাত ছিল দেহের সঙ্গে সমান্তরালে। আত্মহত্যা করলে বাঁধা থাকবে কি করে? আর ফরেনসিক রিপোর্টেও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, শ্বাসরোধ করে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাওয়া যায়নি জয়সোয়ালের মোবাইলটিও। পুলিশ ট্র্যাক করেছিল, তাঁর কাছে আসা শেষ ফোনটা করা হয়েছিল চুঁচুড়া স্টেশনের একটা টেলিফোন বুথ থেকে।"

রুদ্র একটানা কথা বলে একটা লম্বা নিশ্বাস নিল। তারপর চেয়ারে হেলান দিল, "আর কোন্নগরে স্বপন সরকার ছিলেন গাড়ির শোরুমের মালিক। যথেষ্ট ধনী ব্যক্তি। গঙ্গার ধারে বিশাল বাড়ি। তাঁকেও একলা বাড়িতে গলার নলি কেটে খুন করা হয়। এক্ষেত্রেও মার্ডার ওয়েপন পাওয়া যায়নি।"

গোটা ঘরটায় বিরাজ করছে থমথমে নিস্তব্ধতা। সবাই চুপ করে শুনছে ঊর্ধ্বতন কর্ত্রীর কথা।

রুদ্র বলল, "এবার এই কেস স্টাডি থেকে আমি কী কী নোটিশ করেছি বলি।'

"এক, প্রথম দুজনের কাজের জায়গা ভাঙচুর করা হয়েছে। কেস ডিটেইলে পরিষ্কার লেখা রয়েছে, শিবনাথ বিশ্বাসের সাইবার ক্যাফের একটা কম্পিউটারও আস্ত ছিল না। সাইবার ক্যাফেতে কোনো সিসিটিভি ছিল না। কিন্তু, এটা পরিষ্কার যে, শিবনাথকে খুন করে তার থেকে চাবি নিয়েই দোকানটা খোলা হয়।"

"কেন ম্যাডাম?" এতক্ষণে মুখ খুলল জয়ন্ত, "এমনও তো হতে পারে, শিবনাথ দোকানে বসে কাজ করছিল। হয়তো কোনো টাকাপয়সা সংক্রান্ত ঝামেলা ছিল কারুর সঙ্গে, সে এসে দোকানের মধ্যেই খুন করে।"

রুদ্র সপ্রশংস চোখে জয়ন্তর দিকে তাকাল। বলল, "হ্যাঁ তা হতেই পারত। কিন্তু হল না ফাইলে লেখা একটা সেন্টেন্সের জন্য। দ্যাখো। এখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে, ডেডবডি যখন পাড়ার লোকে আইডেন্টিফাই করে, তখনও স্কুটির ইঞ্জিন গরম। এবং কম্পিউটারগুলো ভাঙলেও দোকানের শাটার কিন্তু ভাঙা ছিল না। বন্ধ করা ছিল। এক্ষেত্রে একটাই সম্ভাবনা যে, শিবনাথ বেরিয়েছিল, কিন্তু স্কুটিতে স্টার্ট দেওয়ার সময়েই ওকে আক্রমণ করা হয়। আর তারপর চাবিটা নিয়ে দোকান খোলা হয়।"

জয়ন্ত মাথা নাড়ল।

"নেক্সট দ্যাখো। মহম্মদ তারেকের রিচার্জের গুমটিতে বিক্রি হওয়া মোবাইল চার্জার, হেডফোন সেট সব কিছু ছেঁড়া ভাঙা ছিল। এমনকি, গুমটির দেওয়ালের দরমায় আটকানো রিচার্জ প্ল্যানের অফারগুলো পর্যন্ত কুটিকুটি করা ছিল। এর মানে কী? কেউ বা কারা এদের ব্যবসার ক্ষতি করতে চাইছে।"

"কিন্তু আমরা যদি ধরে নিই, যে পাঁচটা খুন একই লিঙ্কে যুক্ত, তাহলে সুনীল ধাড়ার চশমার দোকান ভাঙচুর করা হল না কেন? স্বপন সরকার-র গাড়ির শো-রুমই বা বাদ গেল কেন?"

রুদ্র গভীরভাবে ভাবছিল। এমন সময় ঘরে ঢুকল মল্লিকাদি। মাথায় একহাত ঘোমটা। হাতে ট্রে। ট্রে'র ওপর কফি, বিস্কুট। সবাই একে একে কাপ তুলে নিতে মল্লিকাদি চলে যাওয়ার সময় ফিসফিস করে বলল, "দাদাবাবু কাজে বেরোনোর আগে আমায় বলে গেলেন, আজ যেন রাতের রান্নাটা আমিই করি। আপনি একটু জ্যোৎস্নাদি'কে বলে দেবেন দিদিমণি?"

রুদ্র হাসি চেপে বলল, "জ্যোৎস্নাদি কোথায়?"

"ক্ষমার খাতা শেষ হয়ে গেছে। কিনে আনতে গেছে।" মল্লিকাদি আড়ষ্ট গলায় ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বলল।

ক্ষমাকে অনেক কষ্টে অ থেকে ঔ পর্যন্ত শিখিয়েছে প্রিয়ম। এবার সেটার বারবার মহড়া চলছে। খাতা কিনতে যাওয়ার সংবাদে রুদ্র মনে মনে খুশি হল। মেয়েটার মধ্যে পড়াশুনোর প্রতি আগ্রহ গড়ে তোলা খুবই জরুরি।

"আচ্ছা, এলে পাঠিয়ে দিও, বলে দেব। তুমি যাও এখন।" রুদ্র এদিকে ফিরল, "জয়ন্ত, তুমি জিজ্ঞেস করলে, পেছনে একই ক্রিমিনাল থাকলে সুনীল ধাড়া বা স্বপন সরকারের ব্যবসার ক্ষতি করা হয়নি কেন? যে কোনো চশমার দোকানে সিসিটিভি থাকে আজকাল। আর স্বপন সরকার-র গাড়ির শো-রুমে তো থাকবেই। এটাও তো হতে পারে, সেজন্যই খুনি ঝুঁকি নেয়নি। এদের ক্ষেত্রে টার্গেট করছে অন্য জায়গা। তারেক বা শিবনাথের মামুলি

দোকান, তাদেরটাই শুধু ভেঙেছে। একই কথা প্রযোজ্য জয়সোয়ালের ক্ষেত্রেও। তাঁর প্রোমোটারির অফিসেও নিশ্চয়ই গার্ড বা ক্যামেরা আছে। তাই তাঁকে কোনোভাবে ওই ইনকমপ্লিট আবাসনে নিয়ে যেতে হয়েছে।"

জয়ন্ত বলল, "প্রত্যেকে ব্যবসায়ী হলেও এই পাঁচজন সমাজের নানাস্তরের মানুষ। যেমন, শিবনাথ আর মহম্মদ তারেক বেশ অভাবী। সুনীল ধাড়া মোটামুটি স্বচ্ছল। অন্যদিকে হৃষীকেশ জয়সোয়াল আর স্বপন সরকার সমাজের উঁচুস্তরের মানুষ। স্বপন সরকার'র তো এইবারের পুরসভা ভোটে দাঁড়ানোরও কথা ছিল। শাসক দলের হয়ে। তাছাড়া উনি বেশ কিছু ধর্মীয় সংগঠনেরও হর্তাকর্তা ছিলেন।"

বলল, "স্বপন সরকার বা হৃষীকেশ জয়সোয়ালের শত্রু যে বা যারা হবে, তারা কেন খুচরো ব্যবসায়ী মহম্মদ তারেক বা নির্বিবাদী ওষুধ ব্যবসায়ী সুনীল ধাড়ার শত্রু হবে? এই মোটিভটা খুঁজে বের করাই হবে আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি।"

রুদ্র আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওর টেবিলে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। ফোনে কয়েক সেকেন্ড মাত্র কথা বলে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল, "মাই গড। বলতে বলতেই ছ'নম্বর খুন। আবার ত্রিবেণী। ভট্টাচার্য পাড়ার ব্রিজেশ তিওয়ারি।"

"অ্যাঁ! আমার বাড়ির পাশের গলিতেই তো।" চোখ বড় বড় করে বলল জয়ন্ত, "লোকটার ইনভার্টারের দোকান। আমি ওর দোকান থেকেই কিনেছিলাম আমার বাড়িরটা।"

রুদ্র বলল, "হ্যাঁ। আজ সকাল থেকে দোকান খুলছিল না। একটু আগে আশপাশের দোকানদাররা এসে দেখে, শাটার নামানো থাকলেও খোলা। তোলার পর দেখা যায়, ঘরের মধ্যেই পড়ে আছে। সেই একই মোডাস অপারেন্ডি। গলার নলি কাটা। আর আশপাশের তিন-চারটে ইনভার্টারের ব্যাটারি ভাঙা। গতকাল রাতেই মার্ডার হয়েছে। চলুন, আমাদের এখুনি স্পটে যেতে হবে!"

সবাই উঠে বেরোতে যাচ্ছিল, শুধু রুদ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টেবিলে লেটারপ্যাডে কী যেন কাটাকুটি করছিল। মুহূর্তের মধ্যে পিছু ডাকল ও, "এক সেকেন্ড শুনুন সবাই। আমার তিন নম্বর পয়েন্টটা বলা হয়নি এখনো। ছ'টা খুনের তারিখগুলো দেখুন। ১৫ই জানুয়ারি, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১১ই মার্চ, ১৫ই এপ্রিল, ১৩ই মে এবং গতকাল ১০ই জুন। ক্যালেন্ডারের দিকে তাকান। তারিখগুলো দেখে কিছু বুঝতে পারছেন?"

সবাই দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল।

কেউ কিছু বলার আগে প্রথম মুখ খুললেন লোকেশ ব্যানার্জি। সবার আগে তিনি আঙুল উঁচিয়ে অস্ফুটে বললেন, "প্রতিটা দিনই বুধবার!"

অরণ্যপ্রান্তে এক চতুষ্পাঠী। চতুষ্পাঠী বলতে একটি মৃৎকুটির। বাঁশ-দড়ি -খড় দিয়ে বানানো। মাটির দেওয়াল। সযত্নে নিকনো মেঝে। বাইরে একটি বড় কাপড়ের ওপর জ্বলজ্বল করছে রক্তরঞ্জিত হস্তাক্ষর, ”নারায়ণী চতুষ্পাঠী।'
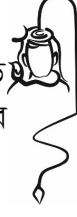
সেই কুটিরের একেবারে বাইরে দণ্ডায়মান প্রহরীসম দুই আমগাছ।

কুটিরের সামনের অনেকটা জায়গা জুড়ে লম্বা চাটাই বিছনো। সেখানে বসে এখন পাঠ অধ্যয়ন করছে বেশ কয়েকজন ছাত্র। তরুণ শিক্ষক মহাশয় বসে আছেন কুটিরের বাইরে একটি বেদিতে। তিনি এই চতুষ্পাঠীরই বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র। তাঁর কাজ কনিষ্ঠদের বেদ অধ্যয়নপ্রস্তুতির বিদ্যাদান করা। তিনি মৃদুভাষ্যে ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। একপাশে পড়ে রয়েছে বেত্রদণ্ড।

শিক্ষক থেকে ছাত্র, প্রত্যেকের মস্তক মুণ্ডিত। মাথার পেছনে ঝুলছে দীর্ঘ ব্রহ্মশিখা। সকলেরই পরনে ধুতি ও ফতুয়া।

চতুষ্পাঠী অর্থাৎ যেখানে চার বেদের পাঠ দেওয়া হয়। শুধুই চতুর্বেদ নয়, সঙ্গে পড়ানো হয় ষড়ঙ্গ। অর্থাৎ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। পড়ানো হয় ষড়দর্শন। অর্থাৎ, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। বিভিন্ন উপনিষদ ও সংহিতা। চারটি শ্রেণীতে প্রায় সত্তরটি ছাত্র পড়াশুনো করে।

কুটিরের একবারেই পাশে পূজামণ্ডপ। আটচালা ঘর। সেই ঘরের ভেতরে চলে উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষা। এই চতুষ্পাঠীর গুরুমহাশয় স্বয়ং সেখানে পড়ান নব্যন্যায়, বেদান্তের মতো পাঠ। পাঠান্তে ছাত্রদের বসতে হয় ন্যায়, তর্ক বা স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষায়। অতি পারদর্শিতার প্রমাণ মিললে তখন তারা কেউ ভূষিত হয় 'ন্যায়রত্ন' আখ্যায়, কেউ 'তর্কবাগীশ', আবার কেউ বা 'কাব্যতীর্থ'তে।

আজ অবশ্য একটি ব্যতিক্রমী দিন। তরুণ শিক্ষক বললেন, "আজকের মতো পাঠ এখানেই সমাধা হল বাবা সকল। মধ্যাহ্নভোজ দ্রুত সেরে নাও। আজ গুরুদেব পদধূলি দিয়েছেন এখানে। তিনি স্বয়ং তোমাদের জ্ঞানের পরীক্ষা নেবেন।"

ছাত্ররা সকলেই তেরো-চোদ্দো বছর বা তার নীচের বালক। শিক্ষকের কথা শুনে তাদের মুখে ভয়ের ছাপ পড়ল। নিজেদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন করতে করতে তারা আসন গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সারিবদ্ধভাবে চলল অদূরে অবস্থিত ভোজনশালার দিকে।

ঘন অরণ্য কেটে প্রসারিত করা হয়েছে এই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। চতুষ্পাঠীর পাশেই রন্ধনশালা, ভাণ্ডারঘর। পাচকেরা সেখানে ইতিমধ্যেই সার দিয়ে বিছিয়ে দিচ্ছে কলাপাতা।

আয়োজন সামান্য কিন্তু পুষ্টিকর। ভাত, চালকুমড়োর বড়া, আমড়া-মুকুলের মটর ডাল, লাউসেদ্ধ, জলপাইয়ের মাখা চাটনি। শেষপাতে সামান্য ক্ষীর।

সবই পার্শ্ববর্তী খেতের উৎপন্ন হওয়া ফসল। এছাড়া ভাণ্ডারঘরের পাশেই রয়েছে গোশালা।

আহার প্রারম্ভের আগে সবাই করজোড়ে একসঙ্গে বলতে লাগল, "ওঁ শ্রী জনার্দনায় নমঃ। ওঁ শ্রী জনার্দনায় নমঃ। ওঁ শ্রী জনার্দনায় নমঃ।"

সারিতে একেবারে প্রথমে বসা দ্বাদশবর্ষীয় বালকটি তার সহপাঠীকে অস্ফুটে বলল, "একিরে দ্বারিকা, আজ নিরামিষ ব্যঞ্জন? ধুর!"

দ্বারিকা নামক বালকটি প্রত্যুত্তর করল, "এই অচ্যুত! এসব কী বলছিস? আজ না একাদশী? তার ওপর ভরণী নক্ষত্রে অতিগন্ড যোগ। আমিষ খাওয়া যে মহাপাপ রে! উপনয়ন হয়েছে পাঁচমাসও পুরেনি।"

"আমিষ না থাক, একটু আলু দিলেও তো পারে বল!" অচ্যুত ঠোঁট উল্টে বলল।

"আলু?" দ্বারিকা ভ্রূ কুঞ্চিত করল, "মানে আলো? আতপ চাল?"

"ধুস! আলু এক ধরনের সবজি। তরিতরকারিতে দেওয়া হয়।" অচ্যুত সামান্য গলা নামিয়ে বলল, "দারুণ খেতে শুনেছি। বাইরে সবাই খায়।"

ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে উঠল দ্বারিকার মুখ, "বাইরে! সেটা তুই ... তুই জানলি কী করে?"

"না জানার কি আছে? মধুসূদনদা'রা গিয়ে মাঝে মাঝেই বাইরের জল বাতাস খেয়ে আসছে, আর আমরা জানলেই দোষ?" অচ্যুত রহস্যময় হাসি হেসে কথাটা গিলে ফেলল, "ভালো লাগেনা। খেয়েদেয়ে কোথায় একটু শীতলপাটি বিছিয়ে ঘুম দেব, তা না। আবার ওই রোদের মধ্যে গিয়ে বসে থাকো।"

দ্বারিকা এবার ভয়ার্তমুখে এদিক ওদিক তাকাল। চতুষ্পাঠীতে নিয়ম শৃঙ্খলা অতি কঠোর। তার ওপর আজ বুধবার। প্রতি বুধবার গুরুদেব স্বয়ং অধিষ্ঠান করেন এখানে।

বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যরা চারদিকে তাই অতিসতর্ক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনোরকম বেচাল দেখলে তৎক্ষণাৎ অভিযোগ যাবে গুরুদেবের কাছে।

আর তারপর? দ্বারিকা সেই ভয়ঙ্কর শাস্তিগুলোর কথা ভেবে ভীত হয়ে উঠল। কথা না বাড়িয়ে সে আহারে মনোনিবেশ করল।

অচ্যুত ওইরকমই, কোনো ভয়ডর নেই। কিন্তু ওর আছে।

ভোজন সারা হলে ওরা গিয়ে আবার বসল কুটিরের সামনের চাতালে।

কিছু পরেই এলেন গুরুদেব। ওদের এই বৈদিক সমাজের প্রধান। যদিও তিনি সর্বক্ষণ এখানে থাকেন না। সমাজের কল্যাণার্থে তাঁকে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়। সমগ্র বৈদিক সমাজ এই বুধবারের পুণ্যদিবসে তাঁর সাক্ষাৎ পায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে তিনি আসেন, আবার বুধবার গভীর রাতে চলে যান। আগে তাঁর আসা অনিয়মিত হলেও গত একবছর ধরে সাপ্তাহিক এই আগমন সুনির্দিষ্ট। তাঁর আগমন ও প্রস্থানলগ্নে উপাসনামন্দির থেকে সজোরে বেজে ওঠে শঙ্খ।

গুরুদেবের বয়স পঞ্চাশোর্ধ, কিন্তু চেহারা ঋজু। তিনি দীর্ঘাঙ্গী, পুরুষ্টু শ্মশ্রুগুম্ফে লেগেছে শুভ্রতার ছাপ, তবু বয়স এখনো তাঁকে একটুও ন্যুব্জ করতে পারেনি। একটি ধবধবে সাদা ঘোড়ায় তিনি টহল দেন গোটা গ্রাম। সেই ঘোড়ার নাম দেবদত্ত। দেবদত্তকে দেখলে মনে হয় যেন কোন তেজী পক্ষীরাজ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে মর্ত্যে। দেবদত্ত যখন গুরুদেবকে নিয়ে গ্রামের মধ্যে বিচরণ করে, তখন গ্রামের প্রতিটি কুটির থেকে মানুষজন বেরিয়ে আসে। দূর থেকে পরমভক্তিতে তারা প্রণাম করে এই সিদ্ধপুরুষকে।

নারায়ণী চতুষ্পাঠীর এই শ্রেণীর ছাত্ররা যখন ছোট ছিল, তখন গুরুদেবের অন্য একটা ঘোড়া ছিল। তার নামও ছিল দেবদত্ত। সে মারা যেতে সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে একে আনা হয়েছিল।

ঘোড়া পালটায়, নাম একই রয়ে যায়।

দেবদত্তর পৃষ্ঠদেশ থেকে লাফিয়ে নামলেন গুরুদেব। গম্ভীর মুখে উঠে এলেন নারায়ণী চতুষ্পাঠীর চাতালে।

ছাত্রদের যিনি নিয়মিত শিক্ষাদান করেন, সেই তরুণ শিক্ষক প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। দেখাদেখি ওরাও। গোটা চাতাল নিঃশব্দ।

ওরা সকলে গুরুদেবকে প্রতি বুধবার প্রত্যুষের সূর্যপ্রণামের সময় দেখতে পায়। প্রধান পুষ্করিণীতে স্নান সেরে গুরুদেব পূর্বে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করেন। উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন,

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতি্

ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।

উষা উদ্ধন্তি সমিধানে অগ্না উদ্যনৎ সূর্য উর্বিয়া জ্যোতিরশ্রেৎ।

দেবো নো অত্র সবিতা ন্বর্যং প্রাসাবীদ্বিপৎত্র চতুষ্পসদিত্যৈ।।

ওদের রোমকূপ শিহরিত হয়ে ওঠে। দূর থেকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করে ওরা। শুধু ওরা নয়, ওদের বাবা মা-রাও। ওদের এই সমাজের সকলে দেবজ্ঞানে ভক্তি করে গুরুদেবকে।

সারাবছরে চলা নানা পুণ্য তিথির মধ্যে একমাত্র মহোৎসবেই উপস্থিত থাকেন গুরুদেব। সেইদিন ওরা সকলে তাঁর পবিত্র পদস্পর্শ করার অনুমতি পায়।

গুরুদেব আসনে বসলেন না। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে দেখলেন গোটা শ্রেণীকে। স্মিতমুখে বললেন, "জয় কৃষ্ণ! কেমন শাস্ত্র অধ্যয়ন হচ্ছে বাবাসকল? মধুসূদন কেমন পড়াচ্ছে তোমাদের?"

ওরা প্রত্যেকে ইতিবাচক মাথা নাড়ল। মধুসূদন নামক তরুণ শিক্ষক আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গুরুদেব বললেন, "বেশ। প্রথমে সামান্য পরীক্ষা নিই। তুমি বলো তো বাবা, আগম ও নিগম কী?"

যাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নবাণ, সেই বালক উঠে দাঁড়াল। করজোড়ে প্রণাম করে বলল, "আগম ও নিগম বেদেরই অন্য দুই নাম, গুরুদেব।"

"হেতু? বেদের সঙ্গে কী এদের সম্পর্ক?"

"আগম অর্থাৎ যা ঐতিহ্যরূপে আমাদের কাছে এসেছে। আর যা জীবনের মূল সমস্যাগুলির স্পষ্ট ও নিশ্চিত সমাধান নির্দেশ করে, তাই নিগম। বেদ কথাটির উৎপত্তি 'বিদ' ধাতু থেকে। অর্থাৎ জানা।" ছাত্রটি গড়গড় করে বলে গেল।

সে এই শ্রেণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র। নাম বনমালী।

"বেশ। আরণ্যক কী?"

বনমালী এবারও আলোকিতমুখে বলে গেল, "বেদ চারপ্রকার। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। এই প্রতিটি বেদ আবার চার অংশে বিভক্ত। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। আরণ্যক অংশে রয়েছে বনবাসী তপস্বীদের যজ্ঞভিত্তিক বিভিন্ন ধ্যানের বর্ণনা।"

"উত্তম। অতি উত্তম!" গুরুদেব একবার প্রশান্তির হাসি হাসলেন, "তুমি বসো বাবা। মহাপণ্ডিত হও। আচ্ছা, তুমি ওঠো তো।"

অকস্মাৎ আহ্বানে তিরবিদ্ধ পক্ষীর মতো উঠে দাঁড়াল দ্বারিকা। তার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। কোনোমতে সে করজোড়ে প্রণাম করল।

"বৃহদারণ্যক উপনিষদ কে প্রণয়ন করেন?"

দ্বারিকা প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন থমকে গিয়েছে। উপনিষদ রয়েছে দুশোরও বেশি, বিভিন্ন সময়কালে রচনা করেছেন বিভিন্ন ঋষি। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে বাইশটি হল প্রাচীনতম। বৃহদারণ্যক উপনিষদও সেই বাইশটির মধ্যে একটি।

ঈশোপনিষদ, কেনোপনিষদ, মান্ডুক্য উপনিষদ, ঐতরেয় উপনিষদ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ, প্রতিটির প্রণেতার নাম মনে পড়ছে দ্বারিকার, কিন্তু এই অতিসহজ প্রশ্নের উত্তরটা কিছুতেই মনে করতে পারছে না। তার জিহ্বা জড়িয়ে যেতে লাগল, হাতের তালু ঘর্মাক্ত হতে শুরু করল।

"কী হল বাবা? বলো?"

"ঋষি ... ঋষি বাল্মীকী?" মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল দ্বারিকার। আর বলামাত্র অনুভব করল, বড় ভুল হয়ে গেল।

গুরুদেব বিস্মিত, "রামায়ণের প্রণেতা মহাকবি বাল্মীকিকে দিয়ে তুমি উপনিষদ রচনা করাচ্ছ, বাবা?"

লজ্জায় অধোবদন হয়ে দ্বারিকা যুক্তকর গরুড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

"বোসো। আর তুমি?" ব্যথিত গুরুদেব এবার পাশে বসে থাকা অচ্যুতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, "তুমি এর কী উত্তর দেবে? ব্যাসদেব?"

অচ্যুত উঠে দাঁড়াল। প্রণাম টণামের বালাই নেই। ব্রহ্মশিখা দুলিয়ে সে বলল, "কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কেন লিখতে যাবেন? বৃহদারণ্যক উপনিষদ তো রচনা করেছিলেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। যাকে গার্গী জনকরাজার সভায় প্রায় হারিয়েই দিয়েছিলেন, নেহাত যাজ্ঞবল্ক্য কায়দা করে বেরিয়ে গেলেন তাই!"

"কায়দা করে?" গুরুদেব বিস্মিত হলেন। তাঁর চতুষ্পাঠীতে এইরকম শব্দ কেউ ব্যবহার করার স্পর্ধা দেখায় না।

"তা নয়তো কী?" অচ্যুত বলে যেতে লাগল, "যেই যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর ব্রহ্ম কোথায় ওতপ্রোত রয়েছে-র উত্তর দিতে পারলেন না, অমনি বলে উঠলেন, "গার্গী! মা অতিপ্রাক্ষীঃ! অতিপ্রশ্ন করোনা গার্গী। তোমার মাথা খসে পড়বে। একজন নারীর কাছে পরাস্ত হতে আসলে তাঁর পুরুষ অহং বাধা দিচ্ছিল।"

গুরুদেব বিস্মিত হলেন। বালকের অর্বাচীন শব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও অবাক হলেন শাস্ত্র অতিক্রম করে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও মতামতের প্রসার দেখে। এমন বালকই সম্পদ। জ্ঞানী অথচ তেজি।

কিন্তু সামান্য ভুলচালনায় বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। নিজস্ব চিন্তাভাবনাই বিপদের উৎস।

তিনি মুখে বললেন, "উত্তম। বোসো। আমি জানি, গোবর্ধন বা মধুসূদনরা তোমাদের উত্তম শিক্ষা দিচ্ছে। তবু আজ সময় এসেছে আরও বিশদ জানার। আজ থেকে আমাদের আরাধ্য পরমগুরু সম্পর্কে প্রতি বুধবার আমি তোমাদের কিছু কিছু বলব। কলিযুগের এক অত্যন্ত পুণ্যলগ্নে তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ধন্য করেছিলেন মর্ত্যলোককে। এতদিন তোমরা শুধু তাঁকে উপাসনা করে এসেছ, বিষ্ণু মন্দিরের বাইরে স্থাপিত তাঁর মৃন্ময় মূর্তিকে আরাধনা করেছ। তিনি স্বয়ং ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

"আজ তাঁর মানবরূপ সম্পর্কে বলব তোমাদের। বলব অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম সুপণ্ডিত সম্বন্ধে। বলব, তাঁর অসম্পূর্ণ ক্রিয়ার বিষয়ে। প্রথমেই বলব, পরম গুরুর জাগতিক নাম কী ছিল।"

অচ্যুত বলে উঠল, "আমি জানি। জগন্নাথ! জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।"

গুরুদেব প্রবল বিস্ময়ে পাশে দণ্ডায়মান তরুণ শিক্ষক মধুসূদনের দিকে তাকালেন, "একি! পরমগুরুর পার্থিব নাম কি তুমি আগেই বলে দিয়েছ? আমার কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও?"

মধুসূদন সভয়ে মাথা নাড়লেন। আশ্রমের নিয়ম, আশৈশব ছাত্রদের পরম গুরুকে আরাধনা করা শেখানো হবে, তারপর এক শুভতিথিতে গুরুদেব স্বয়ং সব জানাবেন। তার অন্যথা হওয়া যে গুরুতর অপরাধ!

তিনি বললেন, "না গুরুদেব। আমি একবারও ওই নাম উচ্চারণ করিনি এদের সামনে। প্রত্যয় না হলে আপনি প্রশ্ন করুন অন্য ছাত্রদের।"

মধুসূদনের কথা মিথ্যা নয়। অন্য কোনো ছাত্রই পরম গুরুর নাম আগে শোনেনি।

"তবে তুমি? তুমি কোথা থেকে জানলে?"

অচ্যুত চুপ করে রইল। তারপর বলল, "উপাসনাগৃহে একদিন আলোচনা হচ্ছিল। আমি পিছনের জানলা দিয়ে শুনেছি। অন্যায় হয়ে গিয়েছে গুরুদেব। আর হবে না।"

গুরুদেব এই কিশোরের স্পর্ধায় স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে রইলেন। পরক্ষণে তাঁর মনে হল, রাজমণ্ডপে আড়ি পাতার মতো অচিন্ত্যনীয় অপরাধ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে এই কিশোর, তাতে এখন সর্বসমক্ষে প্রতিক্রিয়া দেখালে অন্য বালকদেরও সেই ইচ্ছা হতে পারে। বয়সটাই যে এই। নিষেধ যেদিকে, সেইদিকে পতঙ্গের মতো ছুটে যেতে চায় মন। তার থেকে ব্যবস্থা গোপনে নিতে হবে।

তিনি মুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। বললেন, ”আমি গল্পচ্ছলে পরম গুরুর কীর্তি তুলে ধরব তোমাদের কাছে। তবেই তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে তোমাদের সুবিধা হবে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের নবরত্নসভার উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে,

তার ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ

সভাস্থের কিবা কার নিজ বিদ্যাকূপ।।

সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ

তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবনবিখ্যাত।।”

কথা শেষ করে কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন গুরুদেব। চোখ বন্ধ করে বললেন, ”তিনি জগন্নাথ। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। ঈশ্বর শ্রী শ্রী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।”

ষষ্ঠ খুনটা হয়েছে ত্রিবেণীর ভট্টাচার্য পাড়ায়। জয়ন্তর চেনা, তাই সটান দোকানের সামনে সরাসরি উপস্থিত হতে অসুবিধা হল না। আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল, ত্রিবেণী থানার ওসি দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে স্যালুট ঠুকলেন। বললেন, "কমিশনারেট থেকে ফোন এসেছিল ম্যাডাম। আমি ত্রিবেণী থানার অফিসার ইন চার্জ সুকেশ সান্যাল। এদিকে আসুন।"

ভট্টাচার্যপাড়াটা ছিমছাম একটি পাড়া। পরপর একতলা দোতলা বাড়ি। সামনে পেছনে সবুজ গাছগাছালি। পাতকুয়ো। বাগান। কোনো ফ্ল্যাটবাড়ি তেমন চোখে পড়ছে না। এই দোকানটাও একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনের অংশে। দোকানের সামনে তিন-চারমিটার ব্যবধানে পুলিশ থেকে ব্যারিকেড দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যারিকেডের এপারে জটলা করেছে পনেরো-কুড়িজন মানুষ। তাঁদের মুখে আতঙ্ক।

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে সেই জটলায় দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, অনুপমদা!"

অনুপম নামক ভদ্রলোক মুখ ফেরালেন। বললেন, "ওহ, জয়ন্ত। দ্যাখো না, সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি এই কাণ্ড। ব্রিজেশকে কারা খুন করে গেছে। পাড়ার মধ্যে একি সাংঘাতিক ব্যাপার বলো তো! ব্রিজেশ তো লোক ভালো ছিল বলেই জানতাম, কারুর সাতে পাঁচে থাকত না বলো!"

জয়ন্ত কথা বলতে লাগল। রুদ্র ওসি সুকেশ সান্যালের সঙ্গে এগিয়ে গেল দোকানের দিকে।

বডি এর মধ্যেই নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য। যেখানটা বডি পড়েছিল, সেখানটা সাদা চক দিয়ে মার্ক করা। কালচে হয়ে শুকিয়ে রয়েছে রক্ত। ছোট বর্গাকৃতি দোকানে যে'কটা ইনভার্টার এবং ব্যাটারি রয়েছে, সেগুলো তোবড়ানো। ধারালো কিছু দিয়ে বারবার আঘাত করা হয়েছে তাদের ওপর।

রুদ্র এগিয়ে গেল। ব্যাটারির ওপর যে আঘাত, তাতে কালচে ছোপ। আশপাশেই কিছু কালচে ছোপ লেগে রয়েছে।

সন্দেহ নেই, আততায়ী যে অস্ত্র দিয়ে ব্রিজেশ তিওয়ারিকে খুন করেছে, সেই অস্ত্র দিয়েই খুনের পর এগুলোর ওপর আঘাত করেছে। ও বলল, "কোনো শার্প ওয়েপন দিয়ে গলাটা কাটা হয়েছে। এই ব্লাড স্যাম্পলগুলো ফরেনসিকে পাঠান।"

"ওকে ম্যাডাম।" ওসি সুকেশ সান্যাল বললেন, "মনে হচ্ছে কাল রাত বারোটা নাগাদ মার্ডারটা হয়েছে। আমরা যখন এলাম, রাইগর মর্টিস শুরু হয়ে গিয়েছিল।"

রুদ্র বলল, "এই বাড়িটা তো বিশাল আর বহু পুরোনো দেখছি। ব্রিজেশ তিওয়ারিরই?"

সুকেশ সান্যাল মাথা নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই এগিয়ে এল জয়ন্ত, "না না। এ তো ত্রিবেণীর বিখ্যাত বাড়ি ম্যাডাম। এখন বহু শরিক থাকে। ব্রিজেশ একটা

শরিকের অংশে ভাড়া থাকত। ওর আদি বাড়ি বিহারে, সেখানেই পরিবার থাকে। দোকানের অংশটাও ভাড়া নেওয়া।”

রুদ্র বাড়িটার দিকে তাকাল। প্রকাণ্ড বড় ঠাকুরদালান, তার একদিকে তালাবন্ধ পারিবারিক মন্দির। ঠাকুরদালানকে মধ্যিখানে রেখে প্রায় চার-পাঁচ বিঘার ওপর দানবাকৃতি প্রাসাদ। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এদিক ওদিক মাথা উঁচু করে রয়েছে বট-অশ্বত্থ গাছ।

একেকটা মহলের মাঝখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে আম কিংবা কাঁঠাল গাছের উপরিভাগ। বিশাল এই বাড়ির এদিক ওদিক জানলায় ও বারান্দায় জামাকাপড়ের অস্তিত্ব দেখে এটা স্পষ্ট যে, গোটা বাড়িতেই এখনো লোকজন বসবাস করেন।

বাড়িটার মধ্যে দিয়ে ঢুকে গিয়েছে সরু সরু গলি। সেই গলির ভেতরেও প্রসারিত হয়েছে এই প্রাসাদের শাখাপ্রশাখা।

রুদ্র কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ঘুরে ঘুরে চারদিকে বাড়িটা দেখল প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ঠাকুরদালানের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন গোটা বাড়িটা গিলে খেতে আসছে।

একসময় ও বলল, ”বিখ্যাত বাড়ি কেন?”

জয়ন্ত বলল, ”এটা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বসতবাড়ি ম্যাডাম। উনিই এই গোটা বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। এখন অবশ্য প্রচুর শরিক। ভেঙে ভেঙে পড়ছে।”

”জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন?” রুদ্র ভ্রূ কুঁচকে বলল, ”কে তিনি?”

জয়ন্তের মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটে উঠল।

”একি ম্যাডাম, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম শোনেননি?” পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল ও, ”অবশ্য ত্রিবেণীর লোকেরাই তাঁকে ভুলতে বসেছে, আর আপনি বাইরের মানুষ হয়ে জানবেন কী করে! ওইদিকে তাকান।”

বাড়ির দক্ষিণদিকে জয়ন্তর আঙুল বরাবর তাকিয়ে রুদ্র একখানা শ্বেতপাথরের স্ট্যাচু দেখতে পেল। একজন মুণ্ডিত মস্তক ব্যক্তির আবক্ষ স্ট্যাচু। গায়ে উড়নি, মাথায় দীর্ঘ টিকি। নীচে একখানা ফলক।

ও এগিয়ে গিয়ে দেখল,

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সুপণ্ডিত ও অসামান্য শ্রুতিধর

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

জন্ম ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ

রুদ্রর একটা স্থানে চোখ আলাদা করে আটকে গেল। জন্ম - ১৬৯৫ সাল। মৃত্যু — ১৮০৭ সাল? মানে এই পণ্ডিত ১১২ বছর বেঁচেছিলেন?

জয়ন্ত রুদ্রর মনের কথাটা বুঝতে পেরে গেল। বলল, ”হ্যাঁ ম্যাডাম। উনি ১১২ বছর বেঁচেছিলেন। শেষেও নাকি মারা যাননি, গঙ্গার ঘাটে স্বেচ্ছায় অন্তর্জলি যাত্রা করেছিলেন। অসম্ভব শ্রুতিধর এবং মহাপণ্ডিত ছিলেন। তখন তো সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান ছিল নবদ্বীপ। কিন্তু ইনি একাই নবদ্বীপের সেই ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিয়েছিলেন। ত্রিবেণীর জগন্নাথ ঘাটও ওঁর নামে। সারা ভারতবর্ষ একডাকে চিনত। গায়ে প্রচুর লোম ছিল। তাই লোকে বলত ত্রিবেণীর লোমশ পণ্ডিত। এঁর সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত মিথ চালু আছে ম্যাডাম। অবিশ্বাস্য অনেক কিংবদন্তী ঘোরে লোকমুখে। জানিনা সেগুলো কতটা সত্যি।”

”কীরকম?” রুদ্র জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, তার আগে সুকেশ সান্যাল এগিয়ে এলেন, ”ম্যাডাম, আপনি কি দোকানের ভেতরটা আর দেখবেন? নাহলে আমরা শাটার নামিয়ে সিজ করে দেব।”

”হ্যাঁ আরেকবার দেখব। চলুন।”

ব্রিজেশ তিওয়ারির দোকানের ভেতরটা ছিমছাম। একদিকে একটা টেবিল, তার ওপরে পুরনো খবরের কাগজ, টেবিলের ড্রয়ারে হিসেবের খাতা। অন্যদিকের দেরাজে কয়েকটা ফাইল, তাতে কোম্পানির ক্যাশমেমো। ইনভার্টার বা ব্যাটারিগুলোর হামলা চললেও খাতাপত্র ফাইলগুলো অবিকৃত রয়েছে।

রুদ্র দেখতে দেখতে বলল, ”জয়ন্ত, দোকানটা কতদিনের পুরোনো?”

জয়ন্ত বলল, ”তিন-চারবছর।”

”ব্রিজেশ তিওয়ারি পাড়ার মধ্যে দোকান করেছিল কেন? এইসব দোকান সাধারণত বাজার তল্লাটে থাকে।”

”হ্যাঁ। আসলে আমাদের এই এলাকাটায় অনেকটা বড় জায়গা জুড়ে কোন ইনভার্টারের দোকান নেই, তাই হয়তো। আর ও বা ওর কর্মচারী খুব হেল্পফুল ছিল। যারা যারা ওর কাছ থেকে কিনেছে, সবার বাড়ি বছরে তিন-চারবার গিয়ে ফ্রিতে সার্ভিসিং বা জল ভরে দিয়ে আসত। তাই অল্পদিনেই বেশ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।”

রুদ্র জিজ্ঞাসুচোখে বলল, ”ওর কর্মচারী? কোথায় সে? তাকে তো দেখিনি এসে থেকে!”

”বাড়ির মধ্যেই আছে। অলোক। ব্রিজেশ এখানে দুটো ঘর নিয়ে একা থাকত। যখন যে ওর দোকানে কাজ করত, সে একটা ঘরে থাকত।” সুকেশ সান্যাল বললেন, ”একটু আগেই আমি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আপনি চাইছেন, আমি আবার ডেকে পাঠাচ্ছি। এই সুজিত, ডেকে আনো তো।”

একজন কনস্টেবল ডাকতে যাচ্ছিল, রুদ্র বাধা দিল, ”না, আমরাই যাচ্ছি। ব্রিজেশ তিওয়ারির ঘরটাও দেখব।”

দোকানের পাশ দিয়েই দু'হাত চওড়া গলি। সেই গলি দিয়ে যেতে যেতে রুদ্র জিজ্ঞেস করল, ”যে শরিকের অংশে ব্রিজেশ ভাড়া থাকত, তার নাম কী?”

”সোমনাথ। সোমনাথ ভট্টাচার্য।” জয়ন্ত বলল, ”জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের আসল পদবি ছিল ভট্টাচার্য। সোমনাথবাবু থাকেন মালদায়, সেখানে চাকরি করেন। তাই তাঁর অংশটা বরাবরই ভাড়া দেওয়া।”

ব্রিজেশের সহকারীর নাম অলোক। তার বয়স উনিশ-কুড়ি। ঘরের মধ্যে বসেছিল, পুলিশ আসামাত্র পাংশুমুখে এসে দাঁড়াল।

রুদ্র জিজ্ঞেস করল, ”তোমার নাম কী?”

”অলোক যাদব।”

”বাড়ি কোথায়?”

”আসানসোলের কাছে, বার্নপুর।”

”এদিকে কবে এসেছ?”

”ব্রিজেশভাইয়া ডাকার পর, পাঁচ-ছ'মাস হল।”

”ব্রিজেশ তিওয়ারি তোমার আত্মীয় ছিল?”

”হ্যাঁ। আমার মায়ের এক চাচার ছেলে।”

"ব্রিজেশভাইয়া ডাকলেই তুমি চলে এলে কেন? কত টাকা মাইনে দিত তোমায়?"

"আমি বারোক্লাস পাশ করে এদিক ওদিক ধান্দা করছিলাম। ভালো কিছু পাচ্ছিলাম না। এদিকে ব্রিজেশ ভাইয়ের এখানে যে কাম করত, সে হঠাৎ কিছু না বলে চলে গিয়েছিল। তাই ব্রিজেশভাইয়া ডাকতেই চলে এসেছিলাম। থাকা ফ্রি, সঙ্গে মাসে ছ'হাজার।"

"কাল রাতে কী হয়েছিল? যতটুকু জানো, ডিটেইলে বলো।"

অলোকের মুখটা এবার কালো হয়ে গেল। বলল, "কাল রাতে আমি আর ব্রিজেশভাই একসাথে রাতের খাওয়া সারলাম। আমরা রান্নাবাড়া একসাথেই করতাম। রাতে রোটি পাকাতাম আমি, সবজি বানাত ব্রিজেশভাই। কাল রাতে খাওয়াদাওয়া মিটতে মিটতে সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল। নিজের ঘরে ফিরে আসি সাড়ে এগারোটা নাগাদ। তারপর আর আমি কিছু জানি না।"

"সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা, এই এক ঘণ্টা কী করছিলে?"

"ব্রিজেশভাইয়ার ঘরে বসে দুজনে টিভিতে গানা খাজানা দেখছিলাম। রোজই দেখি। দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা দেড় ঘণ্টা হয়।"

"ব্রিজেশ কখন দোকানে গেল, তুমি টের পাওনি?"

"না। আমাদের দুজনের ঘরের সামনেই তো বারান্দা। ব্রিজেশ ভাইয়া ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে বাইরে গিয়েছে। চাবি ওর কাছেই থাকত। আমি সকালে উঠে ডাকতে গিয়ে দেখি দরজা খোলা। তখন দোকানের দিকে যাই। দেখি, শাটার অর্ধেক নামানো। আর ...।" অলোকের গলা ধরে এল।

"তুমি রাতে কোন শব্দ পাওনি?" রুদ্র কথা বলতে বলতে অলোকের ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল। আট বাই আটের খুবই বাহুল্যহীন ঘর। একপাশে একটা বড় ট্রাঙ্ক। দেওয়ালে গণেশের ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার।

"না।" অলোক বলল, "আমি ঘুমিয়েছি বারোটার সময়। কোনো শব্দ পাইনি তখনও অবধি।"

রুদ্র ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে ওসিকে বলল, "ব্রিজেশ তিওয়ারির ঘরে চলুন। আর এই ছেলেটি যেন এখন স্টেশন লিভ না করে। জয়ন্ত, অলোকের আগে ব্রিজেশ তিওয়ারির কাছে কে কাজ করত?"

জয়ন্ত বলল, "এটা আমি ঠিক বলতে পারব না, কয়েকমাস এদিকে আসা হয়নি। এক মিনিট।"

মিনিট দুয়েকের মধ্যে আর এক বয়স্ক ভদ্রলোক এলেন।

"ইনি আরেকজন শরিক। মধুময় ভট্টাচার্য। পাশেই থাকেন।"

মধুময়বাবু বললেন, "ব্রিজেশের দোকানে অলোকের আগে কাজ করত কানাই। বেশিদিন করেনি। ওই মাসচারেক। কোন এক গ্রাম থেকে দুম করে এসেছিল, আবার দুম করে উধাও হয়ে গেল।"

"দুম করে এসেছিল মানে?"

মধুময়বাবু বললেন, "আমি একদিন ব্রিজেশের দোকানে বসেছিলাম। দেখি একটা ছেলে সারাদিন সামনের ক্লাবের চাতালে জড়সড় হয়ে বসে আছে। বিকেলের দিকে ব্রিজেশ

ডাকল। চা-বিস্কুট খাওয়াল। নাম বলল কানাই, অজপাড়াগাঁয়ের ছেলে, বাড়িতে ঝগড়া করে চলে এসেছে। ব্রিজেশ এমনিতেও একটা কাজের ছেলে খুঁজছিল, কিন্তু বেশি পয়সা দিতে পারবে না বলে তেমন কাউকে পাচ্ছিল না। কানাইকে বলতে সে লুফে নিল প্রস্তাব।"

"তারপর?"

"তারপর কানাই কাজ করতে লাগল। এমনিতে খাটিয়ে ছেলে, ঘাড়ে করে ব্যাটারি বওয়া থেকে শুরু করে সব কাজ করত। কিন্তু একটু ক্যাবলা টাইপ। রোজ অন্তত তিনঘণ্টা ধরে পুজো-আচ্চা করত। আজকালকার জোয়ান ছেলে হয়ে ভাবাই যায়না। তারপর কারুর বাড়িতে ইনভার্টার সেট আপ করতে গেলেই গণ্ডগোল পাকাত। ইলেকট্রিকের কাজ করতে পারত না। হাত কাঁপত। বলতো, জন্মে অবধি ওদের গ্রামে এখনো কারেন্ট পৌঁছয়নি। তাই খুব ভয় পায়। এমনকি মোবাইলও ব্যবহার করতে পারত না। বাধ্য হয়ে ব্রিজেশ ওকে দোকানে রাখত, নিজে যেত লোকের বাড়িতে। এরকম করে চারমাস কাজ করল। তারপর একদিন ব্রিজেশ সকালে উঠে দেখে নেই। শেষ মাসের মাইনেটাও নিয়ে যায়নি। খ্যাপাটে হলে যা হয়।"

"কানাইয়ের কোন ছবি আছে? কিংবা ভোটার কার্ড জাতীয় পরিচয়পত্র?"

"আমার কাছে তো নেই। ব্রিজেশের কাছে ছিল কিনা জানিনা। তবে মনে হয় না আছে।"

রুদ্র জয়ন্তকে ব্রিজেশ তিওয়ারির ঘরটা আরও একবার ভালো করে সার্চ করার নির্দেশ দিয়ে এদিকে ফিরল, "ব্রিজেশ তিওয়ারির সঙ্গে আপনাদের বাড়ির কোনো শরিক বা ত্রিবেণীর কারুর কোনো শত্রুতা ছিল?"

"তেমন তো আমি কিছু জানিনা। এই বাড়িতে আর থাকে কজন। সবই তো প্রায় বাইরে। আমিই যা ভূতের মতো পড়ে রয়েছি! বাকি সব ঘরই প্রায় ভাড়া।"

রুদ্র মন দিয়ে শুনছিল। মধুময়বাবু থামতে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, "আপনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কততম বংশধর?"

"আমি দশম প্রজন্ম।" মধুময়বাবু বললেন, "ওই যে দেখছেন ঠাকুরদালান, ওখানে এখনো দুর্গাপুজো হয়। শুরু করেছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নিজে।"

"তাহলে তো অনেক পুরনো পুজো।"

"তিনশো বছর পুরেছে। শুনেছি, স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্সও এসেছিলেন এই দুর্গাপুজো দেখতে।"

"হুম। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।" রুদ্র আর বাক্যবয় না করে নিহত ব্রিজেশ তিওয়ারির ঘরে ঢুকল। ঘরে টিভি, টেবিল-চেয়ার, আলমারি, মোটামুটি সবই রয়েছে। ডাইনিং টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে রাতের এঁটো থালা-বাটি। চারদিক দেখতে দেখতে রুদ্র জিজ্ঞেস করল, "ব্রিজেশ তিওয়ারির মোবাইলটা পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম।" ওসি বললেন, "ওটা সিজ করে নিয়েছি।"

"গুড। গতকাল রাতে কার সঙ্গে শেষ কথা হয়েছে, সারাদিন কতক্ষণ কার সঙ্গে কথা হয়েছে, সব ট্র্যাক করুন। কানাইয়ের আইডিটা খুঁজুন।" রুদ্র বিড়বিড় করল, "রাতের খাওয়ার পর ব্রিজেশ তিওয়ারিকে দোকানে যেতে হল কেন? কেউ কি তাকে ডেকেছিল?"

৭

গুরুদেব বললেন, "মহাপুরুষের জন্ম যখন সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তখন কোনোভাবেই তা আটকানো যায় না। এই প্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে খাটে পরম গুরুর ক্ষেত্রে। কীভাবে তা বলি। ত্রিবেণীর পণ্ডিত রুদ্রদেব তর্কবাগীশ পাণ্ডিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করলেও মধ্যবয়সে অকস্মাৎ স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হতে তিনি খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। তখন নিত্যানন্দপুরের অদ্বিতীয় জ্যোতিষাচার্য চন্দ্রশেখর বাচস্পতি বসবাস করতেন ত্রিবেণীরই পূর্বপল্লীর বান্দাপাড়ায়। সেখানেই তাঁর চতুষ্পাঠী। রুদ্রদেব তর্কবাগীশ তাঁকে গিয়ে বললেন, সংসারে থেকে অনেক কষ্ট পেলাম, শোকে আকুল হলাম, বংশও লোপ পেল। অধ্যাপনায় আর মনঃসংযোগ করতে পারছি না। কাশীধামে গিয়ে শেষ জীবনটা কাটাতে চাই বাবা বিশ্বনাথের চরণে। আপনি কি বলতে পারেন, আমার অদৃষ্টে শীঘ্রই কাশীযোগ আছে কিনা? নাকি সেখানেও বাধা?"

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি দীর্ঘক্ষণ হস্তগণনা করে বললেন, "কাশীবাস কী, পণ্ডিতমশাই! আপনার ভাগ্যে যে দিগ্বিজয়ী পুত্রলাভ রয়েছে! সেই পুত্র শুধু দেশজোড়া যশ ও প্রতিপত্তির অধিকারীই হবে না, আপনার বংশ দীর্ঘকাল ধরে বহমান হবে।"

গোটা নারায়ণী চতুষ্পাঠীতে সূচিভেদ্য নিস্তব্ধতা। সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনছে গুরুদেবের কথা। অদূরে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে গুরুদেবের ঘোড়া। আরও দূর দিয়ে চার-পাঁচজন কৃষক গরু নিয়ে চলেছে শস্যক্ষেতের দিকে। আকাশে দেখা যাচ্ছে এক ঝাঁক পাখি যারা কোনও সীমানা মানে না।

"রুদ্রদেব তর্কবাগীশ এই কথা শুনে বললেন, "আমার মনে হয়, আপনার তীর্থযাত্রার সময়কাল উপস্থিত হয়েছে জ্যোতিষাচার্য! আপনি নাকি মুর্শিদাবাদে নবাবের নির্ভুল ভাগ্যগণনা করেছিলেন? তা সে-ও কি প্রতারণা করেই? আমার বয়স তেষট্টি বছর। আর আপনি বলছেন, আমি ভবিষ্যতে আবার পুত্রবান হব? রঙ্গরসিকতার একটা মাত্রা থাকা উচিত।"

"ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্রদেব চলে এলেন বটে, কিন্তু হলও তাই। নিকটস্থ গ্রাম রঘুনাথপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ বাসুদেব বাচস্পতির কনিষ্ঠা কন্যাটি দশমবর্ষীয়া হয়ে গেলেও উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছিল না, সেই বৈবাহিক প্রস্তাবই হঠাৎ এল রুদ্রদেবের কাছে। অকালবৈধব্যের আশঙ্কায় কন্যার মা অমত করলেও তা গ্রহণীয় হল না, রুদ্রদেবের সঙ্গে বিবাহ হল বাসুদেব কন্যা অম্বিকার।"

একটানা বলে গুরুদেব কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। তারপর উজ্জ্বল মুখে বললেন, "তার একবছর পরেই আশ্বিনের মহাপঞ্চমীতে ভূমিষ্ঠ হল এক অসাধারণ শিশু। ইংরেজি সাল ১৬৯৫। আপ্লুত রুদ্রদেব তাঁর নাম রাখলেন রামরাম। কিন্তু আবার বিধির বিধান। অম্বিকার পিতা বাসুদেব ব্রহ্মচারী তখন সদ্য ফিরেছেন শ্রীক্ষেত্র পুরী থেকে। তাঁর অনুরোধে নাম পরিবর্তন হল। নতুন নাম হল জগন্নাথ। অর্থাৎ কিনা কৃষ্ণ। এ দৈবলীলা ছাড়া আর কী?"

গুরুদেবের গল্প বলায় আচমকা ছেদ পড়ল। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, অচ্যুত উঠে দাঁড়িয়েছে।

"কী ব্যাপার, বাবা? তুমি কিছু বলতে চাও?"

"হ্যাঁ, গুরুদেব।" অচ্যুত বলল, "আমরা জানি, কলিযুগে স্বর্ণকাল হল অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা।"

"ঠিক। পরম গুরুর আবির্ভাবের পুণ্যে সেইসময় উৎকর্ষতা শীর্ষে পৌঁছেছিল।" গুরুদেব প্রশান্ত মুখে মাথা দোলালেন।

অচ্যুত বলল, "কিন্তু ত্রেতা যুগের রামায়ণে বা দ্বাপর যুগের মহাভারতে তো এমন অসমবিবাহের উল্লেখ ছিল না গুরুদেব।"

"অসমবিবাহ মানে?" ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন গুরুদেব, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

"চৌষট্টি বছরের প্রৌঢ় বিবাহ করছেন দশ বছরের বালিকাকে। কিন্তু, ত্রেতা বা দ্বাপর যুগে তো গৌরীদান ছিল না। পরিণত বয়সে স্বয়ম্বরা হয়ে পাত্রনির্বাচনের স্বাধীনতা নারীদের ছিল। তবে কলিযুগের স্বর্ণকালে এই অধঃপতন কেন?" অচ্যুত ব্যাখ্যা করল।

"অধঃপতন? তোমার দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি।" গুরুদেবের মুখ রক্তাভ হয়ে উঠল, "গৌরীদান শাস্ত্রসিদ্ধ। তাকে অধঃপতন বলার অর্থ তুমি শুধু বৈদিক শাস্ত্রকে নয়, আমাদের সমগ্র বৈদিক সমাজকে তুমি অপমান করছ!"

দ্বারিকা সভয়ে হাত ধরে টেনে নামাতে যাচ্ছিল, কিন্তু অচ্যুত গুরুত্ব না দিয়ে বলল, "কিন্তু গুরুদেব, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও তো পরিণত বয়সে মেয়েদের বিবাহের কথা পাওয়া যায়। পাওয়া যায় তাদের বিদ্যাশিক্ষার কথাও। এমনকি সহমরণের …।"

"চুপ করো, অর্বাচীন! গত সপ্তাহেও তোমার আচরণে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। তোমার স্পর্ধা দেখছি দিনদিন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই মধুসূদন আমাকে একাধিকবার তোমার নানা নিয়মলঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে।" গুরুদেব থরথর করে কাঁপছেন। তাঁর দুই চোখ লাল হয়ে গিয়েছে, তর্জনী উঁচিয়ে বললেন, "তোমার এই প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যের শাস্তি আজ তোমায় পেতে হবে!"

কয়েক মুহূর্ত কাটল।

তারপরই দ্বারিকা আড়ষ্ট হয়ে দেখল, চাতালের বাইরে উপস্থিত হয়েছে কালু কৈবর্ত আর তার দুই সাঙ্গোপাঙ্গ। নিরাবরণ ঊর্ধ্বাঙ্গ, হাঁটু পর্যন্ত মালকোঁচা মেরে পরা ধুতি, মাথায় লাল ফেটি। হাতে বর্শা।

ওরা সাধারণত এদিকে আসে না। রন্ধনশালার বাইরে এসে গোলাপদীঘি থেকে জাল ফেলে তোলা মাছ ফেলে দেয়। কখনো রুই-কাতলা, কখনো আবার মৌরলা, সরপুঁটি, চাঁদা।

পাচকরা সেই মাছ কৈবর্তদের স্পর্শ বাঁচিয়ে নিয়ে নেয়। পরিবর্তে দেয় জমির কপিটা-মুলোটা, কিংবা তিনদিনের চালের খোরাক। বিনিময় প্রথায় বাণিজ্য সেরে খুশিমনে আবার চলে যায় ওরা পল্লির দিকে। পল্লিতেও উপুড় করে দেয় মাছের পসরা। বাড়ির বউরা আধহাত ঘোমটা টেনে কেনে সেই মাছ, বিনিময়ে দেয় ক্ষেতের চাল, সবজি কিংবা গোয়াল থেকে দুইয়ে আনা দুধ।

কিন্তু কালু কৈবর্ত যেদিন তার সীমানা ছাড়িয়ে এসে উপস্থিত হয় পূজামণ্ডপে কিংবা ভদ্রপল্লিতে, তার অর্থ ভয়ংকর। এই গোটা সমাজে গুরুদেবকে অসম্মান করা বা রীতিনীতি অমান্য করার শাস্তি হিসেবে কৈবর্তরা জানে অমানুষিক নির্মম কিছু দণ্ড।

দ্বারিকা ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল। ওর মনে পড়ে যাচ্ছিল ব্রজেন্দ্রদাদার কথা। বেশিদিন নয়, কয়েক মাস আগের ঘটনা। ব্রজেন্দ্রদাদার সেই দুঃসাহসের কথা কেউই ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি তার সেই চরম শাস্তির কথাও। অরণ্যের পাশেই যে কালোপুকুর, তার একেবারে মাঝখানে, যেখানে থই পাওয়া যায় না জলের, সেখানেই বেঁধে রাখা হয়েছিল ওকে। শুধু মুখটুকু জলের বাইরে ছিল, ঠোঁটের ভেতর ছিল ন্যাকড়া গোঁজা। টানা নয়দিন ওভাবেই অর্ধেক জলে অর্ধেক বাতাসে ভেসে ছিল সে। সম্পূর্ণ নিরন্ন ও নিরম্বু হয়ে।

গোটা সমাজ কাজে যেতে আসতে বিস্ফারিত চোখে দেখত ন্যাকড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসা তার গোঙানির অমানুষিক আর্তনাদ। এও গুরুদেবের নির্দেশ। মানুষের মনে ভয় জিইয়ে রাখার জন্য।

ধীরে ধীরে চেতনাশূন্য হয়ে গিয়েছিল ব্রজেন্দ্রদাদা। শেষের দু'দিন আর কেউ শুনতে পায়নি তার গোঙানি। দশ দিনের দিন নিঃস্পন্দ কেশহীন মাথাটা একদিকে হেলে জলের ওপর ভাসছিল তিরতির করে।

ব্রজেন্দ্রদাদা গুরুতর অপরাধ করেছিল। লঙ্ঘন করেছিল সমাজের নিয়ম। কিন্তু অচ্যুত তো শুধু প্রশ্ন করেছে। তার শাস্তিও কি অতটাই ভয়ানক হবে? ভাবতে ভাবতে দ্বারিকা হিমচোখে দেখল, অচ্যুতের কোনো হেলদোল নেই।

সকলের ভয়ার্ত চাহনির সামনে দিয়ে অচ্যুত দিব্যি চলে গেল কৈবর্তদের সঙ্গে। একবারও পিছু ফিরে দেখল না।

গুরুদেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর একঝলক তাকিয়ে বললেন, "এটা বৈদিক সম্প্রদায়। আমাদের লক্ষ্য ঐতিহ্যের পথে হেঁটে এক পবিত্র পৃথিবী নির্মাণ। সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকতে প্রয়োজন কঠোর তপস্যার। প্রখর সাধনার। নিরন্তর সংযমের। এখানে অতিরিক্ত কৌতূহল মানে মহাপাপ। এখানে নিয়ম লঙ্ঘন মানে কঠিন শাস্তি।"

কথা শেষ করে তিনি একটু থামলেন তারপর বললেন, "উপনিষদের সেই বাণী স্মরণ করো।

সহ না ববতু

সহ নৌ ভুনক্তু।

আমরা মিলেমিশে খাব। আমরা একসঙ্গে শক্তিশালী হয়ে উঠব। আমরা পরস্পরকে বিদ্বেষ করব না। তাই যে বা যারা আমাদের পবিত্র বৈদিক সমাজে ভাঙন ধরাতে চায়, তাদের একটাই শাস্তি। মৃত্যু।"

কথাটা শেষ করে তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। নেমে চলে গেলেন দণ্ডায়মান দেবদত্তর দিকে। দৃপ্তভঙ্গিতে উড্ডীন হলেন অশ্বপৃষ্ঠে, তারপর দ্রুতগতিতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন গ্রামের ভেতরের দিকে।

দ্বারিকা এবং অন্য ছাত্ররা চাতাল ছেড়ে বেরিয়ে এল। সবাই হাঁটা দিল নিজেদের ঘরের দিকে। সবাই নির্বাক থাকলেও ভয়ে স্তব্ধ। গুরুদেবের ক্রোধ যে অতি সাংঘাতিক, তা কারুর অজানা নয়।

দ্বারিকার বাড়ি পূজামণ্ডপের চাতাল থেকে যেতে লাগে অর্ধেক দণ্ড। প্রধান মন্দিরের পাশ দিয়ে সোজা হেঁটে যেতে হয়। পথে পড়ে শস্যক্ষেত, কীর্তনমঞ্চ এবং বিষ্ণুমন্দির। সেই মন্দিরে প্রত্যহ পুজোর সময় জমায়েত হয় তামাম বৈদিক সমাজ।

সরস্বতী নদী
শ স্য ক্ষে ত
অ র ণ্য
পূজামণ্ডপ
নারায়ণী চতুষ্পাঠী
উপাসনা মন্দির
ভাণ্ডার ঘর
গুরুদেবের বাসভবন
রন্ধনশালা
অশ্বশালা
গোলাপদীঘি
ব্রাহ্মণপল্লী
কায়স্থ পল্লী
ক্রীড়াঙ্গন
বিষ্ণুমন্দির
কীর্তনমঞ্চ
নবশায়ক পল্লী
প্রধান পুষ্করিণী
কৈবর্ত ও বাগদিদের পাড়া
শ স্য ক্ষে ত
গোচারণভূমি
কালো পুকুর
শ্মশান
জরা নদী
অ র ণ্য
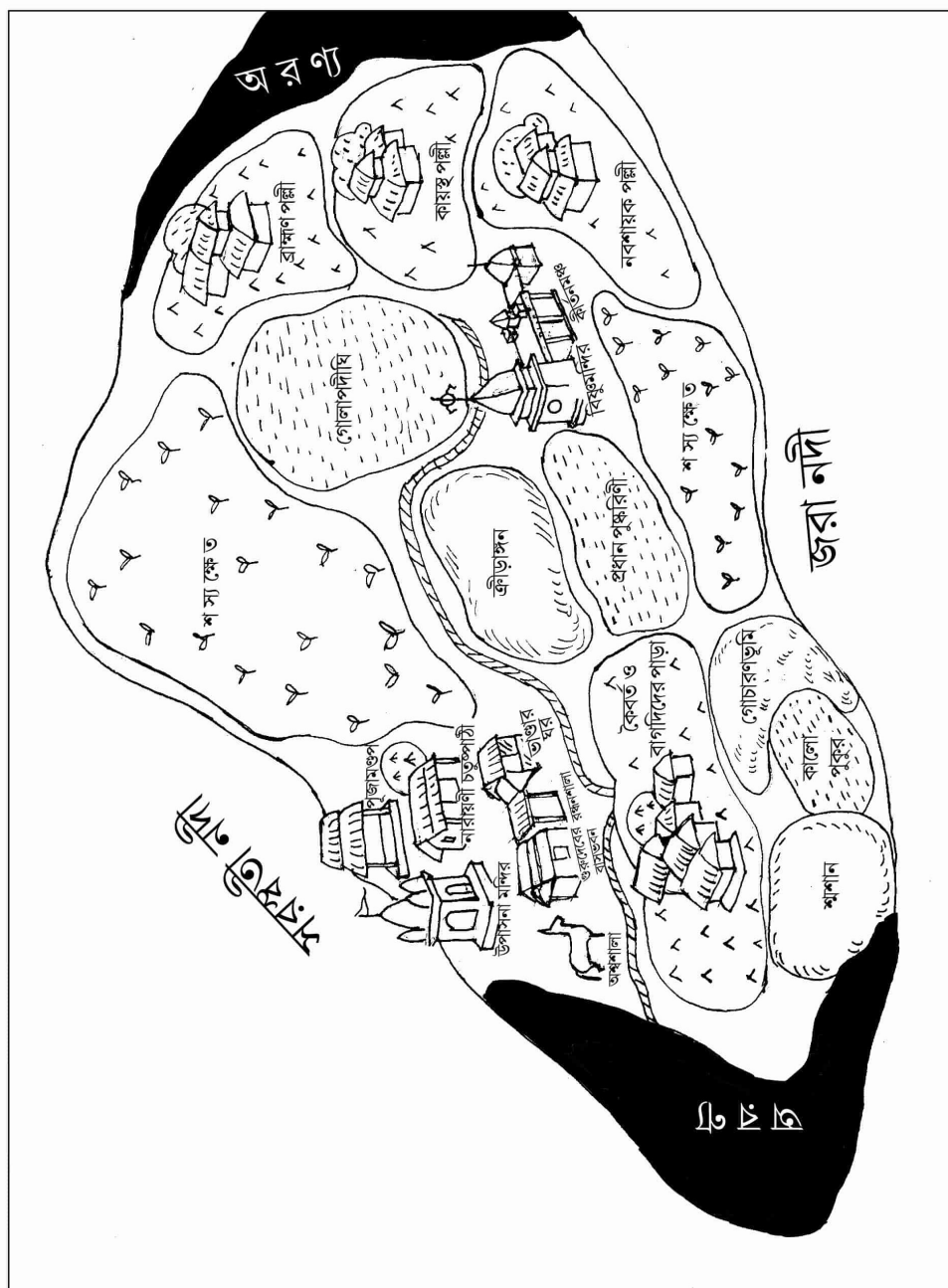
বাসভবন বলতে সকলেরই সমান আকার ও আয়তনের মৃৎকুটির। এই গোটা বৈদিক সমাজে সমস্ত কিছু সুপরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত। সমাজের একেবারে উত্তরে যেমন অরণ্যপ্রান্তে রয়েছে পূজামণ্ডপ, উপাসনা মন্দির ও নারায়ণী চতুষ্পাঠী, সমাজের একেবারে দক্ষিণে সার দিয়ে দিয়ে মৃৎকুটির। প্রতিটি মৃৎকুটিরের সামনে একফালি উঠোন, তুলসী মঞ্চ ও পেছনদিকে গোয়ালঘর, অল্প বাগান। সেই বাগানে কিছু ঘরোয়া সবজি ও ফলমূল। বেশ কয়েকটি করে মৃৎকুটির নিয়ে এক একটি পাড়া।

কোনটা ব্রাহ্মণপাড়া, কোনটা কায়স্থপাড়া, কোনটা আবার নবশায়কপাড়া। নবশায়ক অর্থে নয়টি সম্প্রদায়। তিলি, মালাকার, তাঁতি, সদগোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার ও ময়রা।

আরো দক্ষিণে গেলে শুরু হয়ে যাচ্ছে অরণ্য।

গ্রামের একেবারে উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে কৈবর্ত ও বাগদিদের পাড়া। তারা অচ্ছুৎ, তাই এই ব্যবস্থা। তাদের পাড়ার পাশেই বৈদিক সমাজের শ্মশান।

মৃৎকুটিরগুলোর একটু আগে রয়েছে গোলাপদিঘি। গোটা সমাজের জলের প্রয়োজন মেটানো হয় এই দীঘি থেকেই। সমাজের সব মেয়ে বউরা ভোর হতে না হতেই কলসি কাঁখে বেরিয়ে পড়ে গোলাপদিঘির দিকে।

সমাজের দণ্ডমুণ্ড গুরুদেব স্বয়ং ছাড়াও সমাজপতি আছেন দুইজন। একজন কৃষ্ণকান্ত লাহিড়ী, অন্যজন গোপাল ব্যানার্জি। তাঁরা গুরুদেবের মতো পরিযায়ী নন, সমাজেই থাকেন। গুরুদেবের অবর্তমানে তাঁরাই চালান সমাজকে। কোনো বাড়ির মেয়ের দশ পুরলেও বিবাহ হয়নি, কার বাড়ির সন্ধ্যাপ্রদীপ ঠিকসময়ে প্রজ্জ্বলিত হয়নি, কোনো বাড়ির বিধবা উঁচু স্বরে কথা বলছে, এই সব বিষয়ে তাঁদের কড়া নজর। স্বয়ং গুরুদেবও তাঁদের মতামতকে বেশ গুরুত্ব দেন। গোটা সমাজে কোনো লেনদেনের মুদ্রা নেই। পুরোটাই চলে বিনিময় প্রথায়।

সকলকে মেনে চলতে হয় কঠিন অনুশাসন। গোটা সমাজে মোট চল্লিশটি ব্রাহ্মণ পরিবার। সেই চল্লিশটি পরিবারকে কুড়ি কুড়ি করে দুইভাবে বিভক্ত করা আছে। এক ভাগের মাথা কৃষ্ণকান্ত, অন্যভাগের হর্তাকর্তা গোপাল ব্যানার্জি। বিবাহাদি সম্পন্ন হয় এক ভাগের সঙ্গে অন্য ভাগের।

এইরকমভাবেই দুই ভাগে সম্পর্ক গড়ে ওঠে কায়স্থ, নবশায়ক, তিলিদের মধ্যে।

অসবর্ণ প্রথার কোন স্বীকৃতি নেই। নেই অবকাশও। বৈদিক সমাজে তা চরমতম অপরাধ।

অচ্যুতের বাবা-মা নেই। ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছে। ও থাকে ব্রাহ্মণ পল্লিরই এক দুঃসম্পর্কের কাকার পরিবারে। অনাথ বলেই বোধ হয় অচ্যুত কেমন একটু ছন্নছাড়া। এত মেধাবী, অথচ এত অবাধ্য, চঞ্চল। দ্বারিকা সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয়েও অচ্যুতের চিন্তাভাবনার কোনো তল পায় না।

দ্বারিকা বাড়ি পৌঁছে দেখল ওর মা উনুনে ভাত চাপিয়েছেন। এই কুঁড়েঘরে মা আর দাদা'র সঙ্গে থাকে ও। ওদের বাবা থাকেন কিছুদূরে। সেখানে কিশোরী স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর নতুন সংসার।

"দাদা কোথায়, মা?"

মা বললেন, "পুতুর বিয়ে কাল, সেই জোগাড় করতে গিয়েছে।"

পুতুর বিয়ে? দ্বারিকা হাঁ হয়ে গেল। পুতু ওর পাড়াতুতো বোন। সবে আট পেরিয়ে নয়ে পড়েছে। পুতুর বাবা পশুপতিজ্যাঠার দশটা গরু আছে। সেই গরুর দুধ থেকেই সংসার চলে।

আর কিছুদিন পরেই মহোৎসব, পুতু সেইসময় কত আনন্দ করে!

ও বলল, "কার সঙ্গে বিয়ে?"

"বাঁড়ুজ্জেমশাইয়ের সঙ্গে।"

"মানে?" দ্বারিকার হাঁ মুখ বন্ধ হল না, "গোপাল ব্যানার্জি?"

"হ্যাঁ।"

"কী বলছ তুমি, মা!" দ্বারিকা বলল, "উনি তো এই ক'মাস আগে তৃতীয় পক্ষ করলেন!"

"তো কি!" মা বললেন, "সোনার আংটি আবার বেঁকা! পুতুর বাপের কত দেনা জানিস বাঁড়ুজ্জেমশাইয়ের কাছে? অন্তত পঞ্চাশ সের দুধ বকেয়া আছে। গুরুদেব তাই আদেশ করেছেন পুতুকে বিয়ে দিতে।"

"কিন্তু, বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের বয়স ষাট পুরেছে। ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে?"

মা চুপ করে যান। কিছুক্ষণ পর বলেন, "সে'সব হলে পুতুর মন্দকপাল। অন্তত একমাথা সিঁদুর নিয়ে শ্মশানযাত্রা তো করতে পারবে! বাপ-মা'কেও গালমন্দ খেতে হবেনা।"

দ্বারিকা চমকে উঠল। ওর মনে পড়ে গেল সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা। বাচ্চা মেয়েটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চিতার দিকে। সেই চিতায় শয়ান সেই মেয়েটির বৃদ্ধ পতি যদুহরি ঘোষাল। যদুহরি ঘোষাল নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর পাঁচটি পত্নীর মধ্যে যেন কনিষ্ঠাটি অবশ্যই সহমৃতা হয়।

চারদিকে তারস্বরে বাজছে কাঁসরঘণ্টা, ঢাকঢোল। আগুনের লেলিহান শিখা এসে গ্রাস করার আগেই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দূরে ব্রজেন্দ্রদাদা পালাচ্ছে মেয়েটাকে নিয়ে! সঙ্গে রয়েছে মেয়েটার মা'ও। নিজের একমাত্র সন্তানটিকে বাঁচাতে সেই মা'ও বদ্ধপরিকর।

গ্রামের মেয়েবউরা স্তম্ভিত। অজানা অভিশাপের ভয়ে থরোথরো। কোনো মা এমন সৃষ্টিছাড়া কাজ করতে পারে? মেয়ে সতী হলে যে কত পুণ্য, তা কি তার জানা নেই?

এই সবের মধ্যেই সবাই লাঠিসোঁটা নিয়ে উন্মত্ত পশুর মতো ছুটছে তার পেছনে। এমনকি অনাচারের ভয়ে মেয়েকে আটকাতে ছুটছে মেয়েটির বাবাও। মেয়ে আর মা অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেও একজনের লাঠির ঘায়ে লুটিয়ে পড়ছে ব্রজেন্দ্রদাদা। তারপর সবাই মিলে নির্মম পেটাচ্ছে তাকে। তারপর আধমরা করে নিয়ে আসা হচ্ছে কালোপুকুরে।

উফ! দ্বারিকা চোখ বুজে ফেলল। এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হল, কে বলেছে অষ্টাদশ শতক সেরা সময়কাল? হোক পরমগুরুর আবির্ভাব! এইসব কুপ্রথা যে সময়ে থাকে, তাকে কি স্বর্ণকাল বলা যায়? অচ্যুতের প্রশ্ন কি খুব অযৌক্তিক? বাইরের পৃথিবী কি সত্যিই এরে চেয়েও ভয়ংকর?

কী যেন নাম ছিল সেই মেয়েটার? পুতুরই বয়সি হবে।

হ্যাঁ। মনে পড়েছে ওর।

ক্ষমা।

৮

প্রিয়ম লাইব্রেরি রুমের সোফায় আধশোয়া হয়ে বসে ছিল। ডান হাতে একটা বাটি, তাতে টক ঝাল আচার। অন্য হাতে বই। প্রিয়মের কল্যাণীর বাড়ির বিশাল বইভাণ্ডার সে এই বাংলোয় আসার পরই তুলে নিয়ে এসেছে। ছুটির দিনটা তার এই লাইব্রেরি রুমেই কাটে।

প্রিয়ম এক টুকরো আচার মুখে দিয়ে বলল, "একি! জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম শুনব না? ত্রিবেণীর দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন!"

রুদ্র একটু অপ্রতিভ হল। ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়ে ওর চেয়ে প্রিয়মের জ্ঞানের প্রসার বেশি, এটা ও ধারণা করতে পারেনি।

ত্রিবেণী থেকে ফিরে উর্দি ছেড়ে স্নান করে ও ফ্রেশ হয়েছে। প্রিয়ম আজ বাড়ি থেকে কাজ করছে। তাই আজ অনেকদিন পর দুজনে দুপুরে একসঙ্গে লাঞ্চ করতে পেরেছে। ও বলল, "উনি নাকি একশো বারো বছর বেঁচেছিলেন!"

"হ্যাঁ। জানি তো।" প্রিয়ম বলল, "ইলেভেন টুয়েলভে কল্যাণী থেকে গঙ্গা পেরিয়ে ত্রিবেণীতে জয়েন্টের জন্য ফিজিক্স পড়তে যেতাম, ওই তর্কপঞ্চাননের দৈত্যের মতো বাড়িটার পাশেই। মধ্যযুগের সেরা বাঙালি। গোটা অষ্টাদশ শতকটা সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের নবজাগরণের দাপটে মানুষ এখন ওঁকে একেবারে ভুলে গিয়েছে, এই যা দুঃখের!"

"কী জানো তুমি ওর সম্পর্কে?" রুদ্র জিজ্ঞেস করল, "না মানে একজন বিদ্বান পণ্ডিত ছাড়া ওঁর আর কোনো পরিচয় ছিল কি?"

প্রিয়ম বলল, "অনেক রকম পরিচয় ছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছিলেন অসম্ভব শ্রুতিধর। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে উনি ত্রিবেণীতে টোল খুলে বসেছিলেন। একটা ঘটনা শুনেছিলাম। একবার তিনি বর্ধমানের মহারাজা ত্রিলোকচন্দ্রের আমন্ত্রণে বর্ধমান গিয়েছিলেন। সেখানে অনেক পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে হারানোর পর রাজা বললেন, তর্কপঞ্চাননমহাশয়, ত্রিবেণী থেকে বর্ধমান আসার পথে কী কী দেখেছেন?

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বললেন, "সংক্ষেপে বলব না বিস্তৃত বলব?"

"রাজা বিস্তারিত বলার অনুরোধ করতে তিনি নাকি পরের কয়েকঘণ্টা ধরে গোটা যাত্রাপথের প্রতিটি বাড়ি, বাগান, পুকুর, মন্দির, সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন। রাজা পরে খোঁজ নিয়ে দেখেন, প্রতিটি তথ্য সত্যি।"

"এমনও হয়!" অস্ফুটে বলল রুদ্র, "আসার সময় জয়ন্তও এইরকমই একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা বলল। একদিন নাকি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলেন স্নান করতে। সেইসময় দুজন ইংরেজ একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছে। পরে দুজনের মধ্যে সেই হাতাহাতি আদালত অবধি গড়ালে খবর পাওয়া গেল, সেইসময় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। কোর্টে ওঁকে সাক্ষ্য দিতে ডেকে পাঠালে তিনি গিয়ে বললেন, দেখুন, আমি ইংরেজি জানিনা। তাই কী নিয়ে ঝগড়া আমি বলতে পারব না। তবে, তারা

কী বলেছিল, আমি বলতে পারি। এই বলে উনি একঘণ্টা ধরে গোটা ইংরেজি কথোপকথনটি নাকি বলে গিয়েছিলেন!"

"রাইট!" প্রিয়ম বলল, "এটাও জানতাম। তোমার কাছে শুনে মনে পড়ল। আসলে তোমরা এদিককার লোক নও তাই জানোনা, এগুলো ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়ার সবাই জানে। আর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছিলেন আইনের দুঁদে লোক। তখন ইংরেজরা সবে ভারতে এসেছে, এখানকার ভাষাও জানেনা, এখানকার রীতিনীতি সবকিছুই অজানা। তাই তারা পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। নবকৃষ্ণ দেব বা নকু ধরের মতো কিছু সুযোগসন্ধানী দেশীয় লোকদের হাত করে তখন তারা দেশ শাসন করছে। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী দেশীয় বিচারপদ্ধতি আর আইন প্রণয়নের একটা প্রামাণ্য বই তখন তাদের খুব দরকার ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুরোধে সেই বই লিখেছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। নামটা যেন কী ভুলে গিয়েছি।"

"বিবাদভঙ্গার্ণব।"

"ইয়েস! তখনকার সব দেওয়ানির মামলার বিচার ওই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ দিয়েই করা হত। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দেশীয়মহলে তো বটেই, ইংরেজ মহলেও খুব প্রভাবশালী ছিলেন। রবার্ট ক্লাইভ তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখেছিলেন। হেস্টিংস, হার্ডিঞ্জের মতো বড়কর্তারা তাঁর কাছ থেকে আইনি বিষয়ে পরামর্শ নিতেন। উইলিয়াম জোন্সও আসতেন। এমনকি পরে যখন নবকৃষ্ণ খেতাব পেয়ে রাজা হলেন, তাঁর রাজসভাতেও জগন্নাথ পণ্ডিতের উচ্চ আসন ছিল। আর এই নবকৃষ্ণদেবই কিন্তু পলাশির যুদ্ধে সিরাজকে হারাতে ইংরাজদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, জানো! নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িই হল আজকের শোভাবাজার রাজবাড়ি।"

রুদ্র বলল, "বাবা! তুমি তো অনেক কিছু জানো দেখছি!"

"জানব না?" প্রিয়ম বলল, "ত্রিবেণীর ওই জগন্নাথ পণ্ডিতের বাড়ির একজন বংশধর আমার সঙ্গে ওই টিউশনে পড়ত যে! শুভাশিস ভট্টাচার্য। আমার চেয়ে কিছুটা বড়, আমি যখন ইলেভেন, শুভাশিসদা তখন ফিজিক্সে এম এসসি করছে, ফাইনাল ইয়ার। স্যারের কাছে একটা স্পেশাল পেপার পড়তে আসত। এখন আমেরিকায় থাকে। এখনো যোগাযোগ আছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবি-টবি দেখি। মাঝেমধ্যে কথাও হয়। তখন ওর সঙ্গে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাবা ছিলেন খুব গরিব, কিন্তু জগন্নাথ নিজে প্রচুর ধনসম্পদ করেছিলেন। ওঁর বাড়ির একতলাটায় একটা ছোটখাটো কোর্টের কাছারি ছিল, যেখানে উনি স্থানীয় লোকদের মোকদ্দমার বিচার করতেন। একেবারে জীবন্ত কিংবদন্তী যাকে বলে!"

"হুম। সেই লিভিং লিজেন্ডের বাড়িতেই কিনা এমন একটা খুন হল?" রুদ্র বিড়বিড় করল, "খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। মোট ছ'টা খুন। প্রতিটাই কোনো না কোনো বুধবারে। প্রতিটাই কোনো না কোনো ব্যবসায়ীকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এদের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। কিন্তু, কী সেই যোগসূত্র?"

জ্যোৎস্নাদি ঢুকল ঘরে, "রাতে কী খাবেন দাদাবাবু? চিকেন আছে, করে দেব?"

প্রিয়ম তন্ময় হয়ে শুনছিল রুদ্রর কথা। হঠাৎ এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, "আহ, এই তো দুপুরে খেয়ে উঠলাম। এখনই রাতের খাওয়া কেন জ্যোৎস্নাদি? খাওয়ার চিন্তা ছাড়া দুনিয়ায় আরও কিছু আছে তো নাকি।"

জ্যোৎস্নাদি কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ”না, আজ গানা খাজানার ফাইনাল। সন্ধে থেকে দেখব তো, তাই ভাবছিলাম এখনই যদি রান্নাটা সেরে রাখি।”

প্রিয়ম বলল, ”ঠিক আছে, তুমি না করতে পারো, মল্লিকাদি করবে। অসুবিধা কী আছে! মল্লিকাদি তো টিভি ফিভি দেখেনা।”

জ্যোৎস্নাদি সঙ্গে সঙ্গে মুখ বেঁকাল, ”ভালো লোককে করতে বলছেন দাদাবাবু। তার তো রোজই কিছু না কিছু লেগেই রয়েছে। আজ কী না কী ষষ্ঠী, উনি পিঁয়াজ রসুন ছোঁবেন না। রান্নাটা হবে কী করে শুনি?”

”আজ ষষ্ঠী?” প্রিয়ম বলল।

”হ্যাঁ।” জ্যোৎস্নাদি ঘরের এক দেওয়ালে অবহেলায় ঝুলতে থাকা বাংলা ক্যালেন্ডারটার দিকে তাকিয়ে বলল, ”ওই দেখুন না। আমরা বাপু চৈত্রমাসের অশোক ষষ্ঠী বুঝি, ভাদ্দর মাসের চাপড়া ষষ্ঠী বুঝি, চৈত্রমাসে নীল ষষ্ঠী বুঝি। প্রত্যেক মাসে দু'বার করে এমন ষষ্ঠী করতে কাউকে দেখিনি!”

রুদ্র কী যেন চিন্তা করছিল। বলল, ”গানা খাজানা? পরশুদিন বললে সেমিফাইনাল ছিল? তাহলে গতকালই তো ফাইনাল হয়ে যাওয়ার কথা!”

”গতকাল তো বুধবার ছিল দিদিমণি।” জ্যোৎস্নাদি লম্বা বিনুনি দুলিয়ে বলল, ”বুধবার দিন তো গানা খাজানা হয় না।”

”আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু পরে বলছি। এখন তুমি যাও।” প্রিয়মের ধমকে জ্যোৎস্নাদি চলে যাচ্ছিল, এমন সময় পিছু ডাকল রুদ্র, ”তুমি শিওর জ্যোৎস্নাদি, বুধবার গানা খাজানা হয় না?”

”ওমা, একবচ্ছর ধরে দেখে আসছি, আর জানব না? সোম থেকে রবি হয়, শুধু ওই বুধবারটা বাদ দিয়ে।”

রুদ্র সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে ফোন করল ত্রিবেণীর ওসি সুকেশ সান্যালকে, ”হ্যাঁ শুনুন। ওই ব্রিজেশ তিওয়ারির যে কর্মচারী ছেলেটি, কী যেন নাম, হ্যাঁ, অলোক, ওকে ভালো করে জেরা করুন। ছেলেটা ফলস স্টেটমেন্ট দিয়েছে। ও সকালে আমাদের বলেছে, গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ ও আর ব্রিজেশ তিওয়ারি একসঙ্গে গানা খাজানা দেখছিল। অথচ কাল ছিল বুধবার, ওই প্রোগ্রামটা হয়ই না। আপনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট করুন।”

ফোনটা রেখে রুদ্র প্রিয়মের দিকে তাকাল। বলল, ”জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের তার মানে আসল পদবি ছিল ভট্টাচার্য?”

”হ্যাঁ। তর্কপঞ্চানন উপাধি পেয়েছিলেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই বাঘা বাঘা পণ্ডিতদের হারিয়ে টোল খুলেছিলেন। কলকাতায় যখন প্রথম সুপ্রিম কোর্ট খোলা হয়েছিল, প্রধান জজ পণ্ডিতের পোস্ট অফার করা হয়েছিল ওঁকেই। কিন্তু উনি তা প্রত্যাখ্যান করেন, ওঁরই নাতি ঘনশ্যাম বাচস্পতি তখন প্রথম জজপণ্ডিত হন। মজার কথা হল, ওঁর নাতি নাকি ওঁর চেয়েও বেশি প্রতিভাধর ছিলেন। কিন্তু মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সেই সেই নাতি উন্মাদ হয়ে যান।” প্রিয়ম বলল, ”তখন শুভাশিসদার কাছে গল্প শুনতাম এইসব। বেশ লাগত। এসব তো আমাদের পাঠ্য ইতিহাসে ছিল না। ত্রিবেণীর প্রথম দুর্গাপুজোও শুরু করেছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। এখনো গঙ্গার ঘাটে ওঁর একটা মূর্তি আছে।”

রুদ্র কিছু বলার আগেই বাইরে থেকে পাঁচু এসে সেলাম করল, ”ম্যাডাম, লোকেশ স্যার আর প্রিয়াঙ্কা ম্যাডাম এসেছেন। আপনার অফিসে বসতে বলেছি।”

”এখন এই অসময়ে?” রুদ্র ভ্রূ কুঁচকল।

৯

অলোক ছেলেটা ভিতু ধরনের। দুটো রুলের বাড়ি খেয়েই ভেউভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে সব বলে দিল।

"বিশ্বাস করুন স্যার, মরা বাপ-মায়ের দিব্যি খেয়ে বলছি, আমি কিছু করিনি। হ্যাঁ, সেদিন রাতে খাওয়ার সময় ব্রিজেশদা'র সঙ্গে আমার একটু ঝামেলা হয়েছিল। ব্রিজেশদা দোকানের হিসেবের খাতায় কিছু গরমিল পাচ্ছিল ক'দিন ধরে। আমাকে সন্দেহ করছিল। মুখে কিছু না বললেও আকারে ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছিল। সেদিন রাতে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। দুজনেই মাথা গরম করে ফেলি। ব্রিজেশদা ওই রাতেই আমাকে দোকানঘরে নিয়ে যায়, খাতা খুলে গরমিল দেখানোর জন্য।"

"তারপর? কত টাকা চুরি করেছিলি তুই?"

"স্যার, আমি গরিব হতে পারি। চোর নই। ব্রিজেশদা একটা কোম্পানির অর্ডারের পেমেন্টে কিছু ভুল করছিল। আমি সকাল হলে বোঝাব বলে চলে আসি ঘরে। ব্রিজেশদা তখন দোকানঘরে রয়ে যায়। তখন রাত সোয়া এগারোটা হবে। বিশ্বাস করুন স্যার! এর বেশি আমি কিছু জানিনা। ব্রিজেশদা আমার মালিক, আমাকে থাকা খাওয়া সব দিয়েছে। আমি তাকে কেন খুন করতে যাব?"

"তবে প্রথমে মিথ্যে বললি কেন?"

অলোক মাথা নীচু করে বলল, "ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম স্যার। আমি ব্রিজেশদা'র সঙ্গে দোকানে গিয়েছিলাম জেনে যদি আপনারা আমাকেই খুনি ভাবেন।"

রুদ্র টেলিফোনে পুরো কথোপকথনটা শুনছিল। বলল, "ফরেনসিকের রিপোর্ট কি এসেছে?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। অলোকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে দোকানে।"

রুদ্র বলল, "অলোক দোকানে কাজ করত। ওর ফিঙ্গার প্রিন্ট তো পাওয়া যাবেই। কোথায় কোথায় ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে?"

"খাতায়, দরজার হাতলে, বডির আঙুলে। কিন্তু ইনভার্টারে বা ব্যাটারিতে নেই ম্যাডাম। অলোক আর ব্রিজেশ তিওয়ারি ছাড়া আরও কিছু অন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে।" সুকেশ সান্যাল হাঁপাতে হাঁপাতে ফোনে বললেন।

"হুম। অলোককে আপাতত অ্যারেস্ট করুন। তারপর দেখছি। ত্রিবেণীতে জানুয়ারি মাসে যে আরেকটা খুন হয়েছিল, সেটাও কী আপনিই দেখছেন?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। ওই সাইবার ক্যাফের শিবনাথ বিশ্বাস তো?" সুকেশ সান্যাল বললেন, "ওটা তো সিম্পল কেস।"

"কী রকম?"

"বউ আর বউয়ের প্রেমিক খুন করেছে। নেহাত অ্যালিবাইটা স্ট্রং বলে একটু দেরি হচ্ছে। আমরা সবদিক দেখে এগোচ্ছি।"

* * *

প্রিয়াঙ্কা উত্তেজনায় ফুটছিল। এ এস পি ম্যাডামকে ঘরে ঢুকতে দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকে বলল, "ম্যাম, কয়েকটা ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন আছে।"

"কী?"

'বৈদ্যবাটীর সুনীল ধাড়ার দোকানের কর্মচারীকে ইন্টারোগেট করলাম। সে বলল, ঠিক ব্রিজেশেরই মতো সুনীল ধাড়ার দোকানেও বছরখানেক আগে একটা নতুন কর্মচারী ছেলে এসেছিল। কোথা থেকে তা জানে না। তবে একেবারে ক্যাবলা। নাম বলরাম। ঠিক ওই ব্রিজেশ তিওয়ারির দোকানের কানাইয়ের মতো বলরামও কাউকে কিছু না বলে একদিন ভ্যানিশ হয়ে যায়।"

রুদ্র মাথা নাড়ল, "এটা আমি প্রথম থেকেই গেস করেছিলাম। বেশিরভাগ খুনই হয়েছে ডেকে নিয়ে গিয়ে। সুনীল ধাড়া যখন খুন হয়, তখন ওর কর্মচারী দানু ছুটি নিয়েছিল। সেইসময় দোকানে ওকে কে হেল্প করত?"

"কেউ না ম্যাডাম। সুনীল ধাড়া একাই সামলাচ্ছিল। বলরাম বলে ছেলেটা এসেছিল প্রায় একবছর আগে। তখন দানু দু'মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল কোন কাজে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

রুদ্র বলল, "বলরামকে সুনীল ধাড়ার দোকানে কে কাজে ঢুকিয়েছিল?"

প্রিয়াঙ্কা এবার একটু অপ্রতিভ গলায় বলল, "সেটা তো খোঁজ করিনি ম্যাডাম!"

রুদ্র ভ্রূ কুঁচকে বলল, "বলেছি না, কখনো অর্ধেক ইন্টারোগেশন করবে না। এতে ফ্লো কেটে যায়, কনফিউশানও বাড়ে। খোঁজ নাও, দানুর অ্যাবসেন্সে বলরামকে কে কাজে ঢুকিয়েছিল।"

লোকেশ ব্যানার্জি এতক্ষণ পর মুখ খুললেন, "কোন্নগরের স্বপন সরকারের কেসটাও অনেকটা এইরকম। স্বপন সরকার এবার ভোটের টিকিট পেত। পলিটিক্সে ঢোকার পর থেকে তার পেছনে অনেক ফচকে ছেলে জুটেছিল। সেরকম একটা ছেলেরও কোন ট্রেস নেই দু'মাস ধরে। নাম গোবিন্দ।"

"কানাই। বলরাম। গোবিন্দ।" রুদ্র বিড়বিড় করতে লাগল, "এদের কারুর কোনো ছবি পাওয়া যাচ্ছে না? ভেরি স্ট্রেঞ্জ! কোনো আইডি প্রূফ ছাড়া কী করে এরা কাজে ঢুকল? মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ দিনদিন কমে যাচ্ছে।"

লোকেশ ব্যানার্জি বললেন, "গোবিন্দ স্বপন সরকারের সঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় গিয়েছিল ম্যাডাম। কোথাও থেকে কোনো ফোটোগ্রাফ বা সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায় কিনা, সেই চেষ্টা করছি।"

"চেষ্টা করলেই শুধু হবেনা মি. ব্যানার্জি, আমাদের এই কেসটা যত দ্রুত সম্ভব সলভ করতে হবে।" রুদ্র বলল, "হায়ার অথরিটি থেকে কন্সট্যান্ট চাপ আসছে।"

ওর এবার বিরক্ত লাগছিল। ছ'খানা জলজ্যান্ত খুন। অথচ কোন ক্ল্যু পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতা থেকে দূরে বলে প্রথমদিকে মিডিয়া সেভাবে মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু স্বপন

সরকারের কেসটার পর থেকে এদিকে আগ্রহ বাড়ছে। যেহেতু রুদ্র এই তদন্তকমিটির প্রধান, দিনে একটা-দুটো করে ফোন আসছেই কোনো না কোনো নিউজ পোর্টাল থেকে।

আর ঠিকমতো ধরতে গেলে এটা ওর কেরিয়ারের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। প্রথমেই এমন জটিল কেস যদি ও সলভ করতে পারে, নিঃসন্দেহে সেটা ওর কেরিয়ারে অনেকগুলো পালক যোগ করবে। কিন্তু এগোতে পারছে কই?

অচ্যুতের গলা দিয়ে প্রাণপণ আওয়াজ বেরিয়ে আসতে চাইছিল। নিজের বারোবছরের দেহে যতটুকু শক্তি আছে, গোটাটাকে কণ্ঠনালীর ভরকেন্দ্রে এনে চিৎকার করতে চাইছিল ও। কিন্তু ঠোঁটদুটো উন্মুক্ত করতেই ঢুকে আসছিল জল।

মড়াপোড়া কাঠের ছোট ছোট টুকরোতে ভরতি পচা জল।

সমাজের উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে শ্মশান। সেই শ্মশানের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে একটি প্রশস্ত খাল। লোকে তাকে নদী বলেই চেনে। ওদের কাছে সেই নদীর নাম জরা। কাল কৈবর্তের দল এসে শ্মশান লাগোয়া এই জরা নদীর পাড়ে এক মানুষ পাঁকের মধ্যে অচ্যুতকে পুঁতে দিয়ে গিয়েছে। অচ্যুতের চিবুক পর্যন্ত মাটির নীচে পোঁতা। চিবুকের উপরিভাগে মাঝে মাঝেই ঢুকে আসছে শ্মশানঘাটের দাহ করা মড়ার কাঠের জল।

অচ্যুতের চোখের দুই পাশ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। সেই নোনা জল মিশে যাচ্ছিল নদীর জলের সঙ্গে। পেট থেকে ভাত ঠেলে উঠে আসছিল। ওর হাত পা, গোটা শরীর এমন শক্তভাবে পাঁকে পোঁতা রয়েছে যে চাইলেও কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াতে পারছিল না।

ও কি মরে যাচ্ছে?

কেন? কী অপরাধে এমন শাস্তি পেতে হচ্ছে ওকে? যুক্তিগ্রাহ্য কোনো প্রশ্ন মনে উদয় হলে কৌতূহল নিরসন করতে চাওয়া কি অপরাধ?

অচ্যুতের মনে পড়ল, কালু কৈবর্তদের ওকে এই চরে টানতে টানতে নিয়ে আসার সময়ে নিজেদের মধ্যে বলা কথাগুলো।

"ই ছোঁড়াটো খুব বাড় বেড়েছে। রাতভর ইটিকে ফেলি রাখতি হবেক চরে। তবে খতম করলি চলব না। তেমনই হুকুম!"

অচ্যুত আবার সর্বশক্তি দিয়ে ছটফট করে উঠল। কিন্তু মুণ্ডু ছাড়া ওর শরীরের কোনো অংশই একচুল নড়ল না।

ও আবার কেঁদে ফেলল। গভীর রাত। নিস্তব্ধ শ্মশানের চর। ভয় ও পায় না। এমন নিশুতি রাতে ও হেলায় বনের মধ্যে কিংবা শ্মশানে ঘুরে বেরিয়েছে আগে। কিন্তু প্রচণ্ড একটা রাগ এসে ওকে এখন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, ওকে এই সারারাত ধরে প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে রেখে সহবৎ শেখানোটাই গুরুদেবের নির্দেশ।

এখন ওর মনে হচ্ছে, জন্মানো ইস্তক ওর জীবনের গোটাটাই যেন মস্ত বড় এক প্রহসন! আজ পর্যন্ত ও জানেনা ওর বাবা-মার পরিচয়। আর এই যে বৈদিক সমাজ, পুরোটাই একটা ফাঁপা কলসী! আর এই সমাজে জন্মানোর মাশুল ওকে, দ্বারিকাকে, কিংবা বনমালির মতো ছেলেদের দিতে হয় সারাজীবন ধরে। শুধু ছেলেরাই বা কেন? ওরা তবু সামান্য হলেও স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে।

কিন্তু মেয়েরা?

অচ্যুতের মাঝে মাঝেই চেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। গতকাল দুপুরের সেই আহারের পর থেকে পেটে কিচ্ছু পড়েনি। তার মধ্যে চারপাশের এই ভয়ংকর গন্ধে ওর বিবমিষা

জাগছিল।

ছোটবেলা থেকে কী যেন শেখানো হয় ওদের?

অচ্যুত চোখ বন্ধ করে ঘাড় একদিকে হেলিয়ে গোঙাতে গোঙাতে মনে করার চেষ্টা করছিল।

"বাইরের পৃথিবী ক্রমশই পাঁকে অধঃপতিত হচ্ছে। প্রযুক্তি আর যন্ত্র একটু একটু করে গ্রাস করে ফেলছে মানুষদের। মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, আন্তরিকতা আজ তলানিতে। দেখনদারি, কৃত্রিমতা আর উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরে যাচ্ছে সমাজ। স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় নিমজ্জিত আধুনিক মানুষ ভুলে যাচ্ছে যে সে একদিন সামাজিক জীব ছিল।

"পরিবর্তনকে স্বাগতম তখনই, যখন সে ইতিবাচক বার্তা বয়ে আনে। কিন্তু এই পরিবর্তন ক্ষতিসাধন ছাড়া আর কী করছে? লাগামছাড়া স্বাধীনতায় মেয়েদের চরিত্র আর দেবীসম নেই, তারা প্রত্যেকে পরিণত হয়েছে অভিজাত বারাঙ্গনায়। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজকে দাঁড় করাচ্ছে বিপজ্জনক খাদের ধারে। সবকিছুই অতি দ্রুত, সবকিছুই অতি তাৎক্ষণিক, সবকিছুই অতি ক্ষণস্থায়ী। আর এই সবকিছুর পেছনেই প্রযুক্তির একটি বড় ভূমিকা রয়েছে।

"তাই আমাদের বৈদিক সমাজে আমরা সময়কে এগোতে দিইনি। দেব না। সময়কে আমরা এখানে আটকে রেখেছি অষ্টাদশ শতাব্দীতে। যেখানে এখনো পবিত্রতা আছে, নির্মলতা আছে, শুচি আছে, প্রাণ আছে …!"

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বহুবার শোনা এই কথাগুলো মনে করতে করতে আবার রাগে কেঁপে উঠল অচ্যুত। কী নির্মলতা আছে ওদের সমাজে? সারাক্ষণ ছোঁয়াছুঁয়ি, আচারবিচার। বাগদি বা নমঃশূদ্রদের ছায়া মাড়ালেই স্নান করতে হয় ব্রাহ্মণদের। বুড়ো স্বামী মারা গেলেই দশ-বারোবছরের মেয়েকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় এই শ্মশানে।

আর বাইরে? বাইরে যন্ত্র থাক, প্রযুক্তি থাক, তবু তো মানুষের স্বাধীনতা আছে। নীচুজাতে জন্মেও সমানাধিকার আছে!

সংজ্ঞা হারাতে হারাতেও অচ্যুত কেমন যেন ধড়মড় করে জেগে উঠল। মাথার ওপরে নিকষ কালো আকাশ। ওদের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও আকাশকে বাঁধা যায়নি শৃঙ্খলার বন্ধনে। বৈদিক সমাজের পবিত্র আকাশ প্রসারিত হয়েছে আধুনিক জগতেও।

আকাশে এখন মিটমিট করছে অসংখ্য নক্ষত্র। সেগুলো দেখতে দেখতে অচ্যুতের মনে হল, এমনিতে তো শ্মশান সীমানায় আসা অসম্ভব, কড়া প্রহরা থাকে শ্মশানের বাইরে। কারণ একমাত্র শ্মশানের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে জরা নদী। নদী তো মানুষের অনুশাসন মানেনা, তাই বৈদিক সমাজ হয়ে নদী চলে গিয়েছে আধুনিক জগতের দিকে।

শুধু গুরুদেবের আজ্ঞাপালনে যাদের সেই জগতে যেতেই হবে, একটা ছোট্ট নৌকো করে তারা ভেসে যায় উত্তরদিকে। তাদের জন্য রয়েছে আলাদা ঘাট। কয়েকমাস পর লক্ষ্যপূরণ করে তারা আবার ফিরে আসে। পূজামণ্ডপে তখন সাদর অভ্যর্থনা করা হয় তাদের। স্বয়ং গুরুদেব এসে তাদের কপালে পরিয়ে দেন জয়টিকা।

এই জরা নদী বেয়েই কয়েকমাস আগে পালিয়েছিল সেই বাচ্চা মেয়েটা আর তার মা। যার জন্য তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল ব্রজেন্দ্রদাদাকে।

অচ্যুত অতিকষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে দূরে তাকাল। দূরে, অনেক দূরে আবছা যেন দেখা যাচ্ছে আধুনিক জগতের বৈদ্যুতিন আলো। মাঝে মাঝে যখন ও খুড়োর বাড়ির উঠোনে রাত্রিবেলা একাকী শুয়ে থাকত, হঠাৎ দেখতে পেত, আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কিছু একটা।

মিটমিট করে জ্বলছে আলো। কখনো শোনা যেত মৃদু শব্দ।

নারায়ণী চতুষ্পাঠীর আদেশমতো তখন চোখ বুজে কৃষ্ণনাম জপ করতে চাইলেও ও পারতনা। অদম্য কৌতূহল ওর আঁখিপল্লবগুলোকে টেনে রাখত। মনে প্রশ্নের উদয় হত, ওগুলো কী? আধুনিক জগতে কি মানুষ উড়তে পারে?

তবে ওরা কেন পারবে না? কী লাভ এই বৈদিক সমাজে কূপমণ্ডূক হয়ে থেকে? সময় তো পশ্চাৎগামী নয়, তবে ওরা কেন এখানে ঘড়ির বিপরীতমুখে চলছে?

আচ্ছা, ও-ও কি একবার চেষ্টা করে দেখবে? মুক্তির স্বাদ পাওয়ার জন্য শেষ একটা চেষ্টা? গিয়ে নিজের চোখে একবার দেখবে আধুনিক জগৎটাকে?

ভগবান সকলকেই তো সুযোগ দেন! ওকেও হয়তো দিচ্ছেন। এই সুযোগ হেলায় হারালে হয়তো আর কোনোদিনই আসবে না।

এই তীব্র যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির মধ্যেও আকাশপাতাল ভাবছিল অচ্যুত। হঠাৎ একটা জান্তব ডাকে চমকে উঠল। আর পরক্ষণে বালির মধ্যে গেঁথে থাকা ওর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমস্রোত নেমে গেল।

ওর ঘাড়ে কোনো বন্য পশু জিভ দিয়ে চাটছে।

অচ্যুত দ্রুত হিসেব করতে লাগল। শ্মশানে এসে মিশেছে দূরের অরণ্য। সেই অরণ্যে হিংস্র পশু নেই। তবে শিয়াল আছে প্রচুর। নিজের ঘরে যখন ও রাতে শুয়ে থাকত, তখনও গভীর রাতে শিয়ালের হুক্কা হুয়া শুনেছে। একবার নিজের চোখে একটা শিয়ালকে ব্যাঙ ধরে খেতেও দেখেছিল।

আচ্ছা, শিয়াল কি জ্যান্ত মানুষের মাংস খায়?

ভাবনাটা মনে আসামাত্র ঘাড়ের কাছে মৃদু কামড় অনুভব করল অচ্যুত। এবার সত্যিই ওর ভয় লাগছে। ভীষণ ভয় লাগছে। কান্নায় ওর গলা বুজে এল।

কী অন্যায় করেছে ও?

ঘাড়ে দাঁতের দংশন ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। সেই কামড় থেকে ছাড়াতে মাথাটা আপ্রাণ দুদিকে ঝাঁকাচ্ছে অচ্যুত। কিন্তু কিছু হচ্ছে না। ও বেশ বুঝতে পারছে, এতক্ষণে ওর পেছনে এসে উপস্থিত হয়েছে আরও কয়েকটা শিয়াল।

সবাই মিলে প্রতিযোগিতায় মেতেছে, কে প্রথম নেবে কচি নরমাংসের আস্বাদ!

১১

"আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে, কানাই, বলরাম আর ওই গোবিন্দ —তিনজনের মধ্যে কোন সংযোগ রয়েছে।" রুদ্র বিড়বিড় করল।

জয়ন্ত বলল, "এরকম মনে হওয়ার কারণ, ম্যাডাম?"

"তুমি নিজেই ভেবে দ্যাখো। তিনজনেই হঠাৎ করে কাজে ঢুকে হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গিয়েছে। তিনজনেরই কোনো পরিচয়পত্র আমাদের কাছে নেই।" রুদ্র বলল, "আর তিনজনের কাজকর্মে মিলও রয়েছে। যেমন কানাই আর বলরাম পুজো করত, মোবাইল ফোন ব্যবহার করত না। আর স্বপন সরকারের আন্ডারে কাজ করা গোবিন্দ কিছুতেই কোনো বাইকে বা মোটরগাড়িতে উঠতে চাইত না। এই তিনটে ব্যাপারের মধ্যে কিছু তো একটা যোগসূত্র আছেই!" হয়ত তিনজন আসলে একই ব্যক্তি।

"কিন্তু, তিনজনের চেহারা বা মুখের যা বর্ণনা পেয়েছি, তাতে কিন্তু মিল তেমন পাইনি।" বীরেন শিকদার ফাইলের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, "কানাই ছিল ছোটখাটো, রং ফর্সা। বেঁটে হলেও গাঁট্টাগোঁট্টা গড়ন। বলরাম লম্বা চওড়া দশাসই চেহারার, রং কালো, কপালে একটা গভীর কাটা দাগ। আর গোবিন্দ খুবই রোগা, মাঝারি গায়ের রং, উচ্চতাও মাঝারি।"

রুদ্র হাতের পেনটা অন্যমনস্কভাবে চিবুকে ঠেকিয়ে টোকা দিচ্ছিল। বলল, "হুম। এক লোক না হলেও কিছু লিঙ্ক শিওর আছে। আপনি সুনীল ধাড়ার পড়শি দোকানদার রসিকলাল বিশাইয়ের স্টেটমেন্টটা পড়ুন। বলরাম সারাক্ষণ লুঙ্গি পরে থাকতে পছন্দ করত। সেইজন্য মি. বিশাই সন্দেহ করতেন, ছেলেটা মুসলিম হতে পারে।"

"তো?" বীরেনবাবু বুঝতে পারলেন না।

এবার রুদ্র কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনি তো স্বপন সরকার মার্ডার কেসের প্রথম থেকেই যুক্ত আছেন, ডিটেইলিং ফাইলে ওঁর স্ত্রী কী বলেছিলেন ভুলে গেলেন? গোবিন্দ মালকোঁচা মেরে লুঙ্গি পরত। এই নিয়ে দলের অনেকে হাসিঠাট্টাও করত।"

বীরেনবাবু এবার জিভ দিয়ে একটা আফসোসের শব্দ করলেন, "হ্যাঁ। তাই তো! আমি কি আরেকবার স্বপন সরকারের কেসের লোকগুলোকে জেরা করবো, ম্যাডাম?"

রুদ্র টেবিলের ওপর রাখা ভারী পেপারওয়েটটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, "আপনারা সবাই ফিল্ডে খুব ডেডিকেটেডলি কাজ করছেন আমি জানি। ছ'টা মার্ডার, সেগুলোর ফরেনসিক রিপোর্ট, মোটিভ খুঁজে বের করা, সাসপেক্টদের জেরা করা এভরিথিং। আপনারা যে নিজেদের একশো শতাংশ দিচ্ছেন, সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু আমাদের এই স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিমের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু চেইনটাকে খুঁজে বের করা। তাই লোকাল পুলিশ স্টেশন যেটা করছে, সেই একই কাজ করে আমাদের খুব

একটা লাভ নেই”। সবাই চুপ করে বসে আছেন গোলটেবিলটার চারপাশে। একটা ছুঁচ পড়লেও শব্দ হবে, এমনই নিস্তব্ধতা গোটা ঘরে।

রুদ্র একটা সাদা কাগজ টেনে নিল।

”আপাতত আমার কিছু অবজারভেশন বলি। তারপর আপনারাও সেগুলো নিয়ে ব্রেইনস্টর্ম করুন। আগেই বলেছিলাম, এই ছ'টা খুনই হয়েছে কোনো না কোনো বুধবারে, তাই তো?”

”ইয়েস ম্যাডাম!” সবাই সমস্বরে সায় দিলেন।

”মার্ডারের তারিখগুলো থেকে আপনারা কিছু আইডিয়া করতে পারেন?” রুদ্র বলল, ”এমনও তো হতে পারে, সাত নম্বর খুনের ক্ল্যু লুকিয়ে আছে তার মধ্যেই?”

সবাইকে নীরব দেখে ও কাগজে খসখস করে লিখতে লাগল, ”দেখুন।”

প্রথম খুন	১৫ই জানুয়ারি	বুধবার
দ্বিতীয় খুন	১২ই ফেব্রুয়ারি	বুধবার
তৃতীয় খুন	১১ই মার্চ	বুধবার
চতুর্থ খুন	১৫ই এপ্রিল	বুধবার
পঞ্চম খুন	১৩ই মে	বুধবার

”আপাতদৃষ্টিতে এই তারিখগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। কোনটা মাসের দ্বিতীয় বুধবার, কোনটা তৃতীয়।” রুদ্র কাগজে দাগ টানতে টানতে বলল, ”কিন্তু দেখুন, যদি আমরা তারিখগুলো তিথিনক্ষত্রের হিসেবে দেখি?”

প্রথম খুন	১৫ই জানুয়ারি	বুধবার	পঞ্চমী	কৃষ্ণপক্ষ
দ্বিতীয় খুন	১২ই ফেব্রুয়ারি	বুধবার	চতুর্থী	কৃষ্ণপক্ষ
তৃতীয় খুন	১১ই মার্চ	বুধবার	দ্বিতীয়া	কৃষ্ণপক্ষ
চতুর্থ খুন	১৫ই এপ্রিল	বুধবার	অষ্টমী	কৃষ্ণপক্ষ
পঞ্চম খুন	১৩ই মে	বুধবার	ষষ্ঠী	কৃষ্ণপক্ষ
ষষ্ঠ খুন	১০ ই জুন	বুধবার	পঞ্চমী	কৃষ্ণপক্ষ

রুদ্র লেখা শেষ করে সবার দিকে তাকাল, ”প্রতিটা খুন হয়েছে বাংলামাসের কৃষ্ণপক্ষে। যদি আমার ক্যালকুলেশন ঠিক হয়, তবে সাত নম্বর খুনটাও কৃষ্ণপক্ষেই হবে। অর্থাৎ ৬ই জুলাই থেকে ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে।”

"ও মাই গড!" বীরেন শিকদার বিস্ফারিতচোখে বললেন, "কিন্তু এই কৃষ্ণপক্ষকে বেছে নেওয়ার কারণ কী, ম্যাডাম?"

"সেটার একটা লজিক আমি ভেবেছি, কিন্তু এখনই বলছি না।" রুদ্র কাঁধ ঝাঁকাল, "কারণ এটাই যে সত্যি, তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে আমাদের ওই সময়টায় অ্যালার্ট থাকতে হবে।"

প্রিয়াঙ্কা একটা কাগজ টেনে নিয়ে হিসেব কষতে লাগল, "কিন্তু দিনটা? পঞ্চমী, চতুর্থী, দ্বিতীয়া, তারপর আবার অষ্টমী, ষষ্ঠী, পঞ্চমী ...! ধুর! সব গুলিয়ে যাচ্ছে!"

"কোন প্যাটার্ন যে থাকবেই, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবু এটা একটা পয়েন্ট।" রুদ্র বলল, "আপাতত, বীরেনবাবু বৈদ্যবাটি আর কোন্নগরের কেসটা একেবারে গ্রাসরুট লেভেল থেকে রি-ওপেন করুন। আর লোকেশবাবু আপনি টেকওভার করুন চন্দননগর আর চুঁচুড়ার কেসদুটো।"

রুদ্র উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করছিল, "কানাই হোক, বলরাম হোক বা গোবিন্দ, এবারে আমাদের তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আর এখন আমি একবার ত্রিবেণী যাব। জয়ন্ত চলো আমার সঙ্গে।"

১২

সাধারণ একটা একতলা বাড়ি। বহুদিনের মেরামতির অভাবে নানা জায়গায় রং খসে হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে। সামনের একচিলতে বারান্দায় ঝুলছে বাচ্চার ছোট ছোট জামাকাপড়।

ওসি সুকেশ সান্যাল একজন কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে-ই নিয়ে এল। তার নাম বিমল।

ওরা ডাইনিং এ বসে ছিল, একটা তেলচিটে সোফায়। ডাইনিং অবশ্য নামেই, গোটা বাড়িতে সাকুল্যে দুটো ঘর। একটা এই বসার ঘর, এর মধ্যেই বোধহয় খাওয়াদাওয়া সব কিছু। আর উলটোদিকে শোবার ঘর। এই দুটো ঘর আর রান্নাঘর, বাথরুম ছাড়া তো আর কিছু চোখে পড়ছেনা।

ছোট্ট একটি শিশু গোটা ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে নিজের মনে খেলছে, আ - উ জাতীয় অবোধ্য সব শব্দ করছে। মাঝেমাঝে কোনো কিছুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু টলোমলো পায়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়েই আবার থেবড়ে বসে পড়ছে মাটিতে। জয়ন্ত তার দিকে চেয়ে মুখ দিয়ে বিচিত্র কিছু আওয়াজ করতে সেও প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করল।

শাড়ি পরা অল্পবয়সি মেয়েটি রুদ্রর চেয়ে বয়সে ছোটই হবে, বড়জোর বাইশ-তেইশ। বিবর্ণ শাড়ি, শুভ্র সিঁথি। রোগা। অতিরিক্ত পরিশ্রমে কেমন ফ্যাকাসে। চুলের খোঁপা এলিয়ে পিঠের ঘামে লেপটে রয়েছে। রান্নাঘরের নুন-হলুদ লেগে থাকা মলিন শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে এসে সে ওদের সামনে গ্লাস বাড়িয়ে দিল।

"এই নিন, গরমে এসেছেন, একটু শরবত খান।"

"আমি অন ডিউটি কিছু খাই না, থ্যাঙ্ক ইউ।" বিব্রত রুদ্র বলে ওঠে। কিন্তু ততক্ষণে সুকেশ সান্যালের কনস্টেবল বিমল হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিয়েছে গ্লাসটা। সবে চুমুক দিতে যাবে, এমন সময় ম্যাডামের এমন উলটোকথা শুনে জয়ন্ত তার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল।

বিমল দ্বিধাগ্রস্ত মুখে গ্লাসটা ধরে বসে রইল। এই ম্যাডাম ওসি সাহেবের থেকেও উঁচুতে, তিনি না খেলে সে খাবে কি করে!

মেয়েটা ম্লান হাসে, "এটা তেমন কিছু না দিদি। একটু নুন - চিনির শরবত। রোদে তেতেপুড়ে এসেছেন, তাই। আর কীই বা আছে ঘরে, যে দেব! বাড়িতে অতিথি এলে এইটুকু তো দিতেই হয়।"

রুদ্রর অস্বস্তি হয়। খানিকটা দোনোমনা করে গ্লাসটা তুলে নেয় ও।

সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির সঙ্গে বিমলও ঠোঁটে গ্লাস ছোঁয়ায়।

রুদ্র ইচ্ছে করেই 'আপনি' না বলে সরাসরি 'তুমি'তে নেমে আসে, "এখন কীভাবে চলছে তোমাদের?"

মেয়েটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, ”কীভাবে আর চলবে। আমাদের মানে তো আমি আর আমার মেয়ে। আমি এখানেই একটা ছোট অফিসে রান্নার কাজ নিয়েছি। তিন হাজার টাকা পাই। ওতেই মোটামুটি চালিয়ে নিতে হয়। মেয়েটার দুধ নিয়ে একটু যা টানাটানি হয়। সবে তো দশমাস বয়স।”

জয়ন্ত বলল, ”শিবনাথ বিশ্বাসের দোকানটা?”

”সেটা পড়েই আছে। বাজারে ওর বেশ কিছু ধার ছিল। কম্পিউটারগুলো বেচে সেই ধার শোধ করলাম। তাও ভেঙে গিয়েছিল বলে খুব কম দাম পেয়েছি। দোকানটা আর খুলিনি। ওই গঙ্গার ধারে ফাঁকা রাস্তায় কিসেরই বা দোকান করব? আর আমি একা চালাবই বা কী করে! মেয়েটাকে পাশের বাড়িতে রেখে কোনোরকমে গিয়ে দু-তিনঘণ্টায় রান্না সেরে আসি।” মেয়েটার গলা বলতে বলতে ধরে আসে, ”আপনি বিশ্বাস করুন দিদি, আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আমি ... আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। আমি কিচ্ছু করিনি।”

”তোমার নাম কী?” রুদ্র নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

”আরতি।”

রুদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। জয়ন্ত গাড়িতে আসতে আসতে বলছিল, ”খুব স্ট্রেঞ্জ কেস। ওসি সুকেশ সান্যাল যতই বউ আর পাড়ার ওই ছেলেটাকে অ্যাকিউজ করুক, প্রুফ কোথায়? শিবনাথের দোকান শ্রীহরি সাইবার ক্যাফের লোকেশনটা একদম ফাঁকা জায়গায়। দুদিক থেকে দুটো বড় রাস্তা দিয়ে ওই গলিতে আসা যায়। সেই দুটো রাস্তাতেই বড়বড় দুটো মিষ্টির দোকান। তাদের দোকানের সামনে সিসিটিভি লাগানো আছে। কিন্তু ফুটেজ চেক করে ওইসময়ের দু-তিনঘণ্টা আগে পর্যন্ত এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যে সন্দেহ করা যেতে পারে।”

রুদ্র জিজ্ঞেস করেছিল, ”ওর ক্যাফেতে সেদিন যারা এসেছিল?”

”সেদিন গোটা দিনে কোনো কাস্টমারই আসেনি ওর সাইবার ক্যাফেতে। দোকান থেকে বেরোনোর কিছুক্ষণ আগেই নিজের স্ত্রীকে ফোন করে জানিয়েছিল শিবনাথ। আর ওর দোকানে যেই যাক, দুদিকের দুটো মিষ্টির দোকানের যে কোনো একটার সামনে দিয়ে যেতে হবে। তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি। জায়গাটা খুবই নির্জন।”

”এমনও তো হতে পারে, মিষ্টির দোকান আর শিবনাথের ক্যাফে, দুটোর মাঝখানের কোন বাড়িতে কেউ লুকিয়েছিল।”

”হুম, তা পারে।” জয়ন্ত বলেছিল, ”সেইজন্যই ইনভেস্টিগেশন ফাইলে দেখবেন, লোকাল পুলিশ অফিসার কাছাকাছি সব বাড়িতে জেরা করেছিলেন। কিন্তু সেরকম উল্লেখযোগ্য কিছুই পাননি।”

রুদ্র বর্তমানে ফিরে এল। বলল, ”আরতি, আমরা তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। এও জানি যে তুমি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত। তবু, তোমার কাছে এসেছি কিছু বিষয় জানতে।”

আরতি চুপ করে রইল।

”তোমার নিজের বাড়ি কোথায়?”

"নিজের বাড়ি মানে?" আরতি সামান্য থমকাল, "ওহ, বাপের বাড়ি? বারুইপুর। বাবা-মা কেউ নেই। ছোটবেলাতেই মারা গেছে। আমি মামার বাড়িতে মানুষ। ওই বারুইপুরেই। মামারাই সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছিল।"

"১৫ই জানুয়ারি শেষ কখন তোমার সঙ্গে শিবনাথের কথা হয়েছিল?" রুদ্র জিজ্ঞেস করল।

"সাড়ে আটটার সময়।" একটুও না ভেবে উত্তর দিল আরতি, "ও খুব মনমরা হয়ে কথা বলছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে। বলল, সারাদিনে একটাও খদ্দের আসেনি। আমি বললাম, ঠিক আছে, তুমি বাড়ি চলে এসো।"

"কারুর আসার কথা আছে, এমন কিছু কি বলেছিল তোমায়?" রুদ্র জিজ্ঞেস করল।

"নাতো। আসলে শিবুর বন্ধুবান্ধব তেমন ছিল না। ঘরে থাকতেই বেশি ভালোবাসত। দোকানে যেত, দোকান বন্ধ করেই আবার ঘরে চলে আসত।" আরতির গলাটা বুজে এল।

"কেউই কি ছিল না যে শিবনাথের দোকানে আড্ডা মারতে যেত?"

আরতি একটু ভেবে বলল, সে'রকম তো আমি কাউকে চিনি না।"

রুদ্র বলল, "দোকানে রাজু বলে যে ছেলেটি আগে কাজ করত ...।"

আরতি বোধ হয় এতক্ষণ ধরে এই প্রশ্নটারই প্রতীক্ষা করছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, "বিশ্বাস করুন দিদি, রাজু আমার ভাইয়ের মতো। আমি এখানে এসে থেকে ওকে রাখি পরাই। হ্যাঁ, এটা ঠিক ওইসময় কয়েকদিন ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ফোনে কথা বলতাম। কিন্তু তার কারণ আপনারা যেটা ভাবছেন সেটা নয়। তখন বান্ধবীর সঙ্গে রাজুর ঝগড়া হয়েছিল। বেচারা মন খারাপ নিয়েই ট্যুর নিয়ে গিয়েছিল পুরীতে। আমি তাই ওকে ফোনে বোঝাচ্ছিলাম। দিদির মতো।"

রুদ্র কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আরতির চোখের দিকে। তারপর বলল, "রাজু এখন কোথায়?"

"ওকে পুলিশ বেশ কয়েকবার থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছে। মারধোরও করেছে। এখন কোথায় আমি জানি না। আমার বাড়িতে অনেকদিন আসেনি।"

রুদ্র উঠে দাঁড়াল। একেবারেই ছন্নছাড়া বাড়ি। এখানে ঝাঁটা পড়ে রয়েছে, ওখানে হাড়ি-খুন্তি, এদিকে কিছু ময়লা জামাকাপড়, ওদিকে বাচ্চার দুধের টিন। বোঝাই যাচ্ছে, আরতি একা পেরে ওঠে না। একটা কাঠের টেবিল, তার ওপর স্তূপাকৃতি করা বইপত্র।

বইপত্রের ওপরের দেওয়ালে তিনটি বড় বড় বাঁধানো ছবি। মাঝেরটা শিশু গোপালের হামাগুড়ি দেওয়া ছবি। দুদিকের ছবিদুটো এক পুরুষ ও এক মহিলার। তাতে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া।

"এঁরা কারা?"

আরতি বলল, "আমার শ্বশুর শাশুড়ি। দুজনেই মারা গিয়েছেন, অনেকদিন হল। আমার বিয়ের অনেক আগে।"

রুদ্র টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। বেশিরভাগই বাজারচলতি পত্রপত্রিকার পুজোসংখ্যা। একেবারে নীচে একটা ল্যাপটপ। ধুলোর পুরু আস্তরণ তার ওপর। ও ওপরের বইগুলো সাবধানে ধরে ল্যাপটপটা বের করল। কিন্তু সেটা অন হল না। চার্জ নেই।

”এটা কার ল্যাপটপ?”

আরতি ম্লান গলায় বলল, ”ওরই ছিল। বাড়ির কাজে ব্যবহার করত। আমাকে মাঝেমাঝে সিনেমাও দেখাত। এখন অনেকদিন খোলা হয় না।”

১৩

এস পি স্যার রাধানাথ রায় বসেছিলেন তাঁর বাংলোর বাগানে। রুদ্রর বাংলোর চেয়ে আকারে আয়তনে অন্তত আড়াইগুণ বড় শ্রীরামপুরের এই পুলিশ সুপারের বাংলো। বিশাল বাগান, তাতে নানারকম গাছ। আজ সকালে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তাই গাছের পাতাগুলো ভিজে আরও ঝকঝকে দেখাচ্ছে।

রুদ্র গাড়ি থেকে নেমে গেট দিয়ে ঢুকে সোজা এগিয়ে এল, তারপর স্যালুট ঠুকে বলল, "গুড মর্নিং, স্যার!"

"মর্নিং, রুদ্রাণী! বোসো।" রাধানাথ রায় একটা ছুরি দিয়ে নিজেই আপেল কাটছিলেন। পরনে ধোপদুরস্ত পাজামা পাঞ্জাবি। এই সকালেই স্নান টান করে একেবারে পরিপাটি।

টেবিলে রাখা একটা দুধসাদা প্লেট, তাতে নানারকমের ফল। আপেল, মুসুম্বি, কলা, আঙুর, আম, কিছু বাকি নেই। পাশে আরেকটা প্লেটে থাক থাক সাজানো পাউরুটি। রয়েছে মাখন আর জ্যামের শিশিও। সব মিলিয়ে প্রাতঃরাশের এলাহি আয়োজন।

"এই নাও। আপেল খাও। সকাল সকাল আপেল শরীরের জন্য খুব উপকারী।" এস পি স্যার দুটো আপেলের টুকরো এগিয়ে দিলেন রুদ্রর দিকে।

"থ্যাংক ইউ স্যার!" রুদ্র একটু আগে পেট ভরে রুটি আলু চচ্চড়ি খেয়ে এলেও এখন আপেল খেতে 'না' করল না। স্যারের উলটোদিকের লোহার চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল।

পাশেই গঙ্গা। হু হু করে ভেসে আসছে ঠান্ডা নদীর হাওয়া। এস পি রাধানাথ রায় একজন সিনিয়র আই পি এস অফিসার হলেও উনি কর্মজীবনে কোনো প্রোমোশন নেননি। বেশ কয়েকবছর তিনি এই জেলাতেই আছেন। রুদ্র এসেই শুনেছিল, ওঁর চেয়ে অনেক জুনিয়র অফিসাররা এখন অনেক ওপরে উঠে গিয়েছেন, কিন্তু পদে অধস্তন হয়েও রাধানাথ রায়কে সকলে খুব মানেন।

স্যারের রেকর্ড নাকি ঈর্ষণীয়। প্রথম জীবনে দারুণ কিছু কেস উনি একাই সলভ করেছিলেন। উনি নাকি এমন কাজপাগল, যে কেরিয়ারের জন্য বিয়েই করেননি। তবে বেশ খামখেয়ালি মানুষ, নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার জন্য অনেকবার অপ্রীতিকর শো-কজেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। চাকরিজীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তিনি এখনো অত্যন্ত সুদর্শন ও দীর্ঘকায়।

"তারপর? কেমন কাজ করছে তোমার টিম?" স্যার বললেন।

রুদ্র বলল, "স্যার, আমি তো প্রতিদিন রাতেই আপনাকে ইমেলে ডিটেইল প্রোগ্রেস পাঠাচ্ছি।"

এস পি স্যার বললেন, "আহা সে তো আমি পড়েছি। কাকে কী ইন্টারোগেশন করলে, কোথায় ইনভেস্টিগেট করতে গেলে, এইসব ফর্ম্যাল প্রোগ্রেস রিপোর্ট নয়, আমি তোমার থেকে শুনতে চাইছি, তুমি এমনিতে কতটা এগিয়েছ বা কোনদিকে ভাবছ। মানে আদৌ

কি ডি এমের অনুমান ঠিক? আদৌ কি কোনো লিঙ্ক আছে সবকটা খুনের মধ্যে? নাকি প্রতিটাই অ্যাবস্ট্রাক্ট!"

রুদ্র একটু চুপ করে রইল।

রাধানাথ রায় বিরক্তমুখে বললেন, "ডি এম তো কোনো কথাই শুনতে চাইছেন না। ওঁর এই আজগুবি থিয়োরি আবার জানিয়েছেন কমিশনারকে, তিনিও নাচছেন। আমার হয়েছে যত জ্বালা! গোটা রিজিয়ন সামলাব, না এই মার্ডার মিস্ট্রি সলভ করব? রিটায়ারমেন্টের আর পাঁচ মাস বাকি, এইসময়ে এত ঝুটঝামেলা আর ভালো লাগেনা।"

রুদ্র বলল, "কিন্তু স্যার, আমার কিন্তু ম্যাডামের ধারণাটা একেবারে অযৌক্তিক লাগছেনা। আপনাকে রিপোর্টে কানাই, বলরাম, গোবিন্দর ব্যাপারটা তো লিখেইছিলাম, আরও কিছু ইন্টারেস্টিং লিঙ্ক রয়েছে।"

"তাই? কীরকম শুনি?" রাধানাথ স্যার কৌতূহলী চোখে তাকালেন।

রুদ্র সংক্ষেপে প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বুধবারের সাদৃশ্যের কথা বলল। প্রতিটা খুনই যে ঘটছে কৃষ্ণপক্ষে, সেটাও বোঝাল।

রাধানাথ রায় বললেন, "কৃষ্ণপক্ষ! প্রোফেশনাল রাইভ্যালরির জন্য ব্যবসাদারদের খুন করছে যদি ধরেও নিই, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ বেছে বেছে কেন খুন করতে যাবে?"

"সেটাই এখনো বুঝতে পারছিনা, স্যার!" রুদ্র ম্লানমুখে বলল, "হতে পারে এটা আমার ভুল অনুমান।"

রাধানাথ রায় পাউরুটিতে জ্যাম লাগাতে লাগাতে বললেন, "দ্যাখো রুদ্রাণী, তুমি একেবারেই জুনিয়র। কোনো প্রোবেশনারকে এই রকম কেস লিড করতে দেওয়ার কথাই নয়। হায়দ্রাবাদে শুধু ট্রেনিং করে এলেই তো হয়না, চাই ফিল্ড লেভেলে অভিজ্ঞতা। কিন্তু তবু আমি ডি এম এর সঙ্গে ডিসকাস করে তোমায় ভার দিয়েছি। কারণ আমার মনে হয়েছে তুমি পারবে। কিন্তু আমিও তো অনেকের কাছে আন্সারেবল, তাই না! গোটা সার্ভিস লাইফ সুনামের সঙ্গে কাজ করে এসেছি। শেষ সময়ে এসে সেটায় আমি দাগ লাগাতে দিতে পারিনা।"

"সে তো অবশ্যই, স্যার!" রুদ্র বলল, "তবে তর্কপঞ্চাননের বাড়ির ভিক্টিমের কর্মচারী কিছু ফলস স্টেটমেন্ট দিয়েছে। আমরা তাকে আরও ভালো করে ইন্টারোগেট করছি।"

"তর্কপঞ্চানন?" এস পি ভ্রূ কুঁচকোলেন, "মানে?"

রুদ্র হেসে সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা শুধরে নিল, "স্যরি স্যার। আমি ওই ব্রিজেশ তিওয়ারির কথা বলছি। উনি যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেটা এইট্টিন্থ সেঞ্চুরির লেজেন্ডারি পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাড়ি। আমিও জানতাম না, কিন্তু জানা ইস্তক ইতিহাসের অনেক ঘটনা জানতে পারছি। হি হ্যাড ইনক্রেডিবল ট্যালেন্টস।"

রাধানাথ স্যার একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে হেলান দিলেন। রুদ্রর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইতিহাস ছেড়ে এবার বর্তমানে ফিরে এসো রুদ্রাণী। বুঝতেই তো পারছ। স্বপন সরকার আর হৃষীকেশ জয়সোয়ালের জন্য পলিটিক্যাল পার্টি থেকেও বেশ প্রেশার আসছে। ইতিহাস দেখলেই তুমি নেচে ওঠো তা আমি জানি। কিন্তু এখন এ'সব ঘাঁটার সময় নয়।"

রুদ্র বকুনি খেয়ে চুপ করে গেল। বলল, "রাইট স্যার।"

এস পি বললেন, ”নিজেকে অ্যামেচার গোয়েন্দা না ভেবে পুলিশ ভাবো। ফরেনসিক রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে পড়ো। প্রতিটা ওসির সঙ্গে কথা বলে সেই লোকালিটির দাগি ক্রিমিনালদের ম্যারাথন ইন্টারোগেট করতে বলো। প্রয়োজনে ইনফর্মার লাগাও। জয়ন্ত, প্রিয়াঙ্কা, লোকেশ, বীরেন, এদের একেকটা ভাগের দায়িত্ব দাও। দেখবে কিছু না কিছু ঠিক বেরিয়ে আসবে। কয়েকদিন পরেই একটা মিটিং থাকবে, সেখানে একটা উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রেস যেন থাকে!”

কথা শেষ করে পাঞ্জাবির পকেট থেকে স্যার একটা ডায়েরি বের করলেন। সেটা খুলে মেলে ধরলেন রুদ্রর দিকে। পরপর সব খুনগুলোর ডিটেইল লেখা রয়েছে তালিকার আকারে।

হুগলী সিরিয়াল কিলিং কেস :

প্রথম খুন	১৫ই জানুয়ারি	শিবনাথ বিশ্বাস (৩৮)	ত্রিবেণী
দ্বিতীয় খুন	১২ই ফেব্রুয়ারি	মহম্মদ তারেক (৩২)	চন্দননগর
তৃতীয় খুন	১১ই মার্চ	সুনীল ধাড়া(৪১)	বৈদ্যবাটি
চতুর্থ খুন	১৫ই এপ্রিল	হৃষীকেশ জয়সোয়াল(৪৮)	চুঁচুড়া
পঞ্চম খুন	১৩ই মে	স্বপন সরকার (৪৫)	কোন্নগর
ষষ্ঠ খুন	১০ই জুন	ব্রিজেশ তিওয়ারি (৩৮)	ত্রিবেনী

রুদ্র অন্যমনস্কভাবে দেখছিল লিস্টটা। এটাই ওকে প্রথমদিন ডি এম অফিসে রাধানাথ স্যার দেখিয়েছিলেন।

স্যার বললেন, ”এই লিস্টে যেন আর একটাও না রো অ্যাড হয়, মেক শিওর অ্যাবাউট দ্যাট, রুদ্রাণী!”

১৪

গুরুদেব নারায়ণী চতুষ্পাঠীর উচ্চবেদিতে পদ্মাসনে বসেছিলেন। অনুরূপ ভঙ্গিতে বসে ছিল চারটি প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রেরাও। মধুসূদন, গোবর্ধন ও বংশীধরের মতো বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্ররা বসে ছিলেন অদূরে।

গুরুদেব একটা সুদীর্ঘ প্রশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন, ”আমি বুঝতে পারছি, তোমাদের খুব পরিশ্রম হচ্ছে। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো এত কঠিন নিয়মশৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে কেন তোমাদের যেতে হচ্ছে। তার কারণ, যে মহৎ উদ্দেশ্যে বৈদিক সমাজের সূচনা ঘটেছিল, তা চরিতার্থের মাহেন্দ্রক্ষণ ক্রমেই উপস্থিত হচ্ছে। গত কয়েকমাসে গোবর্ধনের মতো উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা করে দিয়েছে তার শুভারম্ভ। অন্তিম লক্ষ্যপূরণের জন্য আমার প্রয়োজন তোমাদের সকলকে। তার আগে তোমাদের কিছু ঘটনা জানা প্রয়োজন।

গুরুদেব থামলেন। তাঁর ইশারায় বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদের একজন দ্রুতপদে চলে গেলেন। অনতিবিলম্ব পরেই ফিরে এলেন বিষ্ণুমন্দিরের প্রসাদ নিয়ে। পরমগুরুর প্রসাদ। সকলকে একটু করে হাতে দিতে লাগলেন তিনি।

প্রসাদপর্ব মিটলে গুরুদেব আবার শুরু করলেন।

”ভগবান বিষ্ণু তিনি প্রতিটি যুগে নানা অবতারে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর প্রথম অবতার মৎস্য। তোমরা কি মৎস্য অবতারের কাহিনী জানো?”

”না গুরুদেব।”

”সত্যযুগে সত্যব্রত নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পৃথিবীতে হঠাৎ নানারকম অন্যায় ও অত্যাচার দেখা দেয়। রাজা তখন জগতের সার্বিক কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করেন। একদিন সত্যব্রত জলাশয়ে স্নান করছেন। একটি অতিক্ষুদ্র পুঁটিমাছ এসে তাঁর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায়।

”অনুগ্রহ করে আমাকে রক্ষা করুন হে রাজন। নাহলে অচিরেই জলাশয়ের বৃহৎ মাছেরা আমায় খেয়ে ফেলবে।”

রাজা সত্যব্রতর দয়া হল। তিনি একটি কমণ্ডলুতে করে মাছটাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। কিন্তু পুঁটিমাছটির আকার ভীষণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। কমণ্ডলু ছাড়িয়ে বড় পাত্র, পাত্র ছাড়িয়ে স্নানাগারের জলাধার, জলাধার ছাড়িয়ে পুকুর, সরবর, নদী, যেখানেই তাকে রাখা হয়, আয়তনে ধরে না।

মৎস্য

রাজা বুঝতে পারলেন, ইনি নিশ্চয়ই ভগবান বিষ্ণু তাঁর কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে মৎস্যরূপে পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে তখন মৎস্যরূপী বিষ্ণু বললেন, "গোটা বিশ্ব অনাচারে ভরে গেছে। তাই সাতদিনের মধ্যেই শুরু হবে মহাপ্রলয়। বিনষ্ট হবে বর্তমান সমস্ত কিছু। নতুন করে সবকিছু শুরু হবে ধরাধামে। প্রলয় শুরুর আগে একটি স্বর্ণতরী এসে তোমার ঘাটে ভিড়বে। তুমি সবরকমের প্রাণীযুগল ও সবপ্রকারের খাদ্যশস্য, বৃক্ষবীজ নিয়ে সেই স্বর্ণতরীতে আরোহণ করবে। আমি শৃঙ্গরূপী মৎস্য হয়ে প্রলয় শুরু করব। আমার শৃঙ্গের সঙ্গে তুমি তোমার তরীখানি বেঁধে রাখবে। প্রলয়শেষে যখন সব শান্ত হয়ে যাবে, অন্যায়মুক্ত পৃথিবীতে তোমার নৌকোয় থাকা সব প্রাণের আবার নবোন্মেষ ঘটবে।"

দ্বারিকার মন টিকছিল না। গুরুদেবের রক্তহিম চাহনি ওর ওপর বর্ষিত হতে পারে জেনেও ওর মন বারবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। আজ দুদিন হয়ে গেল অচ্যুতের কোনো সন্ধান নেই। কালু কৈবর্তের দল কোথায় নিয়ে গেল ওকে?

এই প্রশ্নটা যতবার ওর মনের মধ্যে আসছে, ততবার ওর গলায় একটা চাপা কষ্ট দলা পাকাচ্ছে। অচ্যুতের আপনার বলতে এই গোটা সমাজে কেউ নেই, তাই ওর নিরুদ্দেশ নিয়ে কেউ বিচলিতও নয়।

কিন্তু দ্বারিকা? দ্বারিকা যে অচ্যুতকে বড় ভালোবাসত! এই দমবন্ধ করা সমাজে অচ্যুতই ছিল একমাত্র মানুষ, যার কথা শুনলে ভয় করত, কিন্তু একইসঙ্গে শিহরণ জাগত গোটা শরীরে। সব ভয় সরিয়ে ইচ্ছে হত স্বপ্ন দেখার।

দ্বারিকা এমনিতে ভিতু হলেও অসীম সাহসে ভর করে গতকাল বিকেলে গিয়েছিল কৈবর্তদের পাড়ায়। কালু কৈবর্তের দলে একটা ছেলে আছে, তার নাম নিশাদ। নিশাদ

ওদেরই বয়সি, জরা নদীতে মাছ ধরে। ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করেছিল দ্বারিকা। কলাপাতায় মুড়ে অনেকটা ক্ষীরও নিয়ে গিয়েছিল লুকিয়ে।

ছেলেটা ক্ষীরটা চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছিল, তারপর বলেছিল, ”উসব আমি জানেক লাই রে। উ ছিলাডারে শ্মশানপানে লিয়ে গেছল, ইটুকু শুধু জানি।”

শ্মশান? দ্বারিকার বুক কেঁপে উঠেছিল। শ্মশানে কেন? অচ্যুতকে কি পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে? লঘু পাপে গুরু দণ্ড নয় কি? শ্মশানের ওদিকে তো যাওয়া অসম্ভব, কীভাবে ও জানবে ওর প্রিয়বন্ধুর পরিণতি?

গুরুদেবের গুরুগম্ভীর কণ্ঠে দ্বারিকা আবার বর্তমানে ফিরে এল।

”ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

অহং সর্বস্যপ্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাভাবসমন্বিতাঃ।।*

শ্লোকটা উচ্চারণ করে গুরুদেব বনমালীকে ইঙ্গিত করলেন, ”এর মর্মার্থ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করো তো বাবা।”

বনমালী উঠে দাঁড়িয়ে সামান্য গলা পরিষ্কার করে বলল, ”আমি জড় এবং চেতন—দুই জগতেরই সমস্ত কিছুর উৎস। সমস্ত কিছুই আমার থেকে প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে যারা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী।”

”বাহ, অতি উত্তম।” গুরুদেব বললেন, ”বাবাসকল, একটা কথা ভালো করে বোঝো, ভাগবতপুরাণে বলা হয়েছে, কৃষ্ণস্তু ভগবানস্বয়ম শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু বিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণ। শুধু তাই নয়, ভগবান বিষ্ণু শিব—ব্রহ্মা—আদি সকলের উৎস।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষিনাং চ সর্বশঃ।”*

”বুঝতেই পারছ, যখনই মর্ত্যলোক পাপিষ্ঠ ও অশুভ লোকে ভরে গিয়েছে, ভগবান বিষ্ণু তখনই কখনো মৎস্য, কখনো বরাহ, কখনো কূর্ম অবতারে আবির্ভূত হয়েছেন। বিনাশ করেছেন সমস্ত দুষ্ট শক্তিকে। কখনো তিনি পরশুরাম, কখনো তিনিই রাম। আবার কখনো তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।” গুরুদেবের মেঘমন্দ্র স্বর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল গোটা চাতালে।

---

* ভগবদগীতা ১০/৮

* দেবতারা বা মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন না। কারণ আমি দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ। - ভগবদগীতা — ১০/২

১৫

শিবনাথের বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর প্রায় দশদিন কেটে গিয়েছে। রুদ্র তদন্তে একচুলও এগোতে পারেনি। প্রতিদিন নিয়ম মাফিক এস পি স্যারকে প্রোগ্রেস রিপোর্ট পাঠাচ্ছে বটে, কিন্তু ও বেশ বুঝতে পারছে, কিচ্ছু এগোচ্ছে না। বরং যতদিন যাচ্ছে, একটা হতাশা এসে গ্রাস করছে ওকে।

এ কী হল। যখন ব্যাঙ্কে চাকরি করত, হঠাৎ করেই জড়িয়ে পড়ত নানারকম সমস্যায়। প্রথমবার বাবাকে খুঁজতে ভুটানে গিয়ে এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল।[১] দ্বিতীয়বার প্রিয়মের কাছে লন্ডনে ছুটি কাটাতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছিল নাৎসী জার্মানির এক লুপ্ত পরিকল্পনার ওপর গড়ে তোলা আন্তর্জাতিক এক ষড়যন্ত্রে।[২] আর আগ্রায় পোস্টেড থাকার সময় তো সাম্প্রদায়িক বীজবপনের আঙ্গিকে এক ভয়ঙ্কর নাশকতা হামলার প্রস্তুতির খোঁজ পেয়েছিল।[৩]

এই প্রতিটা ঘটনাতেই ও পুলিশকে যতটুকু সাহায্য করতে পেরেছিল, তা একজন সাধারণ যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে। এই তিনটি ঘটনা হয়তো ওকে ভেতরে ভেতরে অনেক সাহসী ও আত্মবিশ্বাসীও করে তুলেছিল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্বের ইন্টারভিউ প্যানেলে এই কাজ নিয়ে ও অনেক প্রশংসাও কুড়িয়েছিল।

কিন্তু আজ যখন ও নিজেই পুলিশ দপ্তরের একজন? পরোক্ষভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবে এক সিরিয়াল কিলিং তদন্তের জাল গুটিয়ে আনার ভার যখন তুলে দেওয়া হয়েছে ওর ওপর? কী করতে পারছে ও?

রুদ্র চুপচাপ খোলা ব্যালকনিতে বসে ভাবছিল। সকাল হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ।

অন্যদিন এইসময় ক্ষমা বাগানে খেলে। কিন্তু কাল থেকে কী হয়েছে মেয়েটার, কিছুতেই ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। জ্যোৎস্নাদি, পাঁচু এমনকী প্রিয়মও চকোলেটের লোভ দেখিয়ে ওকে বাইরে বের করতে পারেনি। ওর মা মল্লিকাদি একটু আগে চায়ের কাপ নিয়ে এসেছিল রুদ্রর কাছে। মুখে কেমন ভয়ের ছাপ।

"কী হয়েছে ক্ষমার?" চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জানতে চেয়েছিল রুদ্র।

মল্লিকাদি বলেছিল, "জানিনা দিদিমণি। কেমন খিঁচিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে।"

"জ্বর আছে গায়ে?"

"হ্যাঁ। অল্প।"

রুদ্র বলেছিল, "গরম দুধ খাওয়াও বারবার। বিকেলের মধ্যে না ঠিক হলে ডাক্তারকে কল দেব।"

মল্লিকাদি মৃদু ঘাড় নেড়ে চলে গিয়েছিল। রুদ্র আবার ডুবে গিয়েছিল নিজের ভাবনায়।

সত্যি বলতে কী, নিজের প্রতি ওর এখন খুব লজ্জা লাগছে। মনে হচ্ছে, যে বাহবা ও ইন্টারভিউ বোর্ডে কুড়িয়েছিল, অতীতের যে কার্যকলাপ হয়তো ওর ইন্টারভিউয়ের

নম্বরকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল, তা প্রতারণা মাত্র। ও আসলে এইসব কাজের যোগ্যই নয়।

এই ইনভেস্টিগেশন চলাকালীন সপ্তাহ দু'বার জেলাশাসক ফোন করছেন। আশাভরা কণ্ঠে বলছেন, রুদ্রাণী সিংহরায় পারবে এ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

ওদিকে এস পি রাধানাথ স্যার প্রতিদিনের মতো ওকে অফিস যেতে বারণ করেছেন। বলেছেন, বাংলোর অফিস থেকেই কাজ চালাতে।

কিন্তু কী কাজ চালাচ্ছে ও? বিক্ষিপ্তভাবে একেকটা হত্যার একেকরকম দিক খুঁজে পাচ্ছে। যেন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ধাঁধাঁ। কিন্তু এভাবে প্রতিটা ধাঁধাঁর উত্তর খোঁজা তো ওর কাজ নয়, ওর কাজ হল, প্রতিটা ধাঁধাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা শক্ত সুতোটা খুঁজে বের করা। তারপর সেটাকে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলা।

কিন্তু আদৌ কি তেমন কোন সুতো আছে? নাকি, প্রতিটা খুনই বিচ্ছিন্ন, এই বুধবার আর কৃষ্ণপক্ষের ব্যাপারটা নেহাতই কাকতালীয়! ফরেনসিকের রিপোর্টগুলো থেকেও কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

এমন সময় গেট দিয়ে ঢুকল একটা গাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে সোজা গটগট করে ঢুকে এলেন বীরেন শিকদার। সামনে এসে স্যালুট ঠুকে বললেন, "গুডমর্নিং ম্যাডাম!"

"মর্নিং। বসুন।" রুদ্র বলল, "বলুন। কী আপডেট?"

"আপনি আমাকে স্বপন সরকার আর সুনীল ধাড়ার কেসটা প্রথম থেকে শুরু করতে বলেছিলেন। স্বপন সরকার প্রথমে সাধারণ ঠিকাদারির কাজ করত, তারপর বছরকয়েকের মধ্যেই বেশ পয়সা করে ফেলে। লোকাল পলিটিক্সে বেশ দ্রুত উঠতে থাকে। তাছাড়া, ও বেশ কিছু ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিল।"

"এটা ফাইলেও লেখা ছিল। কী ধরনের ধর্মীয় সংগঠন?"

"এমনি গ্রামগঞ্জের দিকে যে ছোটখাটো আশ্রম থাকে না, সেইরকম বেশ কিছু জায়গায় নিয়মিত অনুদান দিত। তো আমি ওসিসায়েবের সঙ্গে বাড়ি গিয়ে আরও একবার ভালো করে সার্চ করলাম। আর তখনই এই ছবিটা পেলাম।" বীরেন শিকদার একটা ফোটোগ্রাফ বাড়িয়ে দিলেন।

রুদ্র হাতে নিয়ে দেখল, একটা অনুষ্ঠানমঞ্চের ছবি। মঞ্চে বসে আছেন চারপাঁচজন মানুষ। একজনের পেছনে ঝুঁকে পড়ে কিছু বলছে একটা রোগা চেহারার ছেলে। পাশের ভদ্রলোকও তা বেশ উৎসাহের সঙ্গে শুনছেন। একটি বাচ্চা মেয়ে শাড়ি পরে স্টেজে উঠছে হাতে ফুলের স্তবক নিয়ে।

সবার পেছনে নীল শামিয়ানার ওপর থার্মোকোল কেটে লেখা:

শ্রী শ্রী গোপালকৃষ্ণ মহারাজের ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী

উদযাপন

বাগডাঙা সরলাশ্রম, বাগডাঙা।

রুদ্র বলল, "এই বসে থাকা দুজন ভদ্রলোক স্বপন সরকার আর হৃষীকেশ জয়সোয়াল না?"

"একদম ঠিক বলেছেন ম্যাডাম। কেস ফাইলের ছবির সঙ্গে পুরো মিলে যাচ্ছে। আর আমি এই ছবি স্বপন সরকারের কাছের লোকদেরও দেখিয়েছি।" বীরেন শিকদার বললেন, "আর ওই ঝুঁকে কিছু বলা ছেলেটা কে বলুন তো?"

রুদ্র ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বিস্ফারিত চোখে বলল, "গোবিন্দ?"

"একদম ঠিক ধরেছেন। হৃষীকেশ জয়সোয়াল আর স্বপন সরকার এই আশ্রমে নিয়মিত যেতেন। দুজনের মধ্যে পরিচয়ও ছিল।"

"এক্সেলেন্ট! বীরেন বাবু, আপনি জিনিয়াস!" রুদ্র প্রায় লাফিয়ে উঠল, "এই বাগডাঙা জায়গাটা কোথায়?"

"চন্দননগর সাবডিভিশনে, ম্যাডাম।" বীরেনবাবু বললেন, "খুবই প্রত্যন্ত একটা গ্রাম।"

"চলুন, এখুনি যেতে হবে আমাদের।"

---

১ রুদ্র প্রিয়ম সিরিজের প্রথম উপন্যাস 'ঈশ্বর যখন বন্দি' দ্রষ্টব্য।

২ রুদ্র প্রিয়ম সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস 'নরক সংকেত' দ্রষ্টব্য।

৩ রুদ্র প্রিয়ম সিরিজের তৃতীয় উপন্যাস 'অঘোরে ঘুমিয়ে শিব' দ্রষ্টব্য।

১৬

বাগডাঙা গ্রামটা নামেই চন্দননগর মহকুমায়, আসলে একটা গণ্ডগ্রাম। চন্দননগর থেকে গঙ্গার উলটোদিকে প্রায় একঘণ্টা গাড়ি ছুটিয়ে তবে পৌঁছনো যায়। সবুজ খেত আর গাছগাছালিতে ভরা এলাকা, সরলাশ্রম জিজ্ঞেস করতেই একজন দেখিয়ে দিল দূরে।

রুদ্র আজ ইচ্ছে করেই অফিসের গাড়ি নেয়নি। সাধারণ গাড়িতে এসেছে। সঙ্গে রয়েছেন বীরেনবাবু।

আশ্রমটা অনেকটা জায়গা জুড়ে খোলা খেত, তার মাঝখানে। রাস্তা থেকে পায়ে চলা সরু পথ চলে গেছে আলের ওপর দিয়ে। রুদ্র আর বীরেনবাবু সেই আলপথের ওপর দিয়ে হেঁটে পৌঁছলেন।

ছিমছাম আশ্রম। তরিতরকারির চাষ হচ্ছে একপাশে। অন্যদিকে চার-পাঁচটা একতলা বাড়ি। বাড়িগুলোর ছাদ টালির, সেই টালির ওপর বিছিয়ে রয়েছে কুমড়োলতা। সামনে অনেকটা করে খোলা জায়গা। সেখানে ফুটে আছে কিছু মরশুমি ফুল।

ওদের দেখে একজন বেরিয়ে এলেন। পরনে সাদা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা, ঊর্ধ্বাঙ্গে ফতুয়া। লম্বা দাড়ি প্রায় বুক ছুঁয়েছে।

"হরে কৃষ্ণ। কী চাই আপনাদের?" দুই হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে বুকে ঠেকিয়ে তিনি স্মিতমুখে জিজ্ঞেস করলেন।

রুদ্রও হাতজোড় করল, "নমস্কার। আপনার পরিচয়?"

"আমি ভর্তৃহরি মহারাজ। এই আশ্রমের দেখাশোনা করি। বলুন মা, কী প্রয়োজন?"

"আমি রুদ্রাণী সিংহরায়, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি। একটা খুনের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার ছিল। এই আশ্রমের প্রধান কে?"

"খুন?" ভর্তৃহরি মহারাজের ভ্রূ দুটো কিছুটা ওপরে উঠেই আবার ঠিক হয়ে গেল, "প্রধান হলেন শ্রী বিষ্ণুপদ মহারাজ। কিন্তু তিনি তো নেই, হিমালয়ে তীর্থে গিয়েছেন। তার পরিবর্তে আপাতত আমিই সব দেখাশোনা করছি। আপনি আমাকে বলতে পারেন। আসুন। ভেতরে আসুন।"

ছবিটা দেখে ভর্তৃহরি মহারাজ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "হ্যাঁ, এটা আমাদের আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গোপালমহারাজের জন্মবার্ষিকীতে তোলা। স্বপন সরকার আমাদের আশ্রমের নিয়মিত অনুগামী ছিলেন।"

"আর পাশের ভদ্রলোক?"

ভর্তৃহরি কিছুক্ষণ মনে করার চেষ্টা করে বললেন, "সম্ভবত ওঁকে স্বপন সরকারের কথায় আমরা আমন্ত্রণ করে এনেছিলাম। ওঁর একটি বড় অঙ্কের টাকা আমাদের তহবিলে দান করার কথা ছিল। কিন্তু তারপর উনি আর আসেননি।"

"আচ্ছা," রুদ্র ঝুঁকে পড়ল, "এই যে ছেলেটি স্বপন সরকারকে কিছু বলছে, এ তো মনে হচ্ছে আপনাদের আশ্রমের কেউ, কারণ বুকে ব্যাজ রয়েছে।"

"নানা।" ভর্তৃহরি মহারাজ দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন, "আমাদের আশ্রমে এমন কেউ নেই মা। উনি স্বপন সরকার মহাশয়ের সঙ্গেই আসতেন। সম্ভবত সহকারী। আমাদের আশ্রমে মূলত আট থেকে চোদ্দো বছরের অনাথ বালকদের শিক্ষা ও ভরণপোষণের ভার নেওয়া হয়। এখানে আমি ছাড়া আমারই বয়সি চারজন মহারাজ আছেন।"

রুদ্রর মুখটা নিভে গেল। অনেক আশা করে ও এসেছিল। ভেবেছিল, গোবিন্দকে এবার ঠিক খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু এখন দেখছে গোবিন্দর সঙ্গে এই আশ্রমের কোনো সম্পর্কই নেই। স্বপন সরকারের সঙ্গে ও এসেছিল, এই যা।

হতাশ চোখে ও চারদিকে তাকাল। এটা একটা সাধারণ উপাসনাকক্ষ। মাটিতে নরম শতরঞ্জি পাতা। চারপাশের দেওয়ালে ঠাসা বই। যতদূর দেখতে পাচ্ছে, বেশিরভাগই সাধনা ও অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কিত বই। এত বই থাকার জন্য গোটা ঘরে কেমন একটা পুরোনো খবরের কাগজের মতো গন্ধ।

চারপাশ বড় শান্ত, নিঝুম।

সামনের বেদিতে একটি সাদাকালো পুরোনো ফটোফ্রেম। ছবিতে একজন বৃদ্ধ সাধক বসে আছেন ধ্যানের ভঙ্গিতে। একটি মেঝের চাতালে। পেছনে জানলা। জানলার ওপাশে গাছ ডালপালা মেলেছে।

ছবির সামনে জ্বলছে ধূপ।

গোটা আশ্রমে বিরাজ করছে কী অদ্ভুত শান্তি। বাইরের চাতাল দিয়ে মাঝে মাঝে নতমস্তকে হেঁটে যাচ্ছে কিছু কিশোর। তাদের এদিকে কোনো কৌতূহলই নেই।

"ইনি কে?" প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে রুদ্র ছবির দিকে নির্দেশ করল।

ভর্তৃহরি মহারাজ কপালে দু-হাত তুলে নমস্কার করলেন, "আমাদের পরম পূজনীয় গুরুদেব। শ্রী শ্রী গোপালকৃষ্ণ মহারাজ। উনিই এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন।"

রুদ্র চোখ সরু করে দেখছিল। ছবিটির নীচে লেখা রয়েছে :

শ্রী শ্রী গোপালকৃষ্ণ মহারাজ

আবির্ভাব : গোকুলাষ্টমী তিথি, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

১৩২৭ বঙ্গাব্দ মানে ... রুদ্র মনে মনে হিসেব করল। প্রায় একশো বছর আগের কথা।

"ইনি কি এখনো জীবিত?"

"জীবিত শব্দের অর্থ যদি এই নশ্বর তুচ্ছ দেহধারণকে বলেন, তবে আপনার প্রশ্নের উত্তর হবে 'না'। কিন্তু আমাদের কাছে আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার মৃত্যু নেই। তাই দৈহিক তিরোভাব হলেও আমাদের কাছে তিনি জীবিত। তাই তিরোধানের তারিখ লেখা নেই। আমরা কারুরই তিরোধানে বিশ্বাস করি না, তাই সেই তিথি পালনও করিনা।" ভর্তৃহরি মহারাজ চোখ বন্ধ করে হাসিমুখে একটানা বলে গেলেন।

রুদ্র হাতজোড় করে প্রণাম করল। দেখাদেখি বীরেন শিকদারও।

"অনেক ধন্যবাদ মহারাজ।" রুদ্র উঠে দাঁড়াল, "আপনি হয়তো জানেন না, স্বপন সরকার ও তাঁর পরিচিত এই হৃষীকেশ জয়সোয়াল দুজনেই খুন হয়েছেন।"

"অ্যাঁ!" ভর্তৃহরি মহারাজ মুহূর্তে বিস্মিত, "সেকি!"

"হ্যাঁ। আমরা সেই হত্যার তদন্ত করছি। এই ছেলেটি যদি আশ্রমে আসে, অবশ্যই আমাদের জানাবেন। এই আমার কার্ড। এতে নম্বর লেখা রয়েছে।" রুদ্র বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

"নিশ্চয়ই। হরে কৃষ্ণ। পরমগুরু আপনাদের মঙ্গল করুন।"

রুদ্র কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। সত্যি, ওরা সাধারণ মানুষরা নিজেদের সুখ দুঃখ নিয়েই মগ্ন, চাওয়া-পাওয়ার হিসেবনিকেশে ব্যস্ত। অথচ এই সন্ন্যাসীরা কেমন নিঃস্বার্থভাবে প্রচারের অন্তরালে সমাজের কল্যাণ করে চলেছেন। রুদ্রর মাথা শ্রদ্ধায় নুয়ে এল।

আবারও করজোড়ে নমস্কার করে ও বেরিয়ে এল।

১৭

"যদা যদা হি ধর্মস্য

গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য

তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

পরিত্রাণায় সাধুনাং

বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।।

ধর্মসংস্থাপনার্থায়

সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্লোকপাঠ শেষ করে মৃদু হাসলেন, "শ্রীমদ্ভগবদগীতা। চতুর্থ অধ্যায়। সপ্তম ও অষ্টম শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলছেন অর্জুনকে।"

উইলিয়াম জোন্স বাইরের চাতালের একপাশে হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন। ভ্রূ কিছুটা কুঞ্চিত করে তিনি বললেন, "এখানে ভারত অর্থে কি ভারতবর্ষ, পণ্ডিত?"

"না। অর্জুন ভরতবংশীয়, তাই তাঁকেই ভারত বলে সম্বোধন করেছেন শ্রীকৃষ্ণ।"

"গোটা শ্লোকটির অর্থ, পণ্ডিত?"

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বললেন, "অর্থাৎ, ধর্ম যখনই গ্লানিযুক্ত হয়, অধর্মের যখন অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহধারণ করি। দুষ্কৃতিদের বিনাশ করে সাধুদের রক্ষা করার জন্য এবং অধর্মকে উচ্ছেদ করে আবার ধর্মকে সংস্থাপন করতে আমি যুগে যুগে মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হই।"

জোন্স হেসে ফেললেন। ভাঙা বাংলায় বললেন, "কিন্তু ইহা তো আমাদের আইনের উলটোপথে হাঁটে, পণ্ডিত!"

"কেন?"

"এই শ্লোক মানতে হলে কোনো দুষ্ট লোককে যদি হত্যা করা হয়, তবে হত্যাকারীকে কোনো শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।" উইলিয়াম জোন্স স্মিতমুখে বললেন, "তা তো হয়না। আমাদের কোম্পানি কোনো বাছবিচার করে না, পণ্ডিত। কোনো লোক যদি খুব খারাপ কাউকে হত্যা করে, তবুও তার শাস্তি হইবে। কারণ, আইন নিজের হস্তে কেউ লইতে পারেনা। শাস্তি দেবে আদালত, মানুষ নিজে নয়। তাই তুমি ইহা তোমার বইতে লিখো না।"

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হাসলেন। দীর্ঘ ব্রহ্মশিখা দুলিয়ে বললেন, "তুমি এতদিন আমার কাছে পড়ে সাধুচলিত মেশানো ভয়ঙ্কর গুরুচণ্ডালী দোষসমৃদ্ধ বাংলা বলতে শিখেছ, সাহেব। সংস্কৃতভাষার আক্ষরিক অর্থও উদ্ধার করতে শিখেছ। কিন্তু অন্তর্নিহিত মর্মার্থ উদ্ধার করার বিদ্যা এখনো আয়ত্ত করতে পারোনি। এই শ্লোক কোনো সাধারণ মানুষ বলছেন না। বলছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুনকে। হিন্দুশাস্ত্রমতে যে চারটি যুগ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই প্রতিটি যুগের একেবারে অন্তে এসে অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি। অশুভশক্তিকে পরাস্ত করে পুনরায় শুভশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই মর্ত্যলোকে। অবতাররূপে। কখনো তিনি মৎস্য, কখনো তিনি কূর্ম, কখনো তিনি নৃসিংহ, আবার কখনো বামন অবতাররূপে। একমাত্র তাঁরই অধিকার, অশুভের বিনাশসাধন করা। সাধারণ মানুষের এই কর্ম নয়, সাহেব!"

"এবার বুঝিলাম।" জোন্স বললেন, "আচ্ছা, এই যে তোমাদের চারটি যুগ। এগুলোর ব্যাপ্তি কতদিনের?"

তর্কপঞ্চানন চিন্তা করে বললেন, "পুরাণ অনুযায়ী একেকটি যুগের সময়কাল তার আগের যুগের চেয়ে এক গুণ কম। যেমন সত্যযুগ ছিল ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বছর ধরে। বর্তমান কলিযুগের প্রায় চারগুণ। ত্রেতাযুগ ছিল কলি যুগের তিন গুণ, ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বছর ধরে। দ্বাপর যুগ কলিযুগের মাত্র দ্বিগুণ ছিল, তার সময়কাল ছিল ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বছর। কলিযুগের একেবারে অন্তে আবির্ভূত হবেন দশম অবতার কল্কি। তিনিই বিনাশ করবেন সবকিছু।"
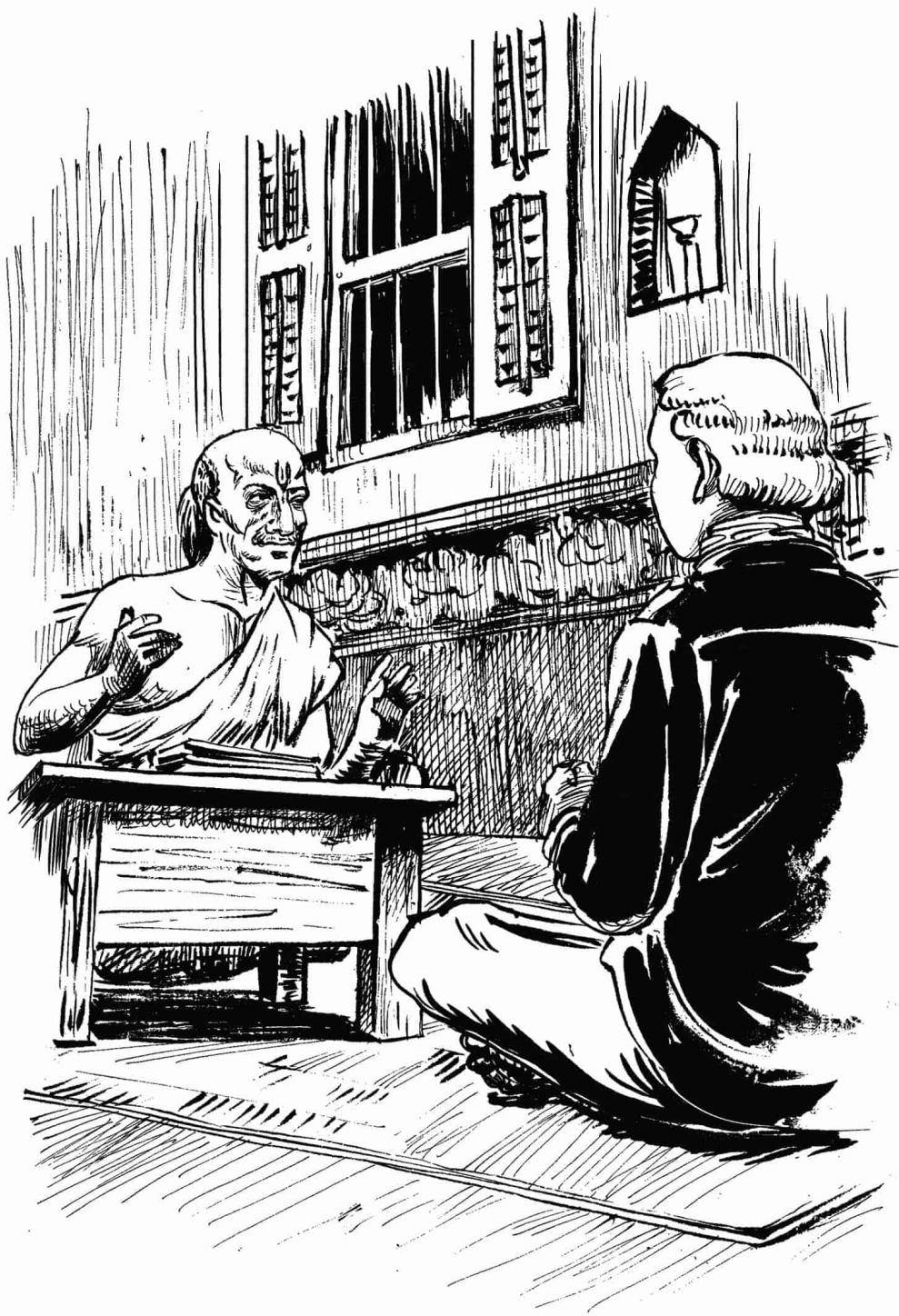
"কলিকাল কতদিনের?"

"দ্বাপরের ঠিক অর্ধেক। অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছর।" তর্কপঞ্চানন বললেন।

"তো সেই কলিকালের কতদিন ইতিমধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে, পণ্ডিত?" জোন্স ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হাসলেন, "কলিযুগের শেষ প্রায় আসন্ন, সাহেব!"

"সেকী! তবে আমাদের এত পরিশ্রম?" উইলিয়াম জোন্স ভীত হওয়ার ভান করে বললেন, "সবকিছুরই যদি বিনাশ ঘটে যায়, কী হবে দেশীয় লোকেদের জন্য আইনের বই লিখে? তুমিই বা তোমার 'দশানন বধ' করে কী করবে?"

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হাসলেন। বললেন, 'দশানন বধ' আমার মনের তাগিদ। দশানন অর্থে রাবণ। তাঁর দশটি মুখ হলেও আমার লক্ষ্য আটটি অসুরবধ। চারপাশে প্রচুর স্মার্ত পণ্ডিত। তাঁরা আদি বেদকে না মেনে নিজেদের মতো করে অপভ্রংশে ভরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের শাস্ত্রকে। প্রতি কৃষ্ণপক্ষে আমি যে এই দশাননবধের সংকল্প নিয়েছি, এতে একে একে আটটি সভায় এই জাতীয় পণ্ডিতদের আমি তর্কযুদ্ধে পরাজিত করব। এতে সাধারণ মানুষের কাছেও সত্যটা ছড়িয়ে পড়বে। সাতটি ইতিমধ্যেই সমাপ্ত করেছি।"

"তোমার এই সংকল্পের মধ্যেই যদি কল্কি অবতার চলিয়া আসেন?" জোন্স কৃত্রিম ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুললেন মুখের অভিব্যক্তিতে।

জগন্নাথ সহাস্যে বললেন, "মহাজাগতিক হিসেব অনেক প্রসারিত, সাহেব। আমাদের একসহস্র সৌরবর্ষ হয়তো প্রজাপতি ব্রহ্মার এক নিশ্বাসের সমতুল। কাজেই অত দুশ্চিন্তা কোর না।"

জগন্নাথ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রঙ্গালাপে ছেদ পড়ল।

চাতালে এসে উপস্থিত হয়েছে চতুষ্পাঠীর এক উঁচু শ্রেণীর ছাত্র। নীরবে এসে গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল সে।

"জয়তু।" তর্কপঞ্চানন আশীর্বাদ করলেন, "নদীয়া থেকে কখন এলে, কৃষ্ণদাস?"

"কয়েক দণ্ড পূর্বে, গুরুদেব।"

"উত্তম। যাও, গিয়ে বিশ্রাম নাও। আহারাদি হয়েছে?"

কৃষ্ণদাস মাথা হেলাল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সুবিশাল চতুষ্পাঠীর সে আবাসিক ছাত্র। এখানে প্রায় আটশো ছাত্র থেকে পড়াশুনো করে। সব মিলিয়ে একখানা বৃহৎপল্লি প্রায়।

সে কিছু সংকোচে বলল, "অভয় দিলে একখানা কথা জানাই, গুরুদেব।"

"কী, বলো?"

"শুনে এলাম, নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র এক বিশাল বাজপেয় যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সমগ্র বঙ্গের খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গ তো বটেই, সুদূর কাশী, মিথিলা, কান্যকুব্জ এমনকি দ্রাবিড় থেকেও বিখ্যাত পণ্ডিতরা নিমন্ত্রিত হয়েছেন সেই যজ্ঞে।"*

"বেশ।" তর্কপঞ্চানন বললেন, "তো?"

কৃষ্ণদাস কিছুক্ষণ মৌন থেকে উষ্মাভরা কণ্ঠে বলল, "আপনি ত্রিবেণীর সূর্য, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। আপনাকে নিমন্ত্রণ না করাটা কি ভয়ংকর অপমান হল না, গুরুদেব?"

তর্কপঞ্চানন মৃদু হাসলেন। তারপর উইলিয়াম জোন্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, ”কী বুঝছ, সাহেব?”

উইলিয়াম জোন্স বললেন, ”রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর দেখি তোমার ওপর রাগ কিছুতেই যাইতেছে না। তুমি গত একবছরে বড় বড় সব পণ্ডিতকে পরাস্ত করেছ বাকযুদ্ধে। তারপরেও তোমাকে এমন গুরুত্ব না দেওয়ার কারণ কী, পণ্ডিত?”

তর্কপঞ্চানন বললেন, ”ক্রোধ বিষয়টি এক্ষেত্রে একমুখী নয়, সাহেব, দ্বিমুখী।”

”অর্থাৎ শুধু রাজার তোমার প্রতি নয়, তোমারও রাজার প্রতি রাগ। কিন্তু কেন?”

”কারণ অতি জটিল, সাহেব। বলতে গেলে আজকের সন্ধ্যা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তোমার অধ্যয়ন হবে না।”

”রোজই তো অধ্যয়ন করছি পণ্ডিত। কিন্তু আজ যে বড় জানতে ইচ্ছা যাচ্ছে, কী কারণে আপনার প্রতি তিনি এত অসন্তুষ্ট। যেখানে তাঁর বিদ্যোৎসাহের কথা সর্বজনবিদিত। অগণিত পণ্ডিতকে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকেন। সেখানে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের প্রতি তাঁর এই রোষ কেন?”

তর্কপঞ্চানন তিক্তস্বরে বললেন, ”তোমরা সাহেবরা তো এই প্রশ্ন করবেই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে তোমাদের বড় সুহৃদ মনে করেন। কিন্তু নবকৃষ্ণ মুন্সী আর ওই কৃষ্ণচন্দ্র রায় যতই তোমাদের পা চাটুক, আমার চোখে তারা বিশ্বাসঘাতক। প্রবঞ্চক।”

”বিশ্বাসঘাতক?” উইলিয়াম জোন্স শব্দটির মর্মার্থ কিছু সময় নিয়ে উদ্ধার করলেন এবং হতবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু এ'কথা তোমার কেন মনে হচ্ছে পণ্ডিত?”

---

* নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুবর্ষ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলেন ১৭৮২, কেউ ১৭৮৩। উইলিয়াম জোন্স কলকাতায় আসেন ১৭৮৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে তাঁর দিনের পর দিন নানা বিষয়ে আলোচনা চললেও তাতে ‘জীবিত’ কৃষ্ণচন্দ্র না আসাটাই তাই স্বাভাবিক। উপন্যাসের স্বার্থে তাই এখানে লেখকের সজ্ঞান Anacronism অধিকার প্রয়োগ করে তর্কপঞ্চানন—জোন্স প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রকে বর্তমান রাখা হল।। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও উইলিয়াম জোন্স সম্পর্কিত বাকি ঘটনাবলি অবশ্যই ইতিহাস আধারিত।

১৮

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অনেকক্ষণ মৌন রইলেন। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে প্রায়। চতুষ্পাঠী সংলগ্ন তাঁর বসতবাটী থেকে সন্ধ্যাবেলার শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তাঁকে এবার উঠতে হবে।

"বলো না পণ্ডিত! আজ যে বড় জানতে ইচ্ছে করছে, তোমাদের দুজনের এই শীতলযুদ্ধের কারণ কী!" উইলিয়াম জোন্স অনুনয় করলেন। তাঁরও দেরি হয়ে যাচ্ছে। গার্ডেনরিচের বাড়িতে একাকী রয়েছেন স্ত্রী অ্যানা মারিয়া শিপলি। আগামীকাল প্রত্যুষের মধ্যে পৌঁছতেই হবে।

জোন্স যখন আটত্রিশ বছরের তরুণ, বিবাহের মাত্র কুড়িদিনের মধ্যে নবপরিণীতা অ্যানাকে নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে চেপে বসেছিলেন ভারতগামী জাহাজে। প্রাচ্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আশৈশব, অ্যানা হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন স্বামীর এই ইচ্ছাকে।

তারপর থেকে জোন্স ক্রমশই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির দায়িত্ব সামলে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন বেদ, সংস্কৃতশিক্ষায়। উপলব্ধি করেছেন, ভারতবর্ষকে চিনতে গেলে জানতেই হবে আদিভাষা। তাই তো তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে ঘুরে বেড়ান কখনো নদীয়া, কখনো ত্রিবেণী, কখনো মুর্শিদাবাদে। পেতে চান তর্কপঞ্চাননের মতো পণ্ডিতদের সাহচর্য। ওদিকে অ্যানা এই বিদেশবিভুঁইয়ে ক্রমশই বোধ হয় আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন।

"এইসব বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হবে সাহেব।" তর্কপঞ্চানন চোখ বন্ধ করলেন, "তা তোমার ভালো নাও লাগতে পারে। তোমরা ভাবো আমি পণ্ডিত মানুষ, লেখাপড়া নিয়ে থাকি, দেশের খবর রাখিনা। জগন্নাথ পণ্ডিতকে তোমরা অন্ধ পাওনি সাহেব। প্রথমে বর্গীরা এসে দেশটা ছারখার করল, এখন ফিরিঙ্গিরা। আলিবর্দি খাঁ'র নাতি সিরাজকে তোমরা যেভাবে অন্যায়ভাবে সিংহাসন থেকে সরালে, তা তোমাদের উপযুক্ত আচরণ নয়। সিরাজ ছোকরার চরিত্রের দোষ যতই থাক, সে কিন্তু এতগুলো পাকা মাথার ষড়যন্ত্রেও মাথা না নুইয়ে শেষ অবধি লড়ে প্রাণ দিয়েছে। নবকৃষ্ণ মুন্সী আর কৃষ্ণচন্দ্র রায় ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিয়ে দল ভাঙিয়ে সিরাজকে হারানোটা যতই 'হিন্দুর জয়' বলে গৌরবান্বিত করুক, দেশ কিন্তু বিদেশিদের হাতে গেল ওদের জন্যই। তবে হ্যাঁ, ওদের ওই বিশ্বাসঘাতকতার উপহারমূল্য তোমাদের ক্লাইভ দিয়েছে। মীর জাফর, রামচাঁদ রায়ের সঙ্গে মিলে সিরাজের কোষাগার লুঠ করে নবকৃষ্ণ এখন রাতারাতি রাজার ধন পেয়ে গিয়েছে। আর কৃষ্ণচন্দ্র তো আরও ফুলেফেঁপে উঠেছে।"

"মিরজাফরকে সরিয়ে তারপর তো নবাব হয়েছিল তাঁর জামাতা মিরকাশিম।"

"সরিয়ে বলো না।" তর্কপঞ্চানন তিক্তমুখে বললেন, "বলো সরানো হয়েছিল। তোমাদের ক্লাইভের খিদে আর কত মেটাত মিরজাফর? কোষাগার তলানিতে, এদিকে ক্লাইভের হুকুম, প্রজাদের মেরেধরে যাহোক করে খাজনা দিতেই হবে। এত দিয়েও মিরজাফর খিদে মেটাতে পারল না, মসনদে তাই বসানো হল মিরকাশিমকে। মীর কাশিম যদিও শ্বশুরের মতো অমেরুদণ্ডী প্রবঞ্চক ছিল না, কিন্তু সে তো ছিল পরিস্থিতির শিকার,

ফিরিঙ্গিদের ক্রীড়নক মাত্র। তার হাতে ক্ষমতা কিছুই ছিলনা, এদিকে খাজনা আদায়ের পাহাড়প্রমাণ চাপ। কী-বা করত সে!"

উইলিয়াম জোন্স অনেকক্ষণ নির্বাক রইলেন। তারপর বললেন, "আমাদের ওপর তোমার এত রাগ, পণ্ডিত? আগে তো কখনো বুঝিনি!"

"আগে তো কখনো এ'সব নিয়ে কথা বলোনি সাহেব!" তর্কপঞ্চানন হাসলেন, "লেখাপড়ার দিকে তুমি অবশ্যই আমার বন্ধু। আছে এবং থাকবেও। কিন্তু তাই বলে সত্যটা মিথ্যা হয়ে যায়না। নদীয়াধীশ্বরের ওপর আমার আরও একটি কারণে রাগ। তুমি ঢাকার রাজবল্লভ সেনের নাম শুনেছ তো? প্রথমে মুর্শিদাবাদের জগত শেঠদের কর্মচারী হয়ে জীবন শুরু করলেও লোকে তাঁকে রাজা বলেই চিনত ও মানত।"

"শুনেছি। কিন্তু তিনিও তো শুনেছিলাম সিরাজকে তাড়াতে ষড়যন্ত্র করেছিলেন।"

"ভুল কিছু শোননি। সে আমার কোনো প্রিয়পাত্রও ছিল না। কিন্তু এই ঘটনাটি ভিন্ন। বেশ কয়েকবছর আগের কথা। রাজবল্লভের কন্যা মাত্র আটবছর বয়সে বিধবা হয়েছিল। কন্যার অকালদুর্দশায় শোকে কাতর হয়ে সে ঠিক করল কন্যার বিধবা বিবাহ দেবে। তাঁর রাজ্যের সব পণ্ডিতদের বিধান জানতে চাইল। তা তাঁরা তো ভয়েই অস্থির। কেউ ঠিক করে কিছু বলতে পারল না। অবশেষে সে লোক পাঠিয়েছিল আমার কাছে।"

"বিধবা বিবাহ! হিন্দু নারীদের! সে তো কল্পনার বাইরে! পণ্ডিত, তুমি নিশ্চয়ই অমত করলে?"

তর্কপঞ্চানন খরচোখে তাকালেন, "অমত করতে যাব কেন সাহেব? তোমাকে যে দিনরাত অবসরে সংহিতা ও উপনিষদগুলো পড়তে বলছি, তা একেবারেই অগ্রাহ্য করছ?"

উইলিয়াম জোন্স অপ্রতিভ হলেন। বললেন, "পড়ছি তো। বেদের চারটি ভাগ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষদ। জানি তো!"

"তো জানো যখন, পরাশর সংহিতার সেই শ্লোকটা কি আমি তোমাকে বলিনি?" তর্কপঞ্চানন আদর্শ শিক্ষকের ভঙ্গিতে তিরস্কার করে উঠলেন।

"কোন শ্লোক?"

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে, ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।" তর্কপঞ্চানন বললেন, "পতি নিখোঁজ হলে বা তাঁর মৃত্যু হলে, নপুংসক বা পতিত হলে স্ত্রী আবার বিবাহ করতে পারে।"

"সেকি!" উইলিয়াম জোন্স চমকে উঠলেন, "পরাশর সংহিতায় রয়েছে এই শ্লোক?"

"হ্যাঁ। পরাশর মুনি স্বয়ং নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। আমি বলার কে! আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্মতি রাজবল্লভের দূতকে জানিয়ে দিলাম। জগন্নাথ পণ্ডিতের নিদান বলে কথা, কাশী থেকে বৃন্দাবন, কনৌজ থেকে বাংলা, দেশের সব পণ্ডিত অমনি বলতে শুরু করল, ঠিক ঠিক! আমরাও রাজি!"

"তারপর?"

"বিবাহের আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ, সেইসময় রুখে দাঁড়ালেন নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র। তোমরা ওঁকে যতই বিদ্যানুরাগী হিসেবে চেনো, ওঁর মতো রক্ষণশীল, ধর্মের অনুশাসনের নামে অন্ধ শাসক খুব কম রয়েছে। তিনি তাঁর নবদ্বীপের সব পণ্ডিতকে এককাট্টা করলেন। বললেন, এই বিবাহ ভয়ঙ্কর পাপের সমতুল্য। রাজবল্লভ তার দূতকে দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে

বলে পাঠাল, পরাশর সংহিতা অনুযায়ী এই বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ। তখন কৃষ্ণচন্দ্র কী করলেন জানো?"

"কী?"

"দূতকে দিয়ে তিনি নানা সৌজন্যমূলক উপহারের সঙ্গে পাঠালেন একটি গো শাবক। বললেন, বিধবাবিবাহের পর যেন রাজবল্লভ সেই গো শাবকটির মাংস ভক্ষণ করেন। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হলেও তা নাকি লোকাচারবিরুদ্ধ, দেশাচারের পরিপন্থী, তাই তা মহা পাপ।"

"তারপর?"

"রাজবল্লভ এমনিতে মহা সাহসী হলেও এইসব বিষয়ে ছিল ভীষণ ভিতু।" তর্কপঞ্চানন তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "গোটা নবদ্বীপের চক্ষুশূল হতে সে চাইল না। বিবাহের আয়োজন বন্ধ হয়ে গেল।"

উইলিয়াম জোন্স অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বললেন, "সত্যি পণ্ডিত! তোমার এক নতুন রূপ আজ আমি দেখতে পাচ্ছি। হিন্দু পণ্ডিত হয়েও তুমি যে এত যুক্তিবাদী, এত মুক্তমনা, আমি জানতাম না।"

"মন তো মুক্ত রাখতেই হবে সাহেব!" তর্কপঞ্চানন বললেন, "মন বন্ধ রাখলে আমি শিক্ষা আহরণ করব কী করে?"

"ঠিকই।" উইলিয়াম জোন্স বললেন, "তবে আমার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর এখনো পেলাম না। তুমি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি অপ্রসন্ন তা তো বুঝলাম। কিন্তু তিনি তোমার ওপর এত কুপিত কেন?"

তর্কপঞ্চানন বললেন, "ওহ! সে আবার অন্য এক প্রসঙ্গ। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সভাকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে একবার বলেছিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন ভাবের কবিতা রচনা করতে পারলে একশো বিঘা নিষ্কর ভূমি ও একশো রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার দেবেন। কিন্তু বাণেশ্বর যাই রচনা করতে যান, তারই প্রতিচ্ছবি ইতিহাস বা পুরাণে পান। অবশেষে অন্তিম দিনে তিনি একটি কবিতা রাজদরবারে পাঠ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন অন্যান্য সমস্ত পণ্ডিতকে বাণেশ্বরের কবিতার অনুরূপ কোনো ভাব ইতিমধ্যেই আছে কিনা, তা সন্ধান করতে বলেন। পুরস্কারের লোভে একমাস ধরে অত্যুৎসাহে পণ্ডিতরা প্রচুর অনুসন্ধান করলেও বাণেশ্বরের সঙ্গে পুরোনো কোনো কাব্যের মিল পেলেন না।"

"তারপর?"

তর্কপঞ্চানন বলতে যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণদাস সোৎসাহে বলল, "আমি বলব, গুরুদেব?"

গুরুর গর্বে গর্বিত শিষ্যের উৎসাহ তর্কপঞ্চানন স্তিমিত করতে চাইলেন না। বললেন, "বেশ। বলো।"

কৃষ্ণদাস বলতে লাগল, "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন কবি বাণেশ্বরকে পুরস্কৃত করতে যাবেন, ঠিক তখনই বিশেষ কাজে আমাদের পূজনীয় গুরুদেব কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে উপস্থিত হলেন। রাজা তখন গুরুদেবকে অনুরোধ করলেন, কবিতাটি একবার শুনতে। গুরুদেব শোনামাত্র স্মিতহাস্যে বললেন, এই কবিতার অনুরূপ সংস্কৃতে না থাকলেও তুলসীদাসের একটি দোঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়।

জগ্মে তোম যব আয়া, সব হাঁসা, তোম্ রোয়।

এয়সা কাম করো পিছে হাঁসি না হোয়।।

গুরুদেব দোঁহা আবৃত্তি শেষ করলে বাণেশ্বর লজ্জিতমুখে নিজের দোষ স্বীকার করলেন। তিনি সম্ভবত কল্পনাও করতে পারেননি, সংস্কৃত বা প্রাকৃত কাব্য ছেড়ে কেউ দোঁহাতেও খোঁজ করতে পারেন।"

"গ্রেট পণ্ডিত!" উইলিয়াম জোন্স বললেন, "অসাধারণ তোমার স্মরণশক্তি। যত শুনি, যত দেখি, ততই অবাক হইয়া যাই। কিন্তু এতে রাজা তোমার ওপর রেগে গেলেন কেন?"

"বলছি।" তর্কপঞ্চানন বললেন, "নদীয়াধিপতি তখন খুশি হয়ে আমায় তাঁর রাজ্যে বসতি স্থাপনে আহ্বান করেন। কিন্তু আমি বলি, বর্ধমানরাজ ও আঞ্চলিক শূদ্রমণি জমিদারদের কৃপায় আমি ত্রিবেণীতেই ভালো আছি, আমি কোথাও যাব না।"

"সেকি! বর্ধমানের রাজা তো শুনেছি কৃষ্ণচন্দ্রের পরম শত্রু!"

"ঠিকই শুনেছ। আমি বর্ধমানরাজের প্রশংসা করায় তিনি কুপিত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী, কাব্যানুরাগী, মহান দাতা ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে অতি অহংকারী ও দাম্ভিক। এরপর থেকেই তিনি নানা উপায়ে আমাকে হেনস্থা করতে শুরু করেন, কিন্তু প্রতিবারই নিজেই অপমানিত হন।"

"যেমন?"

"একবার তিনি আমাকে বললেন, আপনি তো বহুল শাস্ত্রদর্শী, বলুন তো, কার প্রতারণায় উন্মার্গগামী মূর্খেরা দু-হাত তুলে ভ্রমণ করে?

আমি জানতাম, রাজা শক্তির উপাসক। শ্রীচৈতন্যের ঘোর বিরোধী। বৈষ্ণবদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেননা। আমি হেসে বললাম, আজ বিশ্বাস হল, শ্রীচৈতন্যদেব প্রকৃতই অবতার ছিলেন।

রাজা বললেন, কীভাবে?

আমি বললাম, "ভগবান বিষ্ণুর প্রত্যেক অবতারকালেই অসুরসম এক দুরন্ত রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেমন, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বলি, রাবণ, কংস। আমাদের শ্রীচৈতন্য অবতারের প্রায় সমসাময়িক অসুর রাজাটিকে আজ চাক্ষুষ করলুম।

ভরা রাজসভায় এই অপমানে কৃষ্ণচন্দ্র আরও রেগে গেলেন। এরপরও নানা ছোটখাটো শাস্ত্রানুসারী আচারবিচারে প্রথমে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেও পরে অজ্ঞতার কারণে পরাস্ত হয়েছেন। এইজন্যই তিনি আমার ওপর সন্তুষ্ট নন।"

অনেকক্ষণ বলার পর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন থামলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, "তবে হ্যাঁ। নিমন্ত্রিত হই না হই, ওই বাজপেয় যজ্ঞে আমি আমার ছাত্রসহযোগে উপস্থিত হব।"

"সেকী? বিনা নিমন্ত্রণে?"

"উপায় নেই, সাহেব।" জগন্নাথ স্বভাবসিদ্ধভঙ্গিতে মৃদু হাসলেন, "আমি না গেলে ওই মিথিলা, কান্যকুব্জের পণ্ডিতরা যে বঙ্গের পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে ধরাশায়ী করে চলে যাবেন। সে যে বড় লজ্জার বিষয় হবে, সাহেব! তাঁরাও ভাববেন, জগন্নাথ পণ্ডিত বুঝি তর্কের ভয়ে আসেননি। কৃষ্ণদাস, তুমি আমার সহকারীকে প্রেরণ করো, দ্রুত নদীয়া যাত্রার

আয়োজন করতে হবে। আমার দশানন বধের অন্তিম পর্বে বধিত হবেন স্বয়ং এই যুগের রাজা হিরণ্যকশিপু।"

গুরুদেব ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, "এ'সব কী হচ্ছে কৃষ্ণকান্ত, বংশীধর, গোপাল? সমাজের এতবছরের ইতিহাসে খুব কম জনই এভাবে বিনা অনুমতিতে বাইরে বেরোতে পেরেছে। আর যারা পেরেছে, তারা কেউ বেশিদিন বেঁচে থাকেনি। আর সেখানে এতগুলো মাস কেটে গেল, থাকো গোপালের বৌ-মেয়ের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না?"

কৃষ্ণকান্ত লাহিড়ী ও গোপাল ব্যানার্জি নির্বাক হয়ে হুঁকা টানছেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র বংশীধর, গোবর্ধন ও মধুসূদন নতমস্তকে বসে রয়েছেন অদূরে। প্রতি বুধবারের মতো আজও গোধূলিলগ্নে গুরুদেবের বাসকুটিরের অদূরে উপাসনামন্দিরে চলছে আলোচনা। অতি গোপন এই আলোচনাসভা, তাই বাইরে দণ্ডায়মান দুই অতন্দ্র প্রহরী।

উপাসনামন্দিরের পাশ দিয়েই শুরু হয়েছে বিস্তৃত অরণ্য। সেদিক এতই ঘন, যে বাইরের আলোও তেমন ঢোকেনা। অল্প আলোয় সবার মুখই কেমন ছমছমে লাগছে।

বংশীধর অনুদাত্ত স্বরে বললেন, "সন্ধান পাওয়া গিয়েছে গুরুদেব। কিছুটা আকস্মিকভাবেই। যে নারী হরিসাধনের সন্ধানে আশ্রমে গিয়েছিলেন, তাঁর গৃহেই রয়েছে মা-মেয়ে।"

"হরিসাধনের সন্ধানে বলতে?"

"কনেনগরের স্বপন সরকারের বিষয়টি যে সামলেছিল, সেই হরিসাধন। তার একটা যান্ত্রিক ছবি নিয়ে ওই নারী গিয়েছিলেন সরলাশ্রমে।"

"তো? একজন ব্যক্তি বিশেষত এক তুচ্ছ নারীর কাছ থেকে কেড়ে আনতে এত ভয়?" গুরুদেব তিরস্কারের সুরে বললেন, "তবে তো যে যুদ্ধের আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি, তাতে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখাটাই বাতুলতা।"

"আমাদের ছেলেরা চেষ্টা করছে গুরুদেব। বেশিদিন লাগবে না।" গোপাল ব্যানার্জি হুঁকা নামিয়ে বললেন, "এই সামান্য বিষয় নিয়ে মনে হয় এত উতলা না হওয়াই ভালো। মা ও কন্যা দুজনেই অতি নিরীহ। জানাজানি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই গুরুদেব। এখন এমনিতেই অতি অনুসন্ধানে অন্য আশঙ্কা রয়েছে। বংশীধর, মধুসূদন বা গোবর্ধন, ওরা প্রত্যেকেই গিয়েছে। ধরা পড়ে যেতে পারে।"

"আচ্ছা, মা-মেয়ের বিষয়টা আমি দেখছি।" গুরুদেব অন্যদিকে মুখ ঘোরালেন, "ওদিকের কী অবস্থা, মধুসূদন?"

মধুসূদন বললেন, "সব কুশল গুরুদেব। ভর্তৃহরি অতি কৌশলে গোটা বিষয়টি সামলাচ্ছে। প্রতিটি সপ্তাহে দশজন করে গোপনে চলে যাচ্ছে ওখানে। কিছুজন গোশালায় নিযুক্ত হচ্ছে। কিছুজন অন্যান্য কাজে।"

"হুম।" গুরুদেব বললেন, "বহুপ্রতীক্ষিত সেই মাহেন্দ্র মহোৎসবের আর বেশি বিলম্ব নেই। তার আগে সমস্ত কন্টক আমাদের উৎকীর্ণ করতেই হবে। আগে যে দু'বার ব্যর্থতা এসেছে, তার পুনরাবৃত্তি আর কিছুতেই হতে দেওয়া যাবেনা। বারবার তিনবার।"

গোবর্ধন বললেন, " গুরুদেব, যদি অভয় দেন তো একটি কথা বলি।"

"বলো গোবর্ধন।"

"যে অবাধ্য বালকটিকে আপনি কয়েকদিন আগে শাস্তি দিয়েছিলেন, তাকে কিন্তু পাওয়া যায়নি।"

"কী!" প্রচণ্ড বিস্ময়ে চমকে উঠলেন গুরুদেব, "পাওয়া যায়নি মানে? আমি তো বলেছিলাম পরের দিন প্রত্যুষেই যেন তাকে উদ্ধার করা হয়। অতি বুদ্ধিদীপ্ত হলেও সে জেদী। জেত কমানোর জন্য সারারাত্রি ব্যাপী ওই আতঙ্কই তার শাস্তি।"

"উদ্ধার করতে গিয়েছিল কৈবর্তরা।" গোবর্ধন আড়ষ্টভাবে বললেন, "কিন্তু জরা নদীর চরে তাকে পাওয়া যায়নি। ভয়ে এই কথা আপনাকে কালু বলতে সাহস পায়নি গুরুদেব!"

"একী সাংঘাতিক কথা। তোমরা কী জানো ওর ইতিহাস? ওর পিতার নাম ছিল দীনবন্ধু। সে ভয়ংকর অপরাধ করেছিল প্রায় দুইযুগ আগে। এক কৈবর্তকন্যাকে বিবাহ করেছিল সে। তখনও প্রথম গুরু জীবিত। সেইসময়ে সমাজের সবচেয়ে শ্রুতিধর ও মেধাবী ছাত্র ছিল দীনবন্ধু। অস্পৃশ্য বিবাহের মতো ঘোরতর অপরাধেও প্রথম গুরু ওকে তেমন শাস্তি দেননি। বিবাহের পর এক পুত্র জন্মায়। সেই পুত্র শূদ্রগর্ভে জন্মালেও ব্রাহ্মণপল্লিতেই বড় করার নিদান দেন তিনি।"

মধুসূদন অস্ফুটে বললেন, "মনে আছে। আর অচ্যুত নামের এই ছেলেটি দীনবন্ধুখুড়োর দ্বিতীয় পুত্র। দীনবন্ধু মারা যাওয়ার পর শ্মশানঘাট থেকে প্রথম পুত্রটি পালায়। সে আমার বাল্যবন্ধু ছিল। আর তাকেই আমি...।"

"নির্ভুল বলেছ, মধুসূদন!"

মধুসূদন বললেন, "মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে ও আমাকে কিন্তু শনাক্ত করতে পারছিল, জানেন গুরুদেব! বাল্যবন্ধুর সঙ্গে পরিণত বয়সের নতুন বন্ধুর অদ্ভুত সাদৃশ্য ওকে সন্দিগ্ধ করে তুলছিল। তাই মৃত্যুর সময়ে ও খুব একটা বিস্মিত বোধ হয় হয়নি। শুধু বলেছিল, তুমি এত রাতে এখানে?"

গুরুদেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বললেন, "তুমি কি নরম হয়ে পড়ছ, মধুসূদন?"

"না গুরুদেব!" সচকিত হয়ে উঠলেন মধুসূদন।

"হ্যাঁ, নরম না হওয়াই উচিত। এই বিষয়ে মনকে একেবারেই প্রশ্রয় দেবে না।" গুরুদেব বললেন, "প্রথম গুরুর নরম মনোভাবের অপব্যবহার করেছে অনেকে। তাই গত কয়েকমাসে আগে এই বিনাশ অভিযান চালিয়েছি আমি। সমস্ত কন্টক নির্মূল হলেই আমাদের মহা অভিযান শুরু করার মনোবল পাব আমরা। কিন্তু আগে এই ছেলেটির সন্ধান করো। ছেলেটির অবাধ্যতা তার রক্তেই রয়েছে।"

"হ্যাঁ গুরুদেব।" মধুসূদন বললেন।

"ওপারে গিয়েছে কিনা খোঁজ নিয়েছ?" গুরুদেব চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"না। আজই লোক পাঠাব।"

গুরুদেব উঠে দাঁড়ানো মাত্র দ্বারিকা মাথা নীচু করে বসে পড়ল।

ওর বুকের ভেতরটা টিপটিপ করছে। মনে হচ্ছে, উত্তেজনায় হৃদপিণ্ডটা মুখ দিয়ে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

অচ্যুতকে পাওয়া যায়নি?

তার মানে ... তার মানে অচ্যুত পালিয়েছে!

গুরুদেবের কুটিরের পেছনেই অনেকটা বনবাদাড়। সামনের দিকে প্রহরী থাকলেও এদিকে সাপখোপের উৎপাতে কেউ থাকেনা।

দ্বারিকা সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছিল। ওপরে বিশাল বিশাল গাছের ছায়া ঢেকে রেখেছিল ওকে। সেই ছায়ার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে ওর গায়ে পড়ছিল সূর্যের আলো।

মাহেন্দ্র মহোৎসব কী? মহোৎসব তো বার্ষিক অনুষ্ঠান, ওদের এই বৈদিক সমাজের পবিত্রতম দিবস। অষ্টম অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে পালিত হয় সেই মহোৎসব। কিন্তু এবারে তার আগে 'মাহেন্দ্র' শব্দটি যোগ করা হয়েছে কেন?

অচ্যুতের পিতার নাম নাকি ছিল দীনবন্ধু। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান। বোঝাই যাচ্ছে, অচ্যুত পিতার গুণ পেয়েছে। কিন্তু অচ্যুতের মা? তিনি কোথায়? তিনি কি স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হয়েছিলেন? তাই যদি হয়, অচ্যুতের দাদা পালিয়েছিল কেন? মায়ের পরিণতিতে তীব্র আক্রোশেই কি?

তরুণ শিক্ষক মধুসূদনের কথাটা আবার মনে পড়ে গেল ওর।

"সে আমার বাল্যবন্ধু ছিল। মৃত্যুর আগে আমাকে শনাক্ত করতে পেরেছিল।"

অচ্যুতের দাদাকেও কি ব্রজেন্দ্রদাদার মতো হত্যা করা হয়েছে?

দ্বারিকা দরদর করে ঘামছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে ও বসে পড়ল। ছোট থেকে ওদের তিন গুরুর কথা বলা হয়েছে। শেখানো হয়েছে, বৈদিক সমাজের দিশারী তাঁরাই।

প্রথমজন সাক্ষাৎ ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণের নবরূপ। স্বয়ং পরম গুরু। যার পার্থিব নাম ওরা মাত্র কয়েকদিন আগে জানতে পেরেছে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

পরের জন ঈশ্বর নন, তবে অবতার। যিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেতুর কাজ করেন, তিনিই অবতার। প্রথম গুরু। যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই সমাজ।

কিন্তু দ্বিতীয় গুরু অর্থাৎ বর্তমান গুরুদেব? যিনি কোনো অজানা অভীষ্টপূরণের লক্ষ্যে কিছু মানুষকে বিনাশ করার অভিযান চালাচ্ছেন?

যিনি ব্রজেন্দ্রদাদা থেকে শুরু করে অচ্যুতকে এমন অমানুষিক শাস্তির মুখে ফেলছেন?

যিনি ক্ষমার মতো একটি শিশুকে পুড়িয়ে মারতে উদ্যত হচ্ছেন?

তিনি কে? কী তাঁর পরিচয়?

২০

রুদ্র ম্লানমুখে ঘরে ঢুকতেই প্রিয়ম বলল, "এসে গেছ? দাঁড়াও, শুভাশিসদাকে ফোন করি।"

"কে শুভাশিসদা?" ক্লান্ত শরীরে রুদ্র বসে পড়ল সোফায়।

"আরে, সেই যে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশধর। আমার ছোটবেলার বন্ধু। তোমায় বলেছিলাম না? এখন আমেরিকায় থাকে। তুমি যে ওর কাছ থেকে কিছু জানতে চাও, সেটা ওকে বলেছি।" প্রিয়ম মোবাইলে নম্বর টিপছিল, "ওকে ডেটা কল করছি দাঁড়াও।"

"আর করে কোনো লাভ নেই।" রুদ্র হাত তুলল, "ডি এম আর এস পি জয়েন্ট মিটিং এ আজ আমাদের মিশনটা ক্যানসেল করে দিলেন।"

"ক্যানসেল করে দিলেন?" প্রিয়ম হাঁ, "কেন?"

রুদ্র বলল, "এস পি স্যার তো প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন, এখন ডি এম ও বলছেন, তেমন কোনো প্রোগ্রেস যখন নেই, তখন সম্ভবত সব কটা কেসই ডিসটিংক্ট। কোনো লিঙ্ক নেই। তো লোক্যাল থানা যেমন তদন্ত চালাচ্ছে চালাক। আমাদের আর রেখে কী হবে। বরং সামনে পুরসভা ভোট, সেইদিকে নজর দিতে বললেন।"

"যাব্বাবা!" প্রিয়ম বলল, "তবে যে তুমি রাত জেগে এত পড়াশুনো করলে, বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকা মুখস্থ করে ফেললে?"

"ওই তিথিনক্ষত্রের মিলটা হয়তো নেহাতই কাকতালীয়।"

"আর প্রত্যেকটা দোকানে ভাঙচুর?"

"সেটাও হয়তো ক্ষতি করার জন্য। সব দোকানে তো হয়নি।" রুদ্র বলল, "আর কিছু অপশন তো দেখছি না। সিরিয়াল কিলিং এর সম্ভাবনাটা আস্তে আস্তে ফেডেড আউট হয়ে যাচ্ছে। হায়ার অথরিটি যখন আর ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে না, আমি আর কী করতে পারি! যাকগে বাদ দাও, ক্ষমা'র কী খবর?"

"এখন একটু বেটার। কোনো কারণে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মা মেয়ে দুটোই ভিতুর ডিম। সবেতেই ভয়।" প্রিয়ম কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ওর ফোনে একটা কল ঢুকতে লাগল।

"শুভাশিসদা ভিডিও কল করছে।" প্রিয়ম বলল, "আচ্ছা, তবু একবার ওর সাথে কথাটুকু বলে নাও। আমি বলে রেখেছি, বেচারা খারাপ ভাববে।"

রুদ্র হাত বাড়িয়ে ফোনটা রিসিভ করল, "হ্যালো, নমস্কার শুভাশিসবাবু।"

স্ক্রিনে একজন ফর্সা গোলগাল টাকমাথা চেহারার ভদ্রলোক দেখা গেল। পরনে লাল টি শার্ট, মুখে ফ্রেঞ্চ কাট। মুখখানা হাসি হাসি।

"হ্যাঁ নমস্কার। আসলে প্রিয়ম বলল, আমাদের বাড়িতে একটা মার্ডার হয়েছে, আর আপনি তার তদন্ত করছেন?"

রুদ্র বক্রচোখে প্রিয়মের দিকে তাকাল। ভ্রূ কুঁচকে স্ক্রিন থেকে সরে ফিসফিস করে চোখ পাকিয়ে বলল, "আমি লোকের বাড়ি বাড়ি মামুলি খুনের তদন্ত করি?"

প্রিয়ম হাত উলটে কিছু বলতে যাচ্ছিল, রুদ্র ওকে থামিয়ে দিয়ে স্ক্রিনের সামনে এসে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "হ্যাঁ, মানে ওইরকমই। সোমনাথ ভট্টাচার্য বলে একজন শরিকের ভাড়াটে যিনি বাড়ির একদিকে দোকান চালাতেন, তিনি খুন হয়েছেন।"

"হ্যাঁ, আমি খবর পেয়েছি।"

"আচ্ছা, আপনি কোন শরিকের বংশধর?"

"আমি কোনো শরিক বললে ঠিক বুঝতে পারবেন না। আসলে আমাদের বাড়ির হায়ারার্কিটা এত জট পাকানো। সময় থাকলে বলতে পারি।" শুভাশিসবাবু আবার হাসলেন।

"হ্যাঁ বলুন না।" রুদ্র অন্যমনস্কভাবে বলল।

"আপনি নিশ্চয়ই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কথা শুনেছেন। উনি আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। উনি প্রায় একশো বারো বছর বেঁচেছিলেন, জানেন নিশ্চয়ই। নিজের নাতির নাতিকেও দেখে গিয়েছেন। তো, বংশের ডালপালা এত বিস্তার করেছে যে ওই বিশাল জগদ্দলের মতো বাড়ির বাসিন্দা হয়েও আমরা সবাই সবাইকে চিনি না।"

"মানে আপনি সোমনাথবাবুকে চেনেন না?"

"না। সম্ভবত উনি নকলদাদুর বংশধর। নকলদাদুর বাড়ির কাউকেই আমি চিনিনা। কারণ আমি যখন আমেরিকায় চলে আসি, তা ধরুন, প্রায় দশবছর হল, নানা ঝামেলায় আমাদের সঙ্গে ওদের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

"মাফ করবেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" রুদ্র বলল, "নকলদাদু মানে?"

শুভাশিসবাবু বললেন, "আপনার না বোঝারই কথা। আমাদেরই মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়। আসলে আমার ঠাকুরদার বাবা শ্রী রমণীমোহন ভট্টাচার্যর ছিল একটিমাত্র পুত্র। কিন্তু কোনো কারণে সেই পুত্রর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। তখনকার দিনের ব্যাপার, তিনি ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। এদিকে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশ বলে কথা, বংশরক্ষা তো করতেই হবে। তখন তিনি দুঃসম্পর্কের এক আত্মীয়ের পুত্রকে দত্তক নেন। সেই দত্তক পুত্র বাড়ির ছেলে হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু মৃত্যুর আগে রমণীমোহন নিজের ছেলেকে ক্ষমা করেন ও বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। উইলও পরিবর্তন করেন। এইভাবে আমাদের বংশের দুটো ধারা হয়ে যায়। রমণীমোহন ভট্টাচার্যের আসল পুত্রকে আমরা বলতাম আসল দাদু। আর দত্তক পুত্রকে নকল দাদু। এইভাবেই চলতে থাকে। আমি হলাম আসল দাদুর বংশধর। নকল দাদুর সঙ্গে আসলে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।"

"বুঝলাম। আরেকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মধুময় ভট্টাচার্য, উনিও কি নকলদাদুরই বংশধর?"

"ঠিক বলেছেন। মধুময়কাকাকে মনে আছে। উনিও ওই তরফের। নকলদাদু নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর ওদের ছেলেমেয়েরা এখন ওই দিকটাতেই থাকে। আমরা থাকি পেছনদিকটায়। তাও থাকি বলতে, ঘরগুলো পড়ে আছে তালাবন্ধ হয়ে। বেশিরভাগই বাইরে। তবু আমরাই উদ্যোগ নিয়ে দুর্গাপুজোটা করি।"

"নকল দাদু নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন? কেন?"

"সে অনেক ব্যাপার! বহু বছর আমেরিকায় ছিলেন, তারপর দেশে ফিরে... আসলে রক্তের সম্পর্ক নেই তো, ওরা বরাবরই একটু অন্যরকম। রমণীমোহনের সাময়িক হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্য এত জটিলতা।" শুভাশিসবাবুর ঝকঝকে দাঁত দেখা গেল, "বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে।"

"ও আচ্ছা!" রুদ্র অন্যমনস্কভাবে বলল, "ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল। আমার একটা ফোন ঢুকছে, আপনি একটু প্রিয়মের সঙ্গে কথা বলুন।"

ফোনটা প্রিয়মের হাতে দিয়ে রুদ্র বাইরের বাগানে নেমে এল। লোকেশবাবু ফোন করছেন।

"হ্যাঁ বলুন।"

"ম্যাডাম, একটা ব্যাপার বলার ছিল।"

"কী?"

"ওই যে চন্দননগরের মহম্মদ তারেক, ওর দেশের বাড়ি সুগন্ধার দিকের এক গ্রামে। মানে ওর বউ তাই বলেছিল জেরায়। সুগন্ধা জানেন তো? চুঁচুড়া মহকুমাতেই, পোলবা দাদপুর ব্লক।"

"জানি। তো?"

"আপনি সেদিন আমাকে হৃষীকেশ জয়সোয়াল আর মহম্মদ তারেকের কেসদুটো নতুন করে ইনভেস্টিগেট করতে বললেন, তাই আমি খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। তো, সুগন্ধায় গিয়ে সবকটা গ্রামে ঘুরলাম, কিন্তু কেউ মহম্মদ তারেকের বাড়ির কোনো খোঁজ দিতে পারল না। আমি ফেরত এসে ওর বউকে জিজ্ঞেস করলাম। তো আমিনা বিবি বলল, ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ'মাস। ও নিজেও কোনোদিন তারেকের দেশের বাড়িতে যায়নি। দুজনে চুঁচুড়া স্টেশন চত্বরের বস্তিতে থাকত, সেখান থেকেই পরিচয়। তারেক সেখানে একাই থাকত, পরিবার পরিজন বলতে কেউ ছিলনা।"

"তারপর?" রুদ্র মন দিয়ে শুনছিল। দূরে দেখতে পাচ্ছিল ক্ষমাকে।

আজ ক্ষমার ভয়টা একটু কেটেছে। সে আবার বাগানের একদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

"তারপর আমি তারেকের ছবি নিয়ে সুগন্ধায় গেলাম। সেখানকার ব্লক অফিসের সাহায্য নিয়ে সব গ্রামগুলোয় ঘুরলাম। তো একটা গ্রামের নাম বদনপুর। খুব রিমোট গ্রাম। বাঁশবেড়িয়ার গঙ্গা থেকে একটা খাল বয়ে গিয়েছে পশ্চিমমুখে, সেই খালের ধারে। তো বদনপুর গ্রামের একটা লোক তারেকের ছবি দেখতে চিনতে পারল। কিন্তু বলল, ওর নাম তারেক নয়।"

"তারেক নয়? তবে কী?"

"তা মনে করতে পারল না ম্যাডাম। তবে বলল, তারেক মুসলিম নয়। হিন্দু। কয়েকবছর আগে কোথা থেকে যেন হঠাৎ এসেছিল, আবার হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গিয়েছিল। যে ক'দিন ছিল, গ্রামের মন্দিরের বাইরে শুয়ে থাকত, মুড়ি-চিঁড়ে এইসব খেত। আর চাদরমুড়ি দিয়ে ঘুমোত। লোকটা আমাকে ওই মন্দিরের পূজারির কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু সেও কিছু বলতে পারলনা।"

”হুম। রিয়েলি কমেন্ডেবল জব, লোকেশবাবু! কিন্তু আনফরচুনেটলি আমাদের মিশনটা অ্যাবর্ট করা হয়েছে। আপনি হয়তো আজকের মধ্যেই অফিশিয়াল লেটার পেয়ে যাবেন রুটিন ডিউটিতে ফিরে যাওয়ার জন্য। তাই এ'সব জেনে আর কোনো লাভ নেই।” রুদ্র ম্লানস্বরে কথাগুলো বলল। তারপর ফোনটা রেখে এগিয়ে গেল ক্ষমার দিকে।

মেয়েটাকে কাল থেকে সময় দেওয়া হয়নি।

"ক্ষমা?" রুদ্র এগিয়ে গিয়ে বাচ্চা মেয়েটার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল।

"উঁ?" মেয়েটা যেন ভূত দেখেছে, এইভাবে চমকে উঠল আকস্মিক ডাকে, ভয়ার্তচোখে একবার তাকাল ওর দিকে, তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে বসে পড়ে মাটির মধ্যে কী করতে লাগল।

ভেজা মাটি। আজ ভোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। মালি সনাতন কয়েকদিন হল আসেনি। ক্ষমা একটা খুরপি নিয়ে একটা জায়গায় বেশ কিছুটা মাটি খুঁড়েছে, এখন সেই মাটির মধ্যে থেকে কাঁকড় বাছছে। এর মধ্যেই সে এত কাঁকড় বেছেছে, যে ছোটখাটো একটা কাঁকড়ের পাহাড় হয়ে গেছে।

"কী করছিস তুই?"

ক্ষমা বলল, "গাছ লাগাব।"

"কী গাছ?"

ক্ষমা বলল, "তুলসী গাছ। তোমার এত বড় বাড়ি, অথচ তুলসীমঞ্চ নেই কোথাও। ঠাকুর পাপ দেবেন না?"

রুদ্র ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "ক্ষমা, তুই কাকে দেখে অত ভয় পেলি সেদিন?"

ক্ষমার মুখটা আবার বিবর্ণ হয়ে গেল। ফ্যাকাসে চোখে তাকাল রুদ্রর দিকে, তারপর বলল, "উঁকি মারছিল। আমার ... আমার ভাশুরপো।"

"ভাশুরপো মানে?" রুদ্র বলল, "কীসব উলটোপালটা বকছিস তুই?"

"ঠিকই বলছি। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে গো। আমি না গেলেও জোর করে নিয়ে যাবে। তারপর ... তারপর জোর করে ...!"

"তারপর? তারপর কী?" রুদ্র ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে।

ক্ষমার চোখদুটো যেন ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়, গলাটা কেমন ফ্যাসফেসে শোনায়। ঢোঁক গিলে বলে, "তারপর পরম গুরুর চরণামৃত খাইয়ে...।"

"অ্যাই ক্ষমা, কী সব বকছিস তুই?"

রুদ্র চমকে তাকায়। দেখে, মল্লিকাদি কখন এসে দাঁড়িয়েছে পায়ে পায়ে। মল্লিকাদি যেন ওকে দেখতেই পায়না, দ্রুতপায়ে এসে ক্ষমাকে টেনে হিঁচড়ে কোলে তুলে নেয়। তারপর রুদ্রর কিছু বলার অপেক্ষা না করেই সোজা চলে যায় বাড়ির ভেতরে।

রুদ্র কিছু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। পাঁচু এর মধ্যে বাগান ও বাইরের সব আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই আলো- আঁধারির মধ্যে সবকিছু ওর কেমন রহস্যময় ঠেকতে লাগল।

ওর হঠাৎ মনে হল, এই যে মল্লিকাদি আর ওর মেয়ে ক্ষমা গত কয়েকমাস ধরে ওর বাংলোয় রয়েছে, ওদের পরিচয় সম্পর্কে ও কী জানে? এইভাবে অজ্ঞাতপরিচয় কাউকে দিনের পর দিন নিজের সরকারি বাসস্থানে থাকতে দিয়ে ও কি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে?

আচ্ছা, মল্লিকাদি কি সত্যিই ক্ষমার মা? নাকি ক্ষমার মতো একটা বাচ্চামেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে চলে এসেছে? শিশুপাচার জাতীয় কোনো ব্যাপার নেই তো? কিন্তু, মল্লিকাদি যদি কোনো অপরাধই করে থাকে, তবে সে মেয়েকে নিয়ে খোদ পুলিশ বাংলোর সামনে বসে থাকবে কেন?

রুদ্র কী করবে বুঝতে পারেনা, বাগানেরই একটা বেঞ্চে বসে পড়ে ভাবতে থাকে আকাশপাতাল।

প্রিয়ম রাতে সব শুনে বলল, "ধুস, ওসব কিছু নয়। তবে, এটা ঠিক, ওদের কিছু একটা গন্ডগোলের ব্যাপার আছে। আমিও কয়েকটা ব্যাপার নোটিস করেছি, তোমায় এতদিন বলিনি।"

"কী?"

"একদিন আমি একটা এমনি কারণ দেখিয়ে মল্লিকাদি'র কাছ থেকে আইডি চেয়েছিলাম। ভোটার আধার, যা হোক কিছু। ও কিছুই দিতে পারেনি। যেটা খুবই অস্বাভাবিক। রুদ্র, তোমার ওদের শেল্টার দেওয়াটাই ভুল হয়েছে।"

"তাহলে এখন কী করবো?" রুদ্র খেতে খেতে বলল, "ওদের কোনো কারণ ছাড়া তাড়িয়ে দেওয়া যায় নাকি? মেয়েটা পড়াশুনো শিখছে, মল্লিকাদি'ও যাহোক একটা আশ্রয় পেয়েছে, কিছুতেই এখন চলে যেতে বলা যায় না।"

"সে নাহয় বললে না। কিন্তু ওদের আসল পরিচয় জানার রাইট নিশ্চয়ই তোমার রয়েছে।" প্রিয়ম বলল, "সরকারি বাংলোয় রয়েছ, নিজেও একটা দায়িত্বপূর্ণ পোস্ট হোল্ড করছ, কিছু গন্ডগোল হলে তুমিই কিন্তু ফাঁসবে, এটা মনে রেখো!"

২২

প্রিয়মের সাবধানবাণী অদ্ভুতভাবে ফলে গেল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে রুদ্রদের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম কাজ করা বন্ধ করলেও হুগলী জেলায় হত্যালীলা বন্ধ হল না।

৬ জুলাই থেকে ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে দুটো চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল।

এক, হুগলী জেলার অন্যতম বড় বেসরকারি নার্সিংহোম 'বাসুদেব ভবন' এর একচ্ছত্র মালিক ড. সুবল ভট্টাচার্য খুন হলেন। ৮ই জুলাই গভীর রাতে। বাঁশবেড়িয়ায়।

দুই, মল্লিকাদি বাংলো চত্বরেই ভয়ংকর ভাবে খুন হল।

ঘটনার সূত্রপাত বেলা বারোটা নাগাদ। সেদিন রুদ্র বা প্রিয়ম কেউই ছিল না। মল্লিকাদি ক্ষমার হাত ধরে গঙ্গার পাশের রাস্তা ধরে গিয়েছিল কাছের একটা দোকানে টুকিটাকি জিনিস কিনতে। পুলিশ বাংলোর দিকটা এমনিতেই বেশ নির্জন থাকে, তার ওপর গ্রীষ্মের দুপুর।

জ্যোৎস্নাদি রান্নাঘরে ব্যস্ত, এমন সময় মল্লিকাদি ছুটতে ছুটতে এল। তার ঘোমটা খসে পড়েছে। চোখ উদ্ভ্রান্ত, মুখে আতঙ্ক উপচে পড়ছে। হাউমাউ করে বলল, "আমার ক্ষমাকে … আমার ক্ষমাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল গো!"

"কারা ধরে নিয়ে গেল? কোথায় ধরে নিয়ে গেল?" বলতে বলতে জ্যোৎস্নাদি যখন বেরিয়ে এল, যখন বাংলোর সামনে প্রহরারত দুই গার্ডকে নিয়ে ছুটল নদীর দিকে, ততক্ষণে সব শুনশান। ক্ষমার কোনো চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু রাস্তার এককোণে পড়ে রয়েছে ক্ষমার বেগুনি রঙের ফ্রকের একটা অংশ। ধস্তাধস্তিতে ছিঁড়ে গেছে সেটা।

এ এস পি বাংলো থেকে মাত্র একশো মিটার দূরত্বে এমন কাণ্ডে সবাই হতভম্ব। মল্লিকাদি কাঁপছে থরথর করে। গ্রামের সহজ সরল অশিক্ষিত মহিলা সে। জ্যোৎস্নাদি'কে খবর দেওয়ার আগে যে বাংলোর বাইরের গার্ডদুটোকে ডাকা উচিত ছিল কিংবা উচিত ছিল তারস্বরে চিৎকার করার, সে'সব মাথায় আসেনি তার।

কিন্তু আসল ঘটনার তখনও বাকি ছিল।

রুদ্র সেদিন এস পি রাধানাথ স্যারের অফিসে একটা মিটিং এ ছিল। আসন্ন পুরসভা ভোটের ব্যাপারে কোর্স অফ অ্যাকশন সংক্রান্ত একটা আর্জেন্ট মিটিং ডেকেছিলেন স্যার। খবর পেয়ে যখন প্রায় আধঘণ্টা পরে এল, তখন জ্যোৎস্নাদি হাউমাউ করে কান্না জুড়েছে। মল্লিকাদি পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে বাগানের মাঝখানের লবিতে। যেখানে ক্ষমা খেলে বেড়াত।

রুদ্র প্রথমেই সঙ্গে আসা পুলিশদের পড়ে থাকা ফ্রকটা কালেক্ট করতে বলল। তারপর জয়ন্তকে ওদিকটা দেখতে বলে শক্ত হাতে মল্লিকাদি'কে নিয়ে গিয়ে ঢুকল ওদের ঘরে।

মল্লিকাদি নিজের ঘরে ঢোকামাত্র থেবড়ে বসে পড়ল। তার চুল আলুথালু। আঁচলের প্রান্ত এলিয়ে পড়ে রয়েছে মাটিতে। চোখ দিয়ে ঝরছে জল। বিড়বিড় করে কী যেন বকে

চলেছিল নিজের মনে।

রুদ্র দরজা বন্ধ করে তীক্ষ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ”দ্যাখো মল্লিকাদি, তুমি যদি সত্যি কথা বলো, আমি কিছু বলব না। তোমরা কারা? ক্ষমাকে কারা ধরে নিয়ে গেল? কেন ধরে নিয়ে গেল? কী করেছ তোমরা?”

মল্লিকাদি ভয়ে থরথর করে কাঁপছে, সে এবার মুখে আঁচলচাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল। পাশেই জানলা, উঠে দাঁড়িয়ে জানলার রেলিং ধরে সে ফোঁপাতে থাকল। কান্না চাপার প্রাণপণ চেষ্টায় তার ছোটখাটো শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছিল।

”মল্লিকাদি!” কিছুটা অস্থির হয়ে বলল রুদ্র, ”তুমি বললে ভালো, নাহলে আমি বাধ্য হব তোমাকে বাংলো থেকে বের করে দিতে। শুধু তাই নয়, তোমার বিরুদ্ধে আমি অ্যাকশনও নেব।”

”না দিদি! আপনার পায়ে পড়ি।” মল্লিকাদি এবার কেঁদে ফেলল, ”আপনি আমায় বন্দি করে রেখে দিন তাও ভালো, কিন্তু বাংলোর বাইরে ছাড়বেন না। বাংলোর বাইরে গেলে ও-ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!”

”ওরা মানে কারা? কারা তোমায় মেরে ফেলবে?” রুদ্র চোখ সরু করল।

”বলছি। কিন্তু আপনি আমায় ঠিক বাঁচাবেন তো দিদি?” মল্লিকাদির মুখেচোখে আতঙ্ক, ”ওরা কিন্তু ভয়ঙ্কর!”

”আমি থাকতে তোমার কোনো ক্ষতি হবেনা মল্লিকাদি!” রুদ্র বলল, তুমি বলো, এই ওরা কারা?”

মল্লিকাদি কোনোমতে নিজেকে সামলে কী যেন একটা বিড়বিড় করতে শুরু করল, কিন্তু বলতে পারল না। হঠাৎ কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল সামনের দিকে।

রুদ্র ছুটে এগিয়ে গিয়ে দেখল, ওর ঘাড়ের পেছনে ফুটে রয়েছে অনেকটা লম্বা একটা তির।

মল্লিকাদির মুখ যন্ত্রণায় বেঁকেচুরে যাচ্ছে। চোখ বুজে আসছে। তবু তার মধ্যেই ও যেন আপ্রাণ চেষ্টায় কী বলতে চাইল। কিন্তু বলতে পারল না। কয়েকবারের চেষ্টার পর চোখের পাতাগুলো নিঃস্পন্দ হয়ে থেমে গেল। দু’ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল একদিকে।

রুদ্র দ্রুত গতিতে বাইরে বেরিয়ে এল। জয়ন্ত দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের নিয়ে ও ছুটতে লাগল বাংলোর পেছন দিকের বাঁশবাগানে। মল্লিকাদির ঘরের জানলার বাইরে রয়েছে সেই জঙ্গল।

বাংলো থেকে বেরিয়ে পেছনদিকে ঘুরে পৌঁছতে হয় সেই বাঁশবাগানে। রুদ্ররা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন বিশাল বাঁশবাগান পুরো শুনশান।

রুদ্র জয়ন্ত'র দিকে তাকাল, "ক্ষমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্তত আধঘণ্টা আগে। তার মানে এতক্ষণ কেউ বা কারা এই বাগানে লুকিয়ে ছিল। তারাই মল্লিকাদির গায়ে তির ছুঁড়েছে।"

"কিন্তু এদিকটায় ঢুকল কীভাবে!" জয়ন্ত বলল।

"পার্থ আর তিমির, তোমরা ভালো করে সার্চ করো। এখনো হয়তো এখানেই লুকিয়ে রয়েছে।" রুদ্র চাপাস্বরে দুজন কনস্টেবলকে নির্দেশ দিল।

প্রচণ্ড ঘন বাঁশবাগান। মাঝেমাঝে মাথা চাড়া দিয়েছে অন্যান্য গাছ। যত্নের অভাবে এতটাই দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে যে দিনের আলোটুকুও ভালো করে ঢুকছেনা।

রুদ্র পুলিশ ইউনিফর্মেই ছিল। পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে ও সন্তর্পণে এগোচ্ছিল একেকটা গাছের পাশ দিয়ে। ওপর দিকে দেখছিল মাঝে মাঝে। যদিও গাছের ওপর লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা কম। মল্লিকাদির ঘাড়ে যে তিরটা এসে ফুটেছে, সেটা নীচ থেকে ওপরদিকে গেঁথে রয়েছে। কেউ নীচু জায়গা থেকে ধনুকের জ্যা টেনেছে বলেই মনে হচ্ছে।

প্রায় আধঘণ্টা খোঁজার পর রুদ্র হাল ছেড়ে দিল। পার্থ আর তিমিরও ফিরে এসেছে হতাশ মুখে।

ক্লান্ত দেহে ওরা যখন বাংলোয় ফিরে এল, তখন জ্যোৎস্নাদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ইতিমধ্যেই এ এস পি বাংলো ক্যাম্পাসে হাজির হয়েছে আরও বেশ কিছু পুলিশ। রাধানাথ স্যার সব শুনে নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের।

মল্লিকাদির নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে রয়েছে মাটিতে। ঘাড়ের নীচ দিয়ে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত।

কেউ এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে পুলিশ বাংলোর মধ্যে কেউ খুন হতে পারে!

রুদ্র চোখ সরু করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে বসে দেখতে লাগল গেঁথে থাকা তিরটা। খুব সরু করে ছুঁলে তৈরি করা বাঁশের তির, কিন্তু ফলাটা ধাতব। নিশ্চয়ই ফলায় বিষ জাতীয় কিছু মাখানো রয়েছে, নাহলে মল্লিকাদির এত দ্রুত মৃত্যু হত না। ফরেনসিক টেস্টেই বোঝা যাবে।

ওর কানে বাজছিল মল্লিকাদি'র বলা শেষ কথাগুলো!

আপনি আমায় ঠিক বাঁচাবেন তো দিদি?

২৩

এস পি রাধানাথ রায় থমথমে মুখে বললেন, "সেই জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। সাতখানা বিজনেসম্যান মার্ডার। 'বাসুদেব ভবন' এর মতো বড় নার্সিং হোমের মালিক বলে কথা! এবার আমাদের প্রত্যেকের বদলি হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। আর রুদ্রাণী, তোমাকে আর কী বলব! শ্রীরামপুর পুলিশের এতবছরের ইতিহাসে যা কখনো হয়নি, তুমি তা করে দেখালে। প্রতিটা নিউজপেপারের ফ্রন্ট স্টোরি, শ্রীরামপুর এ এস পি বাংলোয় খুন। পুলিশ বাংলোয় সবার নাকের ডগা দিয়ে একটা জলজ্যান্ত মার্ডার। হোপলেস! আমার আর কিছু বলার নেই।"

বিশাল ঘরের গোল কনফারেন্স টেবিলের একেকটা আসনে বসে রয়েছে সবাই। প্রত্যেকের সামনে বাধ্যতামূলক জলের বোতল। গোটা ঘরটায় এমন এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, যে ঘরের একপাশে দাঁড় করানো বিশাল গ্র্যান্ডফাদার'স ক্লকটার পেন্ডুলামের শব্দটা বড় কর্কশভাবে কানে লাগছে।

রুদ্রর মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। সবার সামনে এত বড় অপমানে ওর কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল। কিন্তু এস পি স্যারের কথাগুলো অপ্রিয় হলেও মিথ্যে তো নয়!

আজ আবার চুঁচুড়ায় ডি এম অফিসে হাই এন্ড মিটিং ডাকা হয়েছে। জেলাশাসক ছাড়াও এসেছেন চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার মি. সুনীত বসু এবং প্রতিটি মহকুমার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট। যেহেতু রুদ্র ওই ইনভেস্টিগেশন টিমের হেড ছিল, সবার চেয়ে জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও তাকেও রাখা হয়েছে মিটিং এ।

"দাঁড়ান মিঃ রায়।" পুলিশ কমিশনার সুনীত বসু অভিজ্ঞ আই পি এস, তিনি বোধ হয় একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করাতে চাইলেন এই তরুণী অফিসারটিকে। বললেন, "মিসেস সিংহরায়, আপনাদের টিমটার প্রোগ্রেস কতদূর হয়েছিল?"

রুদ্র গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "আমরা তো প্রতিটা কেসই আলাদাভাবে ইনভেস্টিগেট করা শুরু করেছিলাম স্যার। বেশ কিছু ক্ল্যুও পেয়েছিলাম যাতে করে লিঙ্ক করা যায়। কিন্তু তারপরই ডি এম ম্যাডাম কাজটা পোস্টপোন করতে বললেন ...।"

"হুম।" সুনীত বসু শ্রীরামপুরের এস পি'র দিকে তাকালেন, "আমার মনে হয়, একটা স্পেশাল টিম যখন কাজ শুরু করেইছিল, ওরাই আবার রেজিউম করুক, সেটাই বেটার হবে।"

এস পি রাধানাথ রায় তখনও বিরক্ত। বললেন, "কিন্তু স্যার, রুদ্রাণী নিজের বাংলোয় এতদিন দুজন অচেনা মানুষকে রেখে দিল, তাদের কোন আইডি পর্যন্ত না দেখে। তাদের মধ্যে একজন কিডন্যাপড, অন্যজন মার্ডারড। দুজনেরই কোনো পরিচয় জানা নেই। এতটা নেগলিজেন্স কি কোনো পুলিশ অফিসারের সাজে? তাও আবার আই পি এস ক্যাডার?"

রুদ্র পাথরের মতো মুখ করে বসে রইল। হায়ারার্কি অনুযায়ী ওর ইমিডিয়েট বস এস পি রাধানাথ রায়। তার ওপরে কমিশনার সাহেব। অন্য কোনো এস পি হলে ওকে বোধ হয় এতক্ষণে সাসপেন্ড করে দিতেন। ওদের এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কথায় কথায়

সাসপেনশন অর্ডার বেরোয়। রাধানাথ স্যার মানুষটা সত্যিই ভালো, মুখে হম্বিতম্বি করেন, কিন্তু অধস্তনদের ক্ষতি করেন না। সেদিন বাংলোয় ওই ঝামেলার সময় উনিই ফোর্স পাঠিয়েছিলেন সাহায্যের জন্য।

কিন্তু তবু ওর চোখ ফেটে জল আসছিল।

কমিশনার বললেন, ”ইটস ওকে। শি ইজ স্টিল অন হার প্রোবেশন। আমার মনে হয়, পুরোনো টিমটাকেই অপারেশনাল করা হোক, কী বলেন ম্যাডাম?”

জেলাশাসক গুরশরণ কৌর আগেরবার রুদ্রর ওপর অনেক বেশি ভরসা রেখেছিলেন। কিন্তু এবার বোধহয় তাঁরও বিশ্বাস টলে গিয়েছে। তিনি বললেন, ”আপনাদের ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার, কাকে দায়িত্ব দেবেন, সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমার রেজাল্ট চাই। ব্যাপারটা এবার মিনিস্টার লেভেলে পৌঁছে গিয়েছে। ওই ডাক্তারবাবুর স্টেট লেভেলে ভালো জানাশোনা রয়েছে।”

কমিশনার বললেন, ”তাহলে পুরোনো টিমটাতে একজন সিনিয়র অফিসারকে লিড করতে দেওয়া হোক। মিসেস সিংহরায় তাঁকে অ্যাসিস্ট করবেন। কেমন হয়?”

রুদ্রর মুখটা কালো হয়ে গেল। নতুন তৈরি হওয়া কোন টিমে একজনের আণ্ডারে থাকা অন্য কথা, কিন্তু পুরনো টিমে যেখানে ও এতদিন নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে, সেখানে ওর মাথার ওপর একজনকে বসানো মানে ওর কর্মদক্ষতাকে সরাসরি সন্দেহ করা। সেক্ষেত্রে টিমের বাকি সদস্যদের কাছে ওর সম্মান অনেক নীচে নেমে যাবে।

এবারেও ওকে বাঁচালেন রাধানাথ স্যার। বললেন, ”না, আমার মনে হয়, রুদ্রাণীর টিমটাকেই আরেকবার কাজটা করতে দেওয়া হোক। নতুন কাউকে ঢোকালে তার ডিরেকশন অফ ইনভেস্টিগেশন এতদিনের প্রোগ্রেসের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। সেক্ষত্রে আরও দেরি হবে।”

কমিশনার সুনীত বসু সায় দিলেন, ”বেশ। তাই হোক।”

রুদ্র কৃতজ্ঞ চিত্তে তাকাল রাধানাথ স্যারের দিকে। এত দুঃখের মধ্যেও ওর মনে হল, রাধানাথ স্যার এই পুলিশ সার্ভিসে ওর অভিভাবক। এমন অভিভাবক যিনি বাবার মতো প্রয়োজনে বকতেও পারেন, আবার দরকারে বটগাছের মতো আগলে রাখতেও পারেন।

ও অস্ফুটে বলল, ”থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!”

রাধানাথ স্যার যেন শুনতেই পেলেন না রুদ্রর কথা। কড়া কণ্ঠে বললেন, ”দিজ ইজ ইয়োর লাস্ট চান্স রুদ্রাণী! এরপর কিন্তু আমরা টিমটা লিড করার জন্য অন্য কাউকে দিতে বাধ্য হব।”

২৪

বীরেনবাবু বললেন, "ডঃ সুবল ভট্টাচার্য খুব নামকরা গাইনোকোলজিস্ট ছিলেন। বাঁশবেড়িয়ার মানুষ বলে নার্সিং হোমটা ওখানে করেছিলেন, কিন্তু মাসে অনেকবার চেন্নাই, মুম্বাই আর দিল্লির সব বড় বড় হসপিটালে রুগি দেখতে যেতেন। আর তিনি শুধুই 'বাসুদেব ভবন' এর মালিক ছিলেন না, ওঁর কিন্তু আরও অনেকরকম পরিচয় ছিল।"

"যেমন?" রুদ্র গাড়ির সামনের সিটে বসেছিল। ওর কোলে শিবনাথ বিশ্বাসের ল্যাপটপ। তাতে বিশেষ কিছু নেই। লোকটা আদ্যন্ত ঘরোয়া ছিল। মেয়ের বলতে গেলে প্রতি মুহূর্তের ছবি তুলে স্টোর করেছে ল্যাপটপে।

আহা! সেই মেয়ে কোনোদিন বাবাকে চিনলই না।

গাড়ির পেছনে রয়েছে জয়ন্ত আর বীরেনবাবু। গাড়ি চালাচ্ছিল পাঁচু।

বীরেনবাবু বললেন, "আমি এই তিনদিন ধরে ইনফরমেশন কালেক্ট করছি। ড. ভট্টাচার্য বাসুদেব ভবনে সমস্ত গরিব মানুষদের জন্য একেবারে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। কলকাতার অনেক বড় বড় ডাক্তার সেখানে চ্যারিটেবল সার্ভিস দিতেন। তাছাড়া উনি মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের গভর্নিং বডিতেও ছিলেন। মায়াপুরে ইসকনের যে নিজস্ব দাতব্য নার্সিং হোম, তাতেও উনি বছরে দু-তিনবার গিয়ে ফ্রিতে রুগি দেখতেন, অপারেশন করতেন। ভালো লোক ছিলেন। আমাদের লোকেশবাবু তো ইসকনের ভক্ত, উনি আরও ভালো বলতে পারবেন।"

"মার্ডার কীভাবে করা হয়েছে?" রুদ্র ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ওই একইরকমভাবে। রাত একটার সময় গিয়ে বাড়িতে বেল বাজিয়ে কাকুতিমিনতি করেছে একটা লোক। তার স্ত্রী নাকি প্রেগন্যান্ট, আট মাস চলছে। হঠাৎ ব্লিডিং হচ্ছে। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী লোকটাকে প্রথমে বলেছেন হাসপাতালে নিয়ে যেতে। তখন সে হাতে পায়ে ধরেছে। সে নাকি রিকশা চালায়। এই মাঝরাতে গাড়ি করে বউকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। তখন ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে বেরিয়েছেন। সেই লোকটার রিকশা চেপেই। আর ফেরেননি। তারপর থেকে কোনো ট্রেস নেই। ফোনও বন্ধ। পরেরদিন বিকেলে গঙ্গার ঘাটে বসে থাকা অবস্থায় বডি মিলেছে। গলায় গামছা জাতীয় কিছু দিয়ে চেপে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে।" বীরেনবাবু মুখ দিয়ে আপসোসের শব্দ করলেন, "মানুষ কী নির্মম। লোকটা সাহায্য করতে গেল, আর তাকেই কিনা …!"

"এসব কী হচ্ছে?" রুদ্র বিরক্তিতে হাতের তালুতে ঘুষি মারল, "পরপর একরকমভাবে খুন … অথচ কোনো ক্ল্যু নেই। কোনো উইটনেস নেই। কোনো সিসিটিভি নেই।"

"ডাক্তারের স্ত্রী, সেক্রেটারি, নার্সিং হোমের অনেককে ইন্টারোগেট করা হয়েছে। কিছুই পাওয়া যায়নি। ফোনটা ভাঙা অবস্থায় মিলেছে অনেক দূরের এক ঘাটে। রিকশা'টা মিলেছে অন্য একটা পাড়ায়। রিকশার যে মালিক সে দিশি মদ খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল রাস্তার পাশে।"

রুদ্র কী বলতে যাচ্ছিল, জয়ন্ত মাঝখানে বলে উঠল, "বীরেনদা, আপনি ডাক্তারবাবুর আরেকটা পরিচয় তাহলে জানতে পারেননি।"

"কী ভাই?"

"হয়তো ব্যাপারটা কাকতালীয়, কিন্তু এই ড. সুবল ভট্টাচার্যও কিন্তু ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশধর!" জয়ন্ত বলল।

"অ্যাঁ?" চমকে উঠল রুদ্র, "তুমি কী করে জানলে?"

"আজ সকালে ডিউটিতে আসছি, মধুময়দা'র সঙ্গে দেখা। তিনিই বললেন। ওই ডাক্তারবাবু অবশ্য জন্মেছিলেন বাঁশবেড়িয়াতেই। ওঁর ঠাকুরদাই ত্রিবেণীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে আলাদা বাড়ি করেছিলেন। তাই আমরা জানতাম না।"

জয়ন্ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, রুদ্র বলল, "এই দাঁড়াও। গাড়ি দাঁড় করাও।"

"কী হল?" পাঁচু অবাক। গাড়ি জিটি রোড দিয়ে ছুটছে বাঁশবেড়িয়ার উদ্দেশ্যে।

রুদ্র গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, "তোমরা বেরিয়ে যাও। সব ভালো করে দেখে এসো। আমি অন্য একটা কাজে যাচ্ছি।"

জয়ন্ত আর বীরেনবাবু বিস্মিত হলেও ঊর্ধ্বতন ম্যাডামের ওপর কোনো প্রশ্ন করলেন না। গাড়িটা হুশ করে বেরিয়ে গেল।

জিটি রোড থেকে কিছুক্ষণ অন্তরই সরু গলি চলে গিয়েছে গঙ্গার ঘাটের দিকে। তেমনই একটা গলি দিয়ে রুদ্র পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

গঙ্গার ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ফোন বের করে কল করল।

এখন ক'টা বাজে? সকাল ন'টা। তার সামনে ওয়াশিংটনে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। এত রাতে ফোন করা কি ঠিক হবে?

বেশি কিছু না ভেবে ও ফোন করেই ফেলল।

দু-দু'বার ডেটা কল কেটে গেল। তিনবারের বার কল রিসিভড হল।

"হ্যালো?"

"হ্যালো, শুভাশিসবাবু? আমি ... আমি প্রিয়মের স্ত্রী রুদ্রাণী বলছি।"

"আরে হ্যাঁ, বলুন। কী ব্যাপার?"

"আচ্ছা, আপনি সেদিন কী বলতে চাইছিলেন? নকল দাদুরা কেন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন?"

ওপাশে কিছুক্ষণের নীরবতা।

"হঠাৎ এই প্রশ্ন?"

"মি. ভট্টাচার্য, প্লিজ আমাকে একটু খুলে বলুন!" রুদ্রর গলা থেকে আকুতি ঝরে পড়ছিল।

শুভাশিসবাবু আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "আপনি আমীশ কমিউনিটির নাম শুনেছেন?"

২৫

"মানে! এরকম লোকজন সত্যিই আমেরিকাতে আছে?" হতভম্বমুখে বলল প্রিয়ম।

রুদ্র ল্যাপটপে হুমড়ি খেয়ে কী দেখছিল আর একটা খাতায় নোট নিচ্ছিল, "আছে কী বলছ! শুভাশিসবাবু না বললে জানতেই পারতাম না! প্রায় দু'লাখের ওপর আমীশ লোক আছে আমেরিকায়। যারা মনে করে, আধুনিক সভ্যতা সমাজের জন্য অভিশাপ। তাই তারা প্রায় মধ্যযুগের মতো থাকে। কোনো মোটরগাড়ি ব্যবহার করেনা, ভিক্টোরিয়ান যুগে যেমন ঘোড়ার গাড়ি চলত, তাতে করে যাওয়া আসা করে। ছেলেরা পুরনোদিনের স্টাইলের লম্বা ওভারকোট আর টুপি পরে, মেয়েরা পরে সর্বাঙ্গ ঢাকা গাউন। ফোন বা ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার তো দূর, এরা দেশের কারেন্সিও ব্যবহার করে না।"

"মানেটা কী!" প্রিয়ম হাঁ করে শুনছিল, "খাওয়াদাওয়া পায় কোত্থেকে? বেঁচে থাকে কী করে?"

"এরা বিশাল কোনো অঞ্চল জুড়ে থাকে। সেখানে নিজেরাই চাষবাস করে, গরু পোষে, ভেড়া পোষে। নিজের ক্যাটল, নিজেদের ফার্ম। কেউ ঘোড়ার নাল তৈরি করে, কেউ পোশাক তৈরি করে। টাকাপয়সার কোনো ব্যাপার নেই, পুরোটাই চলে বিনিময় প্রথায়। অর্থাৎ তুমি আমাকে দুধ দাও, আমি তোমায় জামা দেব, এইরকম আর কী। বাচ্চাদের জন্য ওই অঞ্চলের মধ্যেই স্কুল আছে। তাতে প্রধানত পড়ানো হয় বাইবেল। ধর্মীয় পাঠ দেওয়া হয়। তাও তেরো-চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর আর পড়িয়ে কি হবে, সবাই তো নিজেদের মধ্যেই থাকবে।"

প্রিয়ম বলল, "কী অদ্ভুত! কেন, এরা কেন করে এরকম?"

রুদ্র নোটবুকে কী লিখতে লিখতে বলল, "এরা মনে করে, সমাজ যত আধুনিক হচ্ছে, প্রযুক্তি, যান্ত্রিকতা তত বেশি গিলে খাচ্ছে মানুষকে। পারিবারিক সময় কমে যাচ্ছে। তাই এরা কম্পিউটার তো দূর, টেলিফোনও ব্যবহার করে না। এমনকি ইলেক্ট্রিসিটিও নয়। আর একটা আধটা জায়গা নয়, আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া, নিউ ইয়র্ক, ওহিও, মেরিল্যান্ড, মিশিগান এরকম বহু জায়গায় নিজেদের ক্লোজড এরিয়ায় বাস করে এই আমীশরা। এদের বার্থ রেটও ভীষণভাবে বেশি। একটা আমীশ দম্পতির গড়ে ছ' থেকে সাতটা করে সন্তান। গোঁড়া ক্যাথলিক বলে এরা গর্ভপাতকেও পাপ মনে করে। আর নিজেদের মধ্যেই বিয়ে হয় বলে এদের মধ্যে বামন বা ওইজাতীয় জিনগত সমস্যা অনেক বেশি। এরা আধুনিক কোনো ওষুধও ব্যবহার করে না। কোনো মানুষের আয়ু শেষ হওয়ার সময় এলেও ওষুধ দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখাকে এরা তীব্র পাপ মনে করে। শারীরিক কোনো অসুস্থতায় কষ্ট পাওয়াটাও এদের কাছে পুণ্য। একবার এক ডাক্তারের ওপর ওরা হামলাও চালিয়েছিল। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে আমীশ সমাজে বিনা চিকিৎসায় একেকজনকে মেরে ফেলার খবর নিয়ে গোটা আমেরিকায় অনেক ঝামেলা হয়েছে। কিন্তু কিছু হয়নি। এখন সরকারও এদের বেশি ঘাঁটায় না। ওদের জন্য অনেকরকম ছাড়ও রয়েছে। গোটা সমাজের দণ্ডমুণ্ড কর্তা হয় চার্চের ধর্মযাজক। তাঁর কথাই একটা আমীশ সম্প্রদায়ে শেষ কথা।"

প্রিয়ম ততক্ষণে নিজের ফোন ঘাঁটতে শুরু করেছিল, "সত্যিই তো। এই তো আমীশদের ছবি। মাঝে মাঝে দেখছি তাদের দু-একজন আধুনিক সমাজে পালিয়েও আসে। খুব অদ্ভুত!"

"অদ্ভুত হতে পারে।" রুদ্র বিড়বিড় করল, "কিন্তু এই অদ্ভুত বিষয় ধরেই আমি অনেকটা আলো দেখতে পাচ্ছি, প্রিয়ম! তোমার ওই শুভাশিসবাবু আমাকে যে সাহায্য করলেন, তা বলে বোঝাবার নয়।"

"কীভাবে?" প্রিয়ম বলল, "আমেরিকার আমীশ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তোমার এই সিরিয়াল কিলিং এর কী সম্পর্ক?"

রুদ্র বলল, "তর্কপঞ্চাননের ফ্যামিলিতে তিন প্রজন্ম আগে একজনকে দত্তক নেওয়া হয়। শুভাশিসবাবুরা তাঁকে ডাকতেন নকল দাদু বলে। সেই দত্তকপুত্র অল্প বয়সেই আমেরিকায় চলে যান। পড়াশুনো করতে। সেখানে গিয়ে কোনভাবে একটা আমীশ সম্প্রদায়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। সাধারণত আমীশরা বাইরের জগতের সঙ্গে তেমন মিশতে চায় না, কিন্তু ইনি কোনোভাবে তাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। বলা ভালো, আমীশদের জীবনযাত্রায় তিনি বেশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এটা গত শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা।"

"ইন্টারেস্টিং!" প্রিয়ম মন দিয়ে শুনছিল। রুদ্র থামতেই বলে উঠল, "তারপর? তিনি কি ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করেছিলেন?"

"সেই ব্যাপারে শুভাশিসবাবু আর কিছু বলতে পারলেন না। তবে বললেন, একবার দেশে এসে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। তাও প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। তারপর তিনি আবার আমেরিকায় ফিরে গিয়েছেন, না কী করেছেন, কেউ জানে না।"

"তো? তার সঙ্গে তোমার এই খুনগুলোর কি সম্পর্ক?"

"সম্পর্ক আমি একটা পেয়েছি। কিন্তু, সেটা কতটা জোরালো, তা বুঝতে সময় লাগবে। বাসুদেব ভবন নার্সিং হোমের মালিক ড. সুবল ভট্টাচার্য খুন হওয়ার পরই সেটা আরও বেশি করে মাথায় এল। বোঝাচ্ছি, দ্যাখো।" রুদ্র টেবিল থেকে একটা খাতা টেনে নিল।

প্রথম খুন	শিবনাথ বিশ্বাস (৩৮)	সাইবার ক্যাফে	শ্রীহরি সাইবার ক্যাফে
দ্বিতীয় খুন	মহম্মদ তারেক (৩২)	মোবাইল রিচার্জ	মোবাইল রিচার্জ করার গুমটি
তৃতীয় খুন	সুনীল ধাড়া(৪১)	চশমা	ধাড়া অপটিকালস
চতুর্থ খুন	হৃষীকেশ জয়সোয়াল(৪৮)	প্রোমোটারি	জয়সোয়াল কন্সট্রাকশনস
পঞ্চম খুন	স্বপন সরকার (৪৫)	গাড়ি	গাড়ির ডিলার
ষষ্ঠ খুন	ব্রিজেশ তিওয়ারি	ইনভার্টার	ইনভার্টারের ডিলার
সপ্তম খুন	ডঃ সুবল ভট্টাচার্য	হাসপাতাল	বাসুদেব ভবন

"এই যে সাতজন খুন হয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যোগসূত্রটা কী জানো প্রিয়ম? আমাদের চোখের সামনেই জ্বলজ্বল করছে, অথচ আমরা কেউ ধরতে পারিনি! কখনো হুগলী, কখনো ব্যবসায়ী এইসব উলটোপালটা লিঙ্কে বিভ্রান্ত হয়েছি।" রুদ্র বলল।

"কী?"

"এরা প্রত্যেকেই এমন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, যেগুলো আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ। তুমি দ্যাখো। সাইবার ক্যাফে, মোবাইল, ইনভার্টার, চশমা, রিয়েল এস্টেট। সব! এমনকি হাসপাতালও। যেখানে অসুস্থকে সুস্থ করে তোলা হয়। যেখানে অপারেশন করে কৃত্রিমভাবে সারিয়ে তোলা হয়। আমীশরা এইসবকিছুকে ঘৃণা করে। এই সব ক'টাকে জিনিসকে তারা মনে করে প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী!"

প্রিয়ম মন দিয়ে দেখছিল। তারপর বলল, "তার মানে তুমি বলছ, শুভাশিসদা'র ওই নকলদাদু এখানে এসে আমীশ সমাজের শাখা খুলেছেন?"

"সেটা বলার মতো সময় এখনো আসেনি, প্রিয়ম।" রুদ্র বলল, "তবে আমার মনে হচ্ছে, এদের মধ্যে একটা বিরাট সুতো রয়েছে। সেই সুতোটাকে খুঁজে বের করতে হবে। আর তার জন্য আমায় আবার যেতে হবে বাগডাঙার ওই আশ্রমে। যেতে হবে বদনপুর বলে একটা গ্রামেও।"

"বাগডাঙার আশ্রম মানে যেখানে ওই স্বপন সরকার আর হৃষীকেশ জয়সোয়াল একসঙ্গে যেতেন?" প্রিয়ম বলল, "সেটা আবার পিকচারে আসছে কী করে!"

"পিকচারে আসছে কারণ, বাগডাঙার সেই আশ্রমের বইয়ের তাকে আমি একটা বহু পুরনো বই দেখতে পেয়েছিলাম।" রুদ্র বিড়বিড় করল, "বিবাদভঙ্গার্ণব! আমি নিঃসন্দেহ, এই গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বিরাটভাবে জড়িয়ে আছেন। দেখি, সব শুনে এস পি স্যার কী বলেন!"

২৬

বদনপুর গ্রামের একেবারে নদীর ধারে যে চণ্ডীমন্দিরটা রয়েছে, তা কতকালের পুরনো কেউ জানেনা। মন্দিরের একদিক ভেঙে ভেতরের হাড়পাঁজরা বেরিয়ে এসেছে। সেই গর্তের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বট অশ্বত্থের ঝুরি। মন্দিরের চূড়াটা এককালে বেশ উঁচু ছিল বোঝা যায়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মাঝে মাঝেই ইট খসে পড়ে সেখান থেকে।

ভেতরের গর্ভগৃহের মাঝখানে থাকা মা চণ্ডীর বিগ্রহটি পাথরের। পর্যাপ্ত সূর্যালোকের অভাবে মা সেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

যে গ্রামে মানুষই পেট পুরে খেতে পায় না, সেই গ্রামে আবার মন্দিরের সংস্কার কে করে?

অথচ বছর পঞ্চাশ আগেও বদনপুর গ্রাম বেশ সচ্ছল ছিল। চৌধুরীরা ছিল উচ্চবংশজাত পরিবার। এখানকার সাবেক ভূম্যধিকারী, তাদের প্রচুর জমিজমার ওপর ভিত্তি করে মূলত চলত বদনপুরের গরিব কৃষিজীবী পরিবারগুলো। চৌধুরীদের ঠাটবাট, দুর্গাপুজোর আশনাই গোটা হুগলীর লোকেদের চোখ ট্যাঁরা করে দিত। ছোটবড় জমিদাররা তো বটেই, শোনা যায়, সাহেবসুবোরাও নাকি নিয়মিত আসত চৌধুরীবাড়ির নাচমহলের আসরে।

কিন্তু চৌধুরীরা এখানকার পাট চুকিয়ে কলকাতা চলে গিয়েছে বহুবছর হল। তারপর থেকেই গ্রামটা আস্তে আস্তে শ্মশান হয়ে যাচ্ছে।

এখন গ্রামে সাকুল্যে ত্রিশ ঘর লোক বাস করে। অধিকাংশই দিন আনে দিন খায়। আর যারা একটু পয়সার মুখ দেখে, চলে যায় চুঁচুড়া বা চন্দননগরের দিকে। এইভাবেই গত অর্ধশতকে বদনপুর প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু একটা মানুষ শতকষ্টেও বদনপুর ছাড়ার কথা ভাবতে পারে না।

সে হল চণ্ডী মন্দিরের বংশপরম্পরায় পুরোহিত কানু চক্রবর্তী। প্রায় ছয় প্রজন্ম ধরে কানু চক্রবর্তীর পরিবার চণ্ডী মন্দিরের পুজো করে আসছে। চৌধুরীরা গ্রামে থাকাকালীন তারাই এই মন্দিরের সেবাইত ছিল, তাদেরই বেতনভুক পুরোহিত হিসেবে কানু চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষরা চণ্ডী মন্দির দেখভাল করত।

কিন্তু এখন আর ওসবের কোনো পাট নেই। কানু চক্রবর্তী নিজেও ওসবের পরোয়া করেনা। সে একটু খ্যাপাটে গোছের লোক, বিয়ে থা করেনি। বয়স ষাটের ঘরে হলেও খিটখিটে স্বভাবের জন্য তাকে আরও অনেক বেশি বয়স্ক দেখায়। মন্দির থেকে কয়েক গজ হাঁটা পথে তার বাপঠাকুরদার আমলের একচিলতে কুঁড়েঘর। সেখানে অবশ্য সে শুধু রাতটুকু থাকে। দিনের বাকি সময়টা পুরোটাই সে কাটায় চণ্ডী মন্দিরে আর নদীর ধারে। সপ্তাহে শুধু একদিন ঢোকে গ্রামের ভেতরে। গরিবগুর্বো মানুষরা এই 'ক্ষ্যাপা পুরুত'কে চালডাল যেটুকু সামান্য পারে, দেয়। কানু চক্রবর্তী একাহারী, ওতেই হয়ে যায়।

সবসময় সপ্তমে চড়ে থাকে তার মেজাজ। গ্রামের লোকেরা তার সেই তিরিক্ষি মেজাজের ভয়ে পারতপক্ষে এদিকে আসেনা, দুষ্টু ছেলেছোকরারা কেউ কখনো এসে চণ্ডী মন্দির তল্লাটে খেলতে চেষ্টা করলে চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে অকথ্য গালাগালি করে তাদের পালাতে বাধ্য করে কানু চক্রবর্তী।

গ্রামের লোকেরাও তাই তাকে ঘাঁটায় না। একেই সব দীনদরিদ্র, রোজ মন্দিরে আসার সময় কোথায়? তার ওপর নামেই চণ্ডী মন্দির, এতকালের অযত্নে যেন পোড়োবাড়িতে পরিণত হয়েছে মন্দিরটা। পাশেই সরু নদী, সেই নদীর হাওয়া গায়ে মেখে এক প্রাচীন আত্মার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

গোটা চত্বরটাই যেন কেমন ভূতুড়ে!

গ্রামের সবাই জানে, কানু চক্রবর্তী মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই মন্দিরও মরে যাবে।

কানু চক্রবর্তী নিজের মনেই থাকে। ভোরবেলা উঠেই সে চলে আসে মন্দিরে। তারপরের কয়েকঘণ্টা ধরে চলে পুজোর আয়োজন, উপাচার। সে নিজেই পূজারি, নিজেই দর্শক, নিজেই ভক্ত। প্রায়ান্ধকার গর্ভগৃহে একাকী ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে সে কী করে জানে!

দিনান্তে সব মিটে গেলে কিছু মুখে দেয়, তারপর চুপচাপ গিয়ে বসে থাকে নদীর পাড়ে।

গ্রামের সবাই নদী বলে বটে, আসলে এটা একটা খাল। গঙ্গা থেকে পশ্চিমমুখে বয়ে এসেছে। তবে গভীর, গ্রীষ্মকালেও বেশ জল থাকে। খালের একটা দিক আবার গিয়ে মিশেছে রুগণ সরস্বতী নদীতে।

সূর্য পশ্চিমে ধীরে ধীরে হেলতে থাকে, পাখিরা ক্লান্ত দেহে ঝাঁক বেঁধে ফেরে বাসায়, কানু চক্রবর্তী একা উদাস মুখে বসে থাকে। বসে বসে সে কী যে ভাবে! তার কাঁচাপাকা দাড়ি নেমে এসেছে গলার নীচ পর্যন্ত, ঘাড় পর্যন্ত চুল আর সাদা ধুতি ফতুয়ায় তাকে কেমন যেন অরণ্যের প্রাচীন ঋষি বলে মনে হয়। তারপর একসময় ঝুপ করে নেমে আসে সন্ধ্যা। অন্ধকার গভীর হলে কানু চক্রবর্তী ধীর পায়ে ফিরে যায় নিজের বাসস্থানে। তার চোখদুটো তখন থাকে অন্যমনস্ক।

সেদিনও সে এইভাবে বসে ছিল নদীর চরে। বসে বসে কত কী ভাবছিল। তার গোটা শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিতে উজ্জ্বলভাবে রয়েছে গ্রামের আলোকিত ছবি। চৌধুরীবাড়ির দুর্গাপুজো, নদীর চরে মায়ের বিসর্জন, নানারকমের পুজোপার্বণ।

সব মুছে গিয়েছে। শুধু সে একা বেঁচে রয়েছে অতীতের গৌরবের জীবাশ্ম হয়ে। হাজার ঘটনা বুকে চেপে। তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে মুছে যাবে সেইসব স্মৃতি। বিলুপ্ত হয়ে যাবে অনেক ঘটনা।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কাতড়ানোর শব্দে বর্তমানে ফিরে এসেছিল কানু চক্রবর্তী। এই নির্জন নদীর চরে হঠাৎই যেন শুনতে পেয়েছিল কারুর গুমড়নোর আওয়াজ।

একটু খুঁজতেই দেখতে পেয়েছিল ছেলেটাকে। চরের কাদামাটিতে মাখামাখি হয়ে পড়েছিল সে। চোখ প্রায় দেখা যাচ্ছিল না। পাড়ের লাল পিঁপড়েগুলো কামড়ে সে'দুটোকে ফুলে ঢোল করে দিয়েছে। হাতপায়ে ছড়ে যাওয়ার অজস্র দাগ।

প্রচণ্ড জ্বরে ছেলেটা বেহুঁশ, ওই অবস্থাতেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে যন্ত্রনার গোঙানি।

কান পেতে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলে বোঝা যায়।

"উঃ মাগো কী কষ্ট! ... ওকে ছেড়ে দাও ... বাইরে ... বাইরে চলে যাওয়াই ভাল ... আহ! লাগছে ... আমাকে ছাড়ো!"

কানু চক্রবর্তী কোনোমতে টেনে হিঁচড়ে ছেলেটাকে সরিয়ে আনতে যেতেই থমকে গিয়েছিল।

ছেলেটার ঘাড়ের কাছটায় দগদগে ঘা, অনেকটা জায়গা যেন খুবলে খেয়েছে কোনো বন্য জন্তু! রক্ত আর মাংস ডেলা পাকিয়ে আছে সেখানটায়।

কানু চক্রবর্তী সাময়িক থমকালেও অবাক হয়নি।

কারণ কাদায় মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকলেও ছেলেটার মুণ্ডিত মস্তক ও পেছনের লম্বা টিকিটা ততক্ষণে ওর চোখে পড়ে গিয়েছিল।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ। একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে এদিকে। চারপাশের সবুজ গাছপালা, শস্যখেত ভিজে গিয়ে ঝকঝক করছে। ভিজে মাটিতে সোঁদা গন্ধ। পাখির কিচিরমিচির। বাগডাঙা গ্রামের হাট, বসতি এলাকা একটু দূরে। এদিকটা শুধুই বিঘের পর বিঘে খেত। তারই মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সরলাশ্রম। নিস্তব্ধ, নীরব হয়ে।

রুদ্র গাড়ি থেকে নেমে সোজা এগিয়ে গেল আশ্রমটার দিকে। সঙ্গে এসেছেন লোকেশ ব্যানার্জি আর জয়ন্ত। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে আল বরাবর হাঁটছিল ওঁরা।

আগেরদিন গাড়ির শব্দ পেয়েই যেমন বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন সেই ভর্তৃহরি মহারাজ, আজ তেমন কেউ এল না। বাইরে একটা সাধারণ কচি বাঁশ দিয়ে তৈরি করা গেট। রুদ্ররা সেটা খুলে ঢুকল আশ্রমের মধ্যে।

আগেরদিন সামনের দালান দিয়ে মাঝে মাঝেই হেঁটে যাচ্ছিল ধুতি ফতুয়া পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক আবাসিক ছাত্ররা। আজ তারাও কেউ নেই।

জয়ন্ত ফিসফিস করল, "কোনদিকে যাবেন ম্যাডাম?"

রুদ্র উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল সেইদিকে, যেদিকে আগের দিন ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন মহারাজ। চাতাল পেরিয়ে সেই উপাসনাগৃহ। কিন্তু বাইরে বড় তালা ঝুলছে।

"ভাঙব?" জয়ন্ত বলল।

"না।" রুদ্র চাপাস্বরে বলল। ওয়্যারান্ট ছাড়া এভাবে প্রাইভেট প্রপার্টি ভেঙে ঢুকে সার্চ করা যায় না, সেটা আইনবহির্ভূত। ও ভেতরে ঢোকার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে গোটা আশ্রমটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

আশ্রমের আয়তন খুব বড় না হলেও ভেতরে বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে। একদিকে উপাসনাঘর, অন্যদিকে দুটো ছোট ছোট একতলা বাড়ি। বোধ হয় ছাত্রদের থাকার আবাস। মাঝখানটা বেশ কিছুটা খোলা জায়গা, তাতে বেশ যত্ন করে ফুলের চাষ করা হয়েছে।

"অদ্ভুত ব্যাপার!" লোকেশবাবু বললেন, "গোটা আশ্রম পড়ে রয়েছে, সব গেল কোথায়?"

আশ্রমের একেবারে পেছনদিকে চলে গেল রুদ্র। সেদিকে একটা ঘাট। সামনে সরু একটা খাল।

"এই খালটা কোথায় গিয়ে মিশেছে?" রুদ্র জিজ্ঞেস করল।

"কী জানি, বুঝতে পারছি না।" জয়ন্ত ঠোঁট উলটোল। দশমিনিটের মধ্যে ও আশ্রমের বাইরে গিয়ে রাস্তায় পৌঁছে একটা স্থানীয় লোককে ডেকে আনল।

রুদ্র তখন হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে ঘাটে। ঘাটটা বাঁধানো হলেও বেশ ভগ্নদশা। সিঁড়ির ধাপের ওপর আশপাশের নারকেল গাছের ডালপালা পড়ে রয়েছে।

প্রায় আটটা ধাপের পর ছলাত ছলাত এসে পড়ছে খালের জল।

স্থানীয় লোকটির নাম পরেশ। সে বাগডাঙা হাটের দিকে থাকে।

রুদ্রর প্রশ্নের উত্তরে বলল, "এই আশ্রম অনেক পুরোনো দিদিমণি। তা প্রায় বছর পঁচিশ তো হবেই। কিন্তু আমরা বিশেষ আসি না। আসলে আশ্রমের সন্ন্যাসীরা কারুর সঙ্গে মেশেন না। নিজেদের মতো থাকেন।"

"বাইরে থেকে যারা আসেন, তাঁরা?"

পরেশ হকচকিয়ে বলল, "সবাই তো আশ্রমের নৌকোতে করেই আসেন, দিদি। খুব কমই গাড়িতে করে আসেন।"

"আশ্রমের নৌকো?" রুদ্র ভ্রূ কুঁচকে বলল, "কোথায় সেই নৌকো?"

পরেশ আঙুল তুলে বলল, "এখানেই বাঁধা থাকে। আজ তো দেখছি না।"

"এই খাল কোথায় গিয়েছে?"

"আজ্ঞে, এঁকেবেঁকে অনেকটা গিয়েছে, তারপর গিয়ে মিশেছে সরস্বতী নদীর সঙ্গে। সেই নদীও এখন সরু, অ্যাত্তটুকুন।" লোকটা হাত দিয়ে দেখাল, "সেই সরস্বতী বরাবর গেলেই গঙ্গা।"

"গঙ্গা!" বিড়বিড় করল রুদ্র। তারপর বলল, "এদিক থেকে সুগন্ধা কতদূর?"

"সুগন্ধা?" লোকটা মাথা চুলকোল, "বলতে পারব না দিদি। এদিক থেকে পুবদিক বরাবর গেলে পরপর অনেকগুলো গ্রাম পড়বে। জারুরা, ভুশনারা, বদনপুর ...।"

লোকেশবাবু রুদ্রর দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকাতেই রুদ্র চোখের ইশারায় চুপ করতে বলল।

২৮

নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণগ্রাহী যুবাপুরুষ। তিনি নিজে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত, সুযোদ্ধা এবং সংগীতজ্ঞ। মুঘল সম্রাট আকবরের মতো তাঁর রাজসভাতেও নবরত্নের সমাহার।

নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ, পণ্ডিত গোস্বামীপাদ গোপালকৃষ্ণ বিদ্যাবাচস্পতি, কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, হরিরাম তর্কালঙ্কার ছাড়াও তাঁর রাজসভার শোভাবর্ধন করে থাকেন কালীভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। এছাড়া ছায়ার মতো সভা আলোকিত করেন ঘূর্ণি গ্রামের গোপাল চন্দ্র ভণ্ড।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দ্বৈত চরিত্রের সমাহার। একদিকে তিনি প্রজাবৎসল, বিদ্যা ও শিল্পকলার পরম পৃষ্ঠপোষক, সমগ্র রাঢ়বাংলার অসংখ্য পণ্ডিত তাঁর বৃত্তিভোগী। অন্যদিকে তিনি অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী, কূটকৌশলী ও আদিরসাত্মক রচনায় উদগ্রীব। নৈতিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে কারুর সম্পত্তি গ্রাসে তাঁর হৃদয় কাঁপে না। অন্নদামঙ্গলের মতো অনন্য রচনার পর তাঁরই প্ররোচনায় ভারতচন্দ্র লিখেছেন বিদ্যাসুন্দর। যার ছত্রে ছত্রে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি আহত করেছে পাঠককুলকে।

আজ কৃষ্ণচন্দ্রের আয়োজিত সুবিশাল বাজপেয় যজ্ঞের অন্তিম দিবস। বিদেশের সমস্ত স্বনামধন্য পণ্ডিতদের উপযুক্ত পারিতোষিকসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করানো হচ্ছে। তাঁর যজ্ঞ সার্থক হয়েছে। যজ্ঞের আয়োজনে হৃষ্টচিত্ত হয়ে তামাম পণ্ডিতকুল তাঁকে ভূষিত করেছেন বহুকাঙ্ক্ষিত ও অতিসম্মানীয় উপাধি 'অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী'তে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো অজ্ঞাত কারণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিমর্ষ চিত্তে বসেছিলেন নিজের রাজসভায়। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ঝড়ে পড়ছিল হতাশা।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার দুটি ভাগ। প্রথমার্ধে তিনি শুধুই রাজকার্যে ব্যস্ত থাকেন। থাকেন মন্ত্রী, দেওয়ান, সেনাপতি ও অন্যান্য অমাত্যরা। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শোনা, আদেশনামা জারি করা, দলিলে স্বাক্ষর করা এইসব প্রশাসনিক কাজ চলে। সেইসব কাজ সমাপ্ত হলে একদণ্ডের বিরতি। রাজা তখন পার্শ্ববর্তী কক্ষে প্রাতঃরাশ সারেন। প্রশাসনিক কর্মচারীরা প্রস্থান করেন, আগমন হয় পণ্ডিত, সংগীতজ্ঞ ও কবিদের।

আজ অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধে রাজসভা প্রায় জনশূন্য। সভাসদরা সকলেই গিয়েছেন বাজপেয় যজ্ঞে অভ্যাগতদের বিদায় জানাতে। কয়েকদিন সভা বন্ধ থাকার পর আজই খুলেছে, কাজ বিশেষ নেই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, পণ্ডিত শঙ্কর তর্কবাগীশ, কবি বাণেশ্বর বিদ্যালংকার ও রামপ্রসাদ ছাড়া কেউ নেই সভায়। তিনজনে আলোচনা করছিলেন যজ্ঞ উপলক্ষ্যে সংঘটিত হওয়া সাম্প্রতিক নানা শাস্ত্রবিচার সম্পর্কে।

কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ যদিও ম্লান। কাশী, মিথিলা, কান্যকুব্জ, এমনকি সুদূর দ্রাবিড় থেকে বহু অর্থব্যয়ে তিনি একাধিক পণ্ডিতকে সমাদরে নিয়ে এসেছিলেন নবদ্বীপে। সমানে সমানে হওয়া তর্কযুদ্ধ দেখার বাসনায়।

কিন্তু তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ হয়নি বললেই চলে। যজ্ঞের প্রথম চারদিন সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু তাঁকে স্তম্ভিত করে পঞ্চম দিনে এসে প্রায় একশো ছাত্র নিয়ে উপস্থিত

হয়েছিলেন ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। বিনা আমন্ত্রণে আগমনে রাজা প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেও সৌজন্যবশত তিনি আতিথেয়তা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন পণ্ডিতের আহারাদি-বাসস্থানেরও। রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে দুটি বিশাল ইমারত গড়ে তোলা হয়েছে পণ্ডিতদের জন্য। সেখানে আরো একজন পণ্ডিতের ব্যবস্থা করা একেবারেই কঠিন নয়।

কিন্তু রোমশ পণ্ডিত সেসবের ধার মাড়াননি। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে কোনরকম বাক্যবিনিময় না করে তিনি সটান উপনীত হয়েছিলেন শাস্ত্রবিচার মণ্ডপে। স্মৃতি থেকে ন্যায়, বেদান্ত থেকে অদ্বৈতবাদ, সভামণ্ডপে একের পর এক অনুষ্ঠিত হওয়া তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতে শুরু করেছিলেন দেশ বিদেশের সমস্ত পণ্ডিতকে। জগন্নাথতোড়ে ভেসে গিয়েছিলেন আসমুদ্রহিমাচলের সব পণ্ডিত।

তাঁর পাণ্ডিত্যপ্রতিভার সামনে, অবিশ্বাস্য স্মৃতিশক্তির সামনে কেউ সেভাবে দাঁড়াতেই পারেননি। দর্শকমণ্ডলী পর্যন্ত ক্রমাগত জগন্নাথ পণ্ডিতের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

এখানেই শেষ নয়। দিনান্তে কৃষ্ণচন্দ্র আবার গলবস্ত্রে আতিথেয়তা গ্রহণ করার অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিলেন। অন্তর থেকে সেই ইচ্ছা না থাকলেও লোকনিন্দার ভয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সামনে উপস্থিত হয়ে তিনি বলেছিলেন অনেক কায়ক্লেশে বাজপেয় যজ্ঞ করছেন, পণ্ডিতও তাতে যোগদান করলে রাজা আহ্লাদিত হবেন।

আর তখন পণ্ডিত কী বললেন?

ভাবলেই এখনো শরীরে রক্তসঞ্চালন দ্রুত হয়ে উঠছে কৃষ্ণচন্দ্রের। নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। স্তম্ভিত হচ্ছেন একজন ব্রাহ্মণের ঔদ্ধত্যে।

জগন্নাথ পণ্ডিত প্রকাশ্য সভায় রাজার কাতর অনুরোধে শ্লেষসূচক হেসে বলেছিলেন, ”বাজপেয় যজ্ঞ? হাসালেন রাজা। যে যজ্ঞে স্বয়ং জগন্নাথ রবাহূত, সে আবার কীসের যজ্ঞ?”

কথাটা বলে সদর্পে প্রস্থান করেছিলেন রাজমণ্ডপ থেকে। অদূরে কোন এক ব্রাহ্মণ আবাসে তিনি নিজেই সশিষ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তারপর যজ্ঞের অবশিষ্ট প্রতিটি দিন এসেছেন, সমস্ত অতিথি পণ্ডিতের দর্পচূর্ণ করেছেন, আবার ফিরে গিয়েছেন।

এইভাবে গোটা যজ্ঞের পরিবেশ পণ্ড করার পর অবশেষে জগন্নাথ পণ্ডিত কাল নদীয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়ে গিয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মান। এক কলসি দুগ্ধে একফোঁটা গোমূত্রের মতোই।

এত দম্ভ? এত দার্ঢ্য? কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং নদীয়াধিপতি, হিন্দুকুলপতি, শাস্ত্রচূড়ামণি তাঁর প্রতি কোনো সম্মান প্রদর্শন নেই?

পণ্ডিত শঙ্কর তর্কবাগীশ বললেন, "আর বিমর্ষ হয়ে থাকবেন না রাজামশাই। অতিথিরা একে একে প্রস্থান করছেন, তাঁদের বিদায় সম্ভাষণ করার জন্য আপনার সেখানে উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন। অন্যথায় বড় দৃষ্টিকটু দেখায়।"

কৃষ্ণচন্দ্র রক্তাভ চোখে তাকালেন। এখনো অবধি এই প্রসঙ্গে সভাসদদের সকলেই তাঁকে সমর্থন করেছেন, একযোগ হয়ে প্রত্যেকে নিন্দা করেছেন তর্কপঞ্চাননের এই মাত্রাহীন ঔদ্ধত্যের।

ব্যতিক্রম শুধু একজন। রামপ্রসাদ সেন একটি মাত্রও কথা বলেননি। সেই কারণটিও তাঁর জানা।

রাজা ব্যাঙ্গাত্মক হেসে বললেন, "আপনারা সবাই যতই সমালোচনা করুন, সাধক রামপ্রসাদ যে কিছুতেই রোমশ পণ্ডিতের সমালোচনা নিতে পারেন না! তাই তিনি মৌন। তাঁর কালী মায়ের গাত্রবর্ণের সঙ্গে পণ্ডিতের বড় মিল কিনা, হা হা!"

রামপ্রসাদ কী যেন ভাবছিলেন। রাজার কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বললেন, "না তা নয়, রাজামশায়। তবে এটা তো মানবেন, জগন্নাথ পণ্ডিত একাই বাংলার মান রক্ষা করল। নাহলে আমাদের রাঢ়বাংলার পণ্ডিতরা তো বিদেশিদের যুক্তির সামনে দাঁড়াতেই পারছিলেন না! আমার মনে হয়, আপনি আর উনি, দুজনেই সমান বিদ্বান, নিজেদের মধ্যে আর এমন কলহ করে আমাদের বেদনার উদ্রেক করবেন না।"

"তুমি ভোলাভালা মানুষ, রামপ্রসাদ!" কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বলে উঠলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জন্য তাঁর সেই হেনস্থার কথা তিনি এখনো বিস্মৃত হননি। উষ্মাভরা কণ্ঠে বললেন, "ত্রিবেণীর জগন্নাথ পণ্ডিত অত সোজা মানুষ নয়। সে রাজার যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না পাওয়ার অপমান এত সহজে ভুলবে বলে মনে হয় না। দেখবে, এর প্রতিশোধ সে নেবেই!"

"প্রতিশোধ?" শঙ্কর তর্কবাগীশ ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, "নদীয়াধিপতির প্রতি?"

"অসম্ভব কিছু নয়।" বাণেশ্বর স্বগতোক্তি করলেন, "ইংরেজরা বলুন কিংবা মুর্শিদাবাদের নবাব সকলেই তর্কপঞ্চাননের পরম অনুরাগী। তার ওপর মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নন্দকুমার জগন্নাথ পণ্ডিতের পরম সুহৃদ। আর নবাব নিজে নন্দকুমারের কথায় অন্ধ আস্থা রাখেন। ক্ষতি করতে চাইলে রোমশ পণ্ডিতকে খুব একটা বেগ পেতে হবে না।"

২৯

লোকেশবাবু সামান্য ইতস্তত করে বললেন, "ম্যাডাম, আমাকে এক সপ্তাহ ছুটি দিতে হবে।"

রুদ্র সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল। ওদের গাড়ি প্রায় দেড়ঘণ্টা ছোটার পর এখন বদনপুরের কাছাকাছি এসে গিয়েছে।

চুঁচুড়া মহকুমার পোলবা দাদপুর ব্লকের এক প্রত্যন্ত গ্রাম বদনপুর। অজ পাড়া গাঁ বললেও অত্যুক্তি হয়না। গ্রামে ঢুকতে ঢুকতে রুদ্র অবাক হয়ে ভাবছিল, সরকারের এত ধরনের প্রকল্পের পরেও এখনো এত মাটির বাড়ি এই গ্রামে?

একদিকে যতদূর চোখ যায়, সবুজ চোখ জুড়নো খেত। অন্যদিকে ছোটবেলায় আঁকা ছবির মতো মাটির কুঁড়েঘর, বড় বড় নারকেল গাছ। গরু ছাগলের নির্বিচারে আনাগোনা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে।

লোকেশবাবুর কথায় রুদ্র ঘাড় ঘোরাল। বলল, "এক সপ্তাহ! এই ডেলিকেট সময়ে? কী ব্যাপার, লোকেশবাবু? বাড়িতে সব ঠিক আছে তো?"

জয়ন্ত একদিন কথায় কথায় বলেছিল, লোকেশবাবুর স্ত্রী ক্যানসার আক্রান্ত। নিঃসন্তান দম্পতি। লোকেশবাবুকে প্রায়ই স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ছুটি নিতে হয়।

কিন্তু লোকেশবাবু একদিকে ঘাড় হেলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। আসলে সামনের সপ্তাহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। আমরা বৈষ্ণব, এইসময়টা মায়াপুরে যাই। খুব ধুমধাম করে পালন হয় ওখানে। তিনদিন ধরে উৎসব চলে। আমরা গোটা সময়টায় ওখানে ভলান্টারি সার্ভিস দিই।"

রুদ্র কিছু বলার আগেই প্রিয়াঙ্কা ঈষৎ প্রগলভ সুরে বলল, "আচ্ছা লোকেশদা, কী হয় এইসময় মায়াপুরে? সবাই মিলে দু-হাত তুলে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে করে নেচে বেড়ান?"

লোকেশবাবু বিরক্তস্বরে বললেন, "নেচে বেড়াব কেন? জন্মাষ্টমীতে ওখানে অনেকরকম অনুষ্ঠান হয়। সারা পৃথিবী থেকে ভক্তরা আসেন। কোনোদিনও তো যাওনি, একবার গেলে বারবার যেতে ইচ্ছে করবে। শুধু জন্মাষ্টমী কেন, দোলপূর্ণিমা, রথযাত্রা। দোলে তো একবার আমার সঙ্গে এস পি সাহেবের দেখা হয়েছিল, জানো।"

প্রিয়াঙ্কা বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। এস পি সাহেব ওখানকার কমিটিতেও আছেন। উনি তো খুব বনেদি বংশের ছেলে।" লোকেশবাবু বলে চলেছিলেন, "নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা ডোনেট করেন। একেবারে প্রথম সারিতে বসেছিলেন। আমি আর ডাকিনি। একবার তো যেতে পারো ঘুরতে। বাড়ির এত কাছে।"

"আচ্ছা, সে না হয় যাব।" প্রিয়াঙ্কা বলল, "আপনি আগে বলুন না, কী হয় ওখানে? খুব জানতে ইচ্ছে করছে।"

লোকেশবাবু এবার একটু নরম গলায় বললেন, "তিনদিন ধরে উৎসব চলে। জন্মাষ্টমীর আগের দিনকে বলা হয় অধিবাস, পরের দিনটা নন্দোৎসব। প্রথমদিন কীর্তনমেলা চলে, তারপর মধ্যরাতে রাধামাধব মন্দিরে মহা অভিষেক হয়। জন্মাষ্টমীর দিন ভোর থেকে একে একে চলে মঙ্গল আরতি, নানারকম যজ্ঞ, ভজন কীর্তন। তারপর অনুকল্প প্রসাদ বিতরণ। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। হাজার হাজার লোক একসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম করছে, ভজন করছে, বিশাল চত্বরে একসঙ্গে খাচ্ছে। এত ভালো লাগে! গায়ে কাঁটা দেয়। ওই যে খুন হলেন ড. সুবল ভট্টাচার্য, উনি তো প্রতিবছর থাকতেন, মহারাজদের সঙ্গে মিলে সব তদারক করতেন। তোমার বউদি তো অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রতিবছর ছোটেন, মনটা এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে যায়।"

রুদ্র এবার মাঝপথে গলাখাঁকারি দিল, "বদনপুর ঢুকে গেছি। মন্দিরটা কোনদিকে লোকেশবাবু? পাঁচুকে একটু গাইড করুন।"

পরম বৈষ্ণব লোকেশবাবু মায়াপুরের উৎসবের কথা বলতে বলতে কেমন ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ আদেশে একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "সোজা গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। একেবারে শেষ প্রান্তে, নদীর ধারে।"

মন্দিরের সামনে গাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়ানো মাত্র একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। পরনে ধুতি, ফতুয়া। কাঁচাপাকা দাড়ি গলা ছাড়িয়ে প্রায় বুক পর্যন্ত নেমেছে। মাথার চুলও সাদা। রোগাটে গড়ন। কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে জরিপ করার চেষ্টা করলেন রুদ্রদের।

লোকেশবাবু চাপাগলায় বললেন, "ইনি মন্দিরের পূজারি। কী যেন চক্রবর্তী নাম। পল্টু বলে গ্রামের একটা ছেলে তারেকের ছবি দেখে চিনতে পেরেছিল, তারপর সে-ই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল।"

"পল্টুকে আসতে বলুন এখানে।" চাপা গলায় বলল রুদ্র।

লোকেশ বাবু বললেন, "বলেছিলাম। কিন্তু সে এখন শহরে গেছে কাজ করতে।"

"আমার নাম কানু চক্রবর্তী।" গম্ভীর কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ।

রুদ্র বলল, "আপনি কি এখানেই একাই থাকেন?"

"হ্যাঁ।" কিছুটা রুক্ষস্বরে বললেন কানু চক্রবর্তী, "আমি তো আগের দিনও বলেছি, পল্টু যখন নিয়ে এল ওঁকে। সেই ছেলেটা কয়েকদিন এই মন্দিরে ছিল, তা প্রায় দু'বছর আগে। তারপর একদিন হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায়। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।"

রুদ্র বলল, "এই মন্দিরটা কতদিনের পুরোনো?"

এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে কানু চক্রবর্তী কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে কথার খেই হারিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, "একশো বছরের বেশিই হবে। এই গ্রামের জমিদার চৌধুরীরা বানিয়েছিল।"

রুদ্র সামান্য ঘাড় নেড়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। চারপাশে জঙ্গল, আগাছায় ভরতি। রুদ্র জুতো খুলে উঠতে লাগল মন্দিরের সিঁড়িতে। সিঁড়ি অবশ্য নামেই, ধাপগুলো অযত্নে এতটাই ভেঙে গিয়েছে, আর ঝোপঝাড় এতই গজিয়েছে যে সাপখোপ থাকা বিচিত্র নয়।

কানু চক্রবর্তী আর লোকেশবাবু নীচে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। প্রিয়াঙ্কা রুদ্রর পেছন পেছন উঠে এসেছিল মন্দিরের ওপরে। গর্ভগৃহের ভিতরটা একেবারে অন্ধকার। বিগ্রহ বোঝা যাচ্ছে, তবে খুব অস্পষ্ট। রুদ্র চারপাশ জরিপ করতে করতে বলল, ”আপনি থাকেন কোথায়?”

”পাশেই।” কানু চক্রবর্তী এবারেও বিরস গলায় বললেন।

”পাশে বলতে?”

কানু চক্রবর্তী এবারে খুবই অনিচ্ছার ভঙ্গিতে হাত তুলে দূরের একটি কুঁড়েঘরের দিকে নির্দেশ করলেন।

”দু'বছর আগে হলেও আপনার নিশ্চয়ই ঘটনাটা মনে আছে।” রুদ্র পায়ে পায়ে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে, ”আরেকবার একটু বলুন না! ছেলেটি খুন হয়েছে।”

কানু চক্রবর্তীর চোখের পাতা একবার সামান্য কেঁপেই স্থির হয়ে গেল। বললেন, ”একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, ছেলেটা এই চাতালে ঘুমোচ্ছে। গা বেশ গরম। তিনদিন ওইভাবে ছিল। তারপর একদিন হাওয়া।”

লোকেশবাবু এবার একটু রুষ্টগলায় বললেন, ”আপনি পুরোটা কেন খুলে বলছেন না কানুবাবু? আগেরদিন তো পল্টু বলল, ছেলেটা এই সিঁড়িতে বসে কৃষ্ণনাম জপ করত। আর আপনি তাই নিয়ে রেগে যেতেন? বলতেন, চণ্ডী মন্দিরে বসে কৃষ্ণের নাম করা মহা পাপ?”

কানু চক্রবর্তী হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। বলল, ”অতদিন আগের কথা, আমার ভাল করে মনে নেই। পল্টুর যখন সব মনে আছে, তাকে গিয়েই জিজ্ঞেস করুন না। আমায় কেন করছেন?”

লোকেশবাবু পুলিশসুলভ ধমকানি দিলেন এবার, ”বেশি তড়পাবেন না একদম। পুলিশ কাকে কী জিজ্ঞেস করবে, তার জন্য কি আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি? যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, উত্তর দিন। নাহলে সোজা লক আপে পুরে দেব।”

”পুরে দিলে দিন। কানু চক্কোত্তি কোনো জেলখানা বা পুলিশকে ডরায় না।”

লোকটা ঝাঁঝিয়ে কথাগুলো বলল বটে, কিন্তু রুদ্র লক্ষ্য করল, তারপর কেমন যেন মিইয়ে গেল। শুকনো ঠোঁটটা কিছু দুর্বোধ্য শব্দ বিড়বিড় করতে লাগল। চোখদুটোও বুজে গেল ধীরে ধীরে।

লোকেশবাবু কড়াগলায় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রুদ্র ইশারায় থামিয়ে দিল। চুপচাপ ও ফিরে যেতে লাগল গাড়ির দিকে।

গাড়িতে উঠেই প্রিয়াঙ্কা উত্তেজিত গলায় বলল, ”ম্যাডাম, লোকটা বলল বটে একা থাকে, কিন্তু ...!”

”দেখেছি।” রুদ্র বলল, ”লোকেশবাবু, লোকাল থানার সঙ্গে কথা বলে এই কানু চক্রবর্তীর পেছনে লোক লাগান। ওরা সারাদিন ফলো আপ করুক। লোকটার সঙ্গে আরও

কেউ রয়েছে এখন। কানুবাবু তো ধুতি ফতুয়া পরেন দেখছি, কিন্তু ওর কুঁড়েঘরের সামনের তারে দুটো হাফপ্যান্ট ঝুলছে।”

৩০

জ্যোৎস্নাদি এসে খুব নীচুগলায় বলল, "দাদাবাবু, আজকের মাটনটা আমি রান্না করতে পারব না।"

প্রিয়ম বসার ঘরে বসে ল্যাপটপে অফিসের কাজ করছিল। রুদ্র বসে ছিল অদূরের বিশাল কাঠের টেবিল চেয়ারে। ওরও সামনে ল্যাপটপ। সেখানে খোলা পরপর খুনগুলোর বিবরণ। হাতে একটা ছোট নোটবুক আর পেন। সবে সকাল সাড়ে সাতটা। একটু পরেই দুজনে তৈরি হবে অফিসের জন্য।

জ্যোৎস্নাদি'র এত ম্রিয়মাণ গলায় ওরা অবাক হল না। মল্লিকাদি মারা যাওয়ার পর থেকেই জ্যোৎস্নাদি এমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। নীচে মল্লিকাদি আর ক্ষমার ঘরটা তারপর থেকে তালাবন্ধ রয়েছে। পুলিশি তরফে প্রথমে কিছুদিন সিল করা থাকলেও পরে খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু তবু ওই ঘরে পারতপক্ষে কেউ যায় না।

মল্লিকাদি আর ক্ষমা যেন এই বাড়িতে একটা অসম্পূর্ণ অধ্যায়। যা শেষ হওয়ার আগেই টেনে হিঁচড়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

প্রিয়ম মুখ তুলে বলল, "রান্না করতে পারবে না? কেন?"

জ্যোৎস্নাদি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ওর চোখদুটো ছলছল করছিল। তারপর বলল, "মল্লিকাদি কী ভালো পাঁঠার মাংসটা রাঁধত, বলুন? আমাদের মতো ফাঁকিবাজি করে বাজার থেকে কেনা গুঁড়ো মশলা দিয়ে নয়। বসে বসে ধৈর্য ধরে ধনে, জিরে বাটত, আদা, রসুন, সব। কী ভালো খেতে হত! আবার ভক্তি করে বলত, মহাপ্রসাদ! কেন কে জানে। রাঁধতে গেলে ওর মুখটা বড্ড মনে পড়বে। আমাকে রাঁধতে বলবেন না দাদাবাবু।"

প্রিয়ম কী বলতে যাচ্ছিল, রুদ্র বাধা দিয়ে বলল, "আচ্ছা বেশ। তোমাকে মাটন রান্না করতে হবে না। থাক, আমরা দুজনে মিলে করে নেব। ঠিক আছে? তুমি যাও, জ্যোৎস্নাদি।"

জ্যোৎস্নাদি যেতে উদ্যত হয়েও পেছন ফিরল। ধরা গলায় বলল, "কাল ওদের ঘরটা পরিষ্কার করতে ঢুকেছিলাম দিদিমণি। সেই জানলাটা, যেখান দিয়ে মল্লিকাদিকে ... এত কষ্ট হচ্ছিল! বেরিয়ে এলাম। ক্ষমাটাই বা কোথায় গেল? মল্লিকাদির খুনের কি কোনো কিনারা হবেনা, দিদিমণি?"

রুদ্র চুপ করে রইল। জ্যোৎস্নাদি বেরিয়ে যেতে কপালের দু'পাশের রগদুটো টিপে ধরল ও। মাথায় যেন কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এতগুলো বিষয় বিষাক্ত সাপের মতো কিলবিল করছে, যে ও কোনো খেই পাচ্ছে না।

প্রিয়ম বলল, "সত্যিই। মল্লিকাদি কে, ক্ষমা কে, কোথা থেকেই বা এসেছিল, কেনই বা এসেছিল, কেন ক্ষমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল, কেন মল্লিকাদি'কে খুন করা হল, কোনো

হদিশ নেই! এতগুলো দিন চলে এল, কোনো প্রোগ্রেসও নেই। কী করছে বলো তো তোমাদের ডিপার্টমেন্ট?"

"জানি না। এই কেসটা শ্রীরামপুর থানাকে দেওয়া হয়েছে।" ক্লান্তগলায় বলল রুদ্র।

প্রিয়ম মাথা নাড়ল, "নাহ, হুগলীর পুলিশ সত্যিই কোনো কম্মের নয়। এখন তো মনে হচ্ছে, মল্লিকাদি আর ক্ষমাও ওই আমীশ সমাজ না কী, তার বাংলা সংস্করণ।"

"মানে?" খাতা থেকে মুখ তুলল রুদ্র।

"তুমি নিজেই দ্যাখো না। আমীশ সমাজ নাকি সবসময় মধ্যযুগে বাস করে। মল্লিকাদি বা ক্ষমাও কি তাই নয়? ক্ষমা কখনো আজকালকার মেয়েদের নাম হয়? যখন মানুষ কন্যাসন্তান চাইত না, তখন এইসব নাম রাখত। আমার মায়ের মাসতুতো বোনের নাম সমাপ্তি। কেন? না, আগে তিনটে মেয়ে আছে, আর চাইনা ঠাকুর, এবার সমাপ্ত করো। তেমনই ইতি, ক্ষমা এইগুলো। চায়না বলে যে নামটা, সেটাও চাই না থেকে এসেছে।" প্রিয়ম বলে যাচ্ছিল, "তার ওপর, পাঁঠার মাংসকে মহাপ্রসাদ! আগেকার দিনের লোকেরা বলত শুনেছি। মা চণ্ডীর প্রসাদ, তাই মহাপ্রসাদ। বহু পুরোনো গল্প উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু এখন কে বলে ভাই? তারপর ওইটুকু মেয়ে মালা গাঁথছে, পুজো করছে, মা অতবড় ঘোমটা টানছে। কেমন সেকেলে ব্যাপার না? পার্থক্য এটাই যে, আমেরিকার আমীশরা সেইযুগের ঘোড়ার গাড়ি চড়ে, গাউন পরে, আর এরা দুশো বছর আগেকার বাংলার মতো রীতিনীতি পালন করে।"

রুদ্র বিস্ফারিত চোখে শুনছিল। প্রিয়ম থামতেই বলল, "ব্রিলিয়ান্ট! প্রিয়ম, ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট! সত্যিই তো! আমার তো একেবারে মাথায় আসেনি। আমি এদিক ওদিক ঘুরে মরছি। আমার বাড়িতেই দুজন রয়েছে। আড়াইশো-তিনশো বছর আগে বাঙালি আলু কী, তা জানত না। মল্লিকাদিও প্রথমদিকে আলু দেখে অবাক হত, জ্যোৎস্নাদি বলত। মল্লিকাদি'কে তির ছুঁড়ে মারা হয়েছে। সেটাও তো প্রাচীন পদ্ধতি!"

প্রিয়ম এবার অবাক, "তুমি কি সিরিয়াসলি নিলে নাকি? আমি তো মজা করছিলাম। অতগুলো খুনের সঙ্গে মল্লিকাদি'র খুনের কী সম্পর্ক? মল্লিকাদি তো কোনো ব্যবসাদার নয়।"

"ব্যবসাদার নয় তো কি হয়েছে!" রুদ্র উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করল, "ওরা সারাক্ষণ খুব ভয়ে থাকত। বিশেষ করে ক্ষমা। মাঝেমাঝেই বলত, ওকে কেউ ধরে নিয়ে যাবে। ওহ, কী করে এত বড় ক্ল্যু মিস করে গেলাম আমি! ক্ষমা যেদিন ভয় পেল? তারপরে পরেই আমায় বলেছিল, ও নাকি ওর ভাশুরপো'কে দেখে অত ভয় পেয়েছিল। ওকে নাকি ধরে নিয়ে যাবে। ইশ, আমি তখনো গুরুত্ব দিলাম না? আমার ... আমার এক্ষুনি রিজাইন করা উচিত। আমি এই চাকরির যোগ্যই নই।"

"সে তো যোগ্য নও বুঝলাম।" প্রিয়ম বলল, "কিন্তু ভাশুরপো মানে? ভাশুরপো মানে তো বরের দাদার ছেলে। তাহলে ভাশুরপো থাকতে গেলে তো আগে একটা বর থাকতে হবে। ওইটুকু মেয়ের বর কি করে হবে? গাঁজাখুরির কোনো সীমা নেই। কথাটা কি মল্লিকাদি বলেছে?"

"না। ক্ষমা বলেছে।" রুদ্র বলল, "বাংলার আমীশরা যদি দু-আড়াইশো বছর পিছিয়ে থাকে, তবে ন'দশবছরের মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়াটা কি খুব অ্যাবনর্মাল, প্রিয়ম? তখন তো ওইরকমই হত।"

"তাই তো! কিন্তু এখন তো আঠেরো বছরের নীচে বিয়ে দেওয়া অপরাধ। যদিও গ্রামের দিকে লুকিয়ে চুরিয়ে আকছার চলে এসব।" প্রিয়ম বলল, "তবে কি অত অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিল বলে ক্ষমা আর মল্লিকাদি পালিয়ে এসেছিল শহরে? ওদের গ্রাম কোথায়, আমরা তো এখনো জানি না!"

রুদ্র কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লোকেশ ব্যানার্জি ফোন করলেন।

"কী ব্যাপার, কেমন উৎসব করছেন মায়াপুরে?" রুদ্র জিজ্ঞেস করল।

"ভালো। এখন তো প্রস্তুতি চলছে ম্যাডাম, এখনো শুরু হয়নি। ম্যাডাম, একটা কথা জানানোর জন্য ফোন করছি। গত দুদিন ধরে আপনার আদেশমতো আমাদের ইনফর্মার মিন্টু কানু চক্রবর্তীকে চোখে চোখে রাখছিল। ও কয়েকটা ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন আমাকে ফোনে জানাল। আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। গত কয়েকদিন ধরে কানু চক্রবর্তীর সঙ্গে একটা ছেলে থাকছে। গ্রামের এক মহিলা দেখেছে, প্রথম দু'দিন ছেলেটা ধুতিফতুয়া পরেছিল। ন্যাড়া মাথা, পেছনে টিকি। তারপর থেকে সে গেঞ্জি প্যান্ট পরে থাকে। টিকি কেটে ফেলেছে। মাথায় অল্প চুল গজিয়েছে। চারদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা কানু চক্রবর্তীকে বদনপুর থেকে একটু দূরের এক বাজারে অল্পবয়সি ছেলের জামাপ্যান্ট কিনতে দেখা গেছে।"

"হুম।" রুদ্র বলল, "ছেলেটাকে কি মহিলা চিনতে পেরেছেন?"

"না।"

রুদ্র বলল, "ইমিডিয়েটলি ওই ছেলেটার সিকিউরিটির ব্যবস্থা করুন। ছেলেটার জীবন সংশয়ের মধ্যে রয়েছে।"

"আচ্ছা। তবে কানু চক্রবর্তী লোকটা ভালো, ম্যাডাম। লোকটার পাস্ট হিস্ট্রি বেশ ইন্টারেস্টিং।"

"কীরকম?"

লোকেশবাবু কিছু বলতে শুরু করলেন, কিন্তু পাশ থেকে বেশ জোরে খোলতাল সংকীর্তনের আওয়াজ ভেসে আসায় রুদ্র কিছু শুনতে পেল না। ও বলল, "একটু দূরে গিয়ে কথা বলুন, লোকেশবাবু। আমি কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছিনা।"

লোকেশবাবুর গলা আবার শোনা গেল মিনিট দুয়েক পর, "হ্যাঁ ম্যাডাম। বলছি, কানু চক্রবর্তী লোকটা একটু অদ্ভুত। ওর বাবা বদনপুর গ্রামের জমিদার চৌধুরীদের বাড়ি পুরোহিতের কাজ করত। চৌধুরীরা ছিল শক্তির উপাসক, মা চণ্ডীর সেবাইত। কিন্তু কানু ছোটবেলা থেকে ছিল কৃষ্ণভক্ত। এই নিয়ে বাড়িতে অনেক ঝামেলা হয়েছে। বাবা অসুস্থ হয়ে কোনো একদিন মন্দিরে পুজো করতে যেতে না পারলেও কিছুতেই একমাত্র ছেলে কানুকে রাজি করানো যেত না। দেবীর নাম শুনলেই কানু ক্ষেপে উঠত। বলতো, চণ্ডী আবার কিসের ঠাকুর? আর এই ব্যাপারে ওর এক সঙ্গী ছিল। সে ওই চৌধুরীবাড়িরই এক শরিকের ছেলে। দু'জনেই কৃষ্ণঠাকুরের ভক্ত ছিল।"

রুদ্র বলল, "কিন্তু এখন তো কানু চক্রবর্তী চণ্ডী মন্দিরেই পুজো করে!"

"পুরোটা শুনুন আগে, ম্যাডাম।" লোকেশবাবু বললেন, "চোদ্দো পনেরো বছর বয়সে কানু আর ওর সেই বন্ধুটা গ্রাম ছেড়ে পালায়। তারপরের কয়েক বছর তাদের আর কোনো খোঁজ ছিল না। চৌধুরীবাড়ি থেকে অনেক খোঁজখবর করেও পাওয়া যায়নি। ধীরে ধীরে সবাই হাল ছেড়ে দেয়।"

"তারপর?"

"কানু একা আবার গ্রামে ফিরে আসে আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে। ততদিনে তার বাবা মারা গিয়েছে। চৌধুরীরাও গ্রামের পাট চুকিয়ে চলে গিয়েছে শহরে। চণ্ডী মন্দিরটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে ছিল। কানু চক্রবর্তী এসে আবার পুজো আচ্চা শুরু করে। অদ্ভুতভাবে তার কৃষ্ণভক্তি উবে গিয়ে সে চণ্ডীর উপাসক হয়ে যায়। তারপর থেকে ওভাবেই আছে। যদিও গ্রামের কারুর সঙ্গে সেভাবে মেশে না।"

"তা কানু চক্রবর্তী লোকটা যে ভালো, সেটা আপনি কী করে বুঝলেন?"

লোকেশবাবু এবার একটু হেঁহেঁ করে বললেন, "না মানে ইয়ে, এককালে কৃষ্ণের ভক্ত ছিল, সে কি কখনো খারাপ হতে পারে? গ্রামের একজন নাকি একবার আমাদের এই মায়াপুরের মন্দিরে কানু চক্রবর্তীকে দেখতেও পেয়েছিল। পরনে পুরোদস্তুর সন্ন্যাসীর পোশাক ছিল। যদিও কানু চক্রবর্তী চিনেও না চেনার ভান করেছিল। পরে গ্রামে আসতে ওই কথা জিজ্ঞেস করতে লোকটাকে দূরদূর করে তাড়িয়েও দিয়েছিল।"

"আর কানুর ওই বন্ধু?"

"তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, ম্যাডাম।"

রুদ্র কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়ে ধরে রইল। এতগুলো বিচ্ছিন্ন বিষয় এত দ্রুতগতিতে চলে আসছে, যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আর প্রতিটা বিষয়ই একে অন্যের চেয়ে এত আলাদা, দিশেহারা লাগছে।

ও বলল, "চৌধুরীরা কলকাতার কোথায় থাকে, তার বিশদ জোগাড় করুন।"

লোকেশবাবু একটু কাঁচুমাচু গলায় বললেন, "এখনই? ম্যাডাম, এখন তো এখানে আছি, চারদিন পরেই পুজো। ফিরে করলে হবেনা?"

"না।" কঠিন গলায় বলল রুদ্র, "আপনাকে তো চলে এসে করতে বলছি না। লোক মারফত ফোনে খবর জোগাড় করতে বলছি। সেটুকু করুন অ্যাটলিস্ট! আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসে পৌঁছচ্ছি। ওখানেই জানান।"

৩১

অচ্যুত চলে যাওয়ার পর থেকে দ্বারিকা কেমন যেন পালটে গিয়েছে। আগে ও মেধার পরিচয় ততটা না দিলেও চতুষ্পাঠীতে সবাই ওকে খুব শান্ত ও বাধ্য ছাত্র বলে চিনত। যে কারণে বনমালী বা রাখহরির মতো পড়ুয়ারা থাকতেও শিক্ষকরা দ্বারিকাকে আলাদা করে পছন্দ করতেন।

কিন্তু দ্বারিকা এখন আর তাঁদের সেই পছন্দের তালিকায় নেই। দ্বারিকা অবাধ্য বা দুর্বিনীত না হলেও নিয়মিত পাঠঘরে উপস্থিত থাকে না। প্রায়ই সে অনুপস্থিত থেকে অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায়।

প্রথম প্রথম বংশীধর বা মধুসূদনের মতো তরুণ শিক্ষকেরা খেয়াল করেননি। কিন্তু যেদিন ধরতে পারলেন, সেদিন সদগোপদের দুজনকে পাঠালেন দ্বারিকাকে খুঁজে আনতে।

দ্বারিকা তখন বসেছিল জরা নদীর পাড়ে। মাথার ওপরে তপ্ত আকাশ। বসে বসে ভাবছিল, ও যেমন এই আকাশের নীচে বসে রয়েছে, অচ্যুতও তেমনই এই আকাশেরই নীচে কোথাও একটা রয়েছে।

'রয়েছে' তো এখনো?

নিশ্চয়ই রয়েছে। মনকে সাহস জোগাল দ্বারিকা। অচ্যুত তার বন্ধু, ভাবলেই গর্বে বুক ফুলে ওঠে এখন ওর। কালু কৈবর্তের গ্রাস থেকে পালানো মুখের কথা নয়।

আচ্ছা, অচ্যুত একবার কী একটা খাবারের নাম বলেছিল। আলো চালের মতো শুনতে। বলেছিল, যে কোনো তরকারিতে সেই সবজীটা নাকি দিয়ে খায় আধুনিক সমাজের মানুষরা। তাতে নাকি স্বাদই পালটে যায়। সেই সবজির চাষ এই বৈদিক সমাজে করা হয় না কেন?

আর অচ্যুত কী করে জানল? অচ্যুত কি তাহলে আগেও গিয়েছিল বাইরে? না শুনেছিল কারুর কাছে!

অচ্যুত কি এখন দিনরাত তাহলে ওই খাবারটা খাচ্ছে?

যতদিন যাচ্ছে, দ্বারিকারও বড় খেতে ইচ্ছা করছে। সমস্ত শৃঙ্খল ভয় সংকোচকে উপেক্ষা করে চলে যেতে ইচ্ছা করছে আধুনিক পৃথিবীতে, যেখানে গুরুদেবের মতে চলছে অকল্পনীয় অনাচার।

আধুনিক পৃথিবীতে না হয় অনাচার চলছে, কিন্তু ওদের এই সমাজে? এখানে যা চলছে, তা কি অনাচার নয়?

ওর পাশের বাড়ির বোন পুতুর বিয়ে দেওয়া হল বুড়ো গোপাল ব্যানার্জির সঙ্গে। তিন সতীনের সঙ্গে পুতু একমাথা সিঁদুর নিয়ে শুরু করেছে সংসার।

দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে সহবাস কি বিকৃতি নয়? শুধুমাত্র বর্ণের প্রেক্ষিতে কাজ ভাগ করে দেওয়াটাও কি অন্যায় নয়? কে বলতে পারে, কালু কৈবর্তের ঘরে এমন কোনো

ছেলে নেই, যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অসম্ভব মেধা? নিজের জাতের জন্য যে কোনোদিনই জানতে পারবে না নিজের প্রতিভা?

শিক্ষা বা অন্যান্য অধিকার জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য হবে না কেন?

দ্বারিকা বেশ বুঝতে পারে, ও ধীরে ধীরে অচ্যুতের মতো হয়ে যাচ্ছে। আগে যেমন অন্ধভাবে সবকিছু মেনে নিত, বিনা প্রশ্নে পালন করত অনুশাসন, এখন যেন তা হচ্ছে না। জলের মধ্যে বড় মাছ যেমন ঘাই মারে, সেভাবেই মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে হাজারো প্রশ্ন।

যেমন সেদিন। যদুহরি ঘোষালের বিধবা স্ত্রী সেই ক্ষমা বলে মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল গ্রামে। গোটা গ্রাম বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যদুহরি ঘোষালের ভাই কেষ্টহরি ঘোষালের ছেলেরা সেদিন সদর্পে বলছিল, ক্ষমার মা'কে নাকি হত্যা করা হয়েছে। মা হয়ে শ্মশানঘাট থেকে সতী হতে যাওয়া মেয়েকে নিয়ে পালানোর মতো জঘন্য পাপ যে করে, তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। ব্রজেন্দ্রদাদার মতোই।

ক্ষমা মেয়েটা পুরোপুরি পালটে গিয়েছে। এখন শ্বশুরবাড়িতেই থাকে। সাদা থান পরে। একবেলা খায়। ওর অত সুন্দর মেঘের মতো চুল নাকি কেটে দেওয়া হয়েছে। দ্বারিকার মা একদিন ভারী মুখে বলছিলেন।

যদুহরি ঘোষালের ভাই কেষ্টহরি ঘোষালের ছেলেরা সম্পর্কে জ্যাঠাইমা ক্ষমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তারা নাকি উঠে বসতে লাঞ্ছনা গঞ্জনায় অতিষ্ঠ করে তুলছে বাচ্চা মেয়েটিকে। যে বিধবা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে না গিয়ে পালায়, সে তো মহাপাপিষ্ঠা! তাকে ঘরে আশ্রয় দেওয়া মানে সংসারেরও অকল্যাণ। এমনকী ক্ষমার জন্মদাতা পিতা থাকোগোপালেরও তাই মত।

পরম গুরু জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নাকি ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁর লেখা বইয়ের রীতিনীতিই নাকি অনুসরণ করা হয় বৈদিক সমাজে। অন্তত বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্ররা তাই বলেন।

কিন্তু দ্বারিকার বিশ্বাস হয় না। সত্যিই কি পরম গুরু ওইসব লিখে গিয়েছিলেন? সত্যিই কি তাঁর লেখা গ্রন্থে ছিল স্বামীর প্রয়াণে স্ত্রীর সহমৃতা হওয়ার নির্দেশ?

এইবছরের মহোৎসবের দিন এগিয়ে আসছে দ্রুত। আর যত এগিয়ে আসছে, ওদের সমাজের প্রতিটি লোক যেন কেমন পালটে যাচ্ছে, লক্ষ্য করেছে দ্বারিকা। ওদের গ্রামের পুরুষদের মধ্যে থেকে বেশ কিছুজন করে একসঙ্গে উধাও হয়ে যাচ্ছে। ঘোষালবাড়ির তিন ছেলে, বাগচি বাড়ির চার ছেলেকে প্রায় দুইসপ্তাহ হয়ে গেল দেখেনি ও।

কী চলছে এখানে?

হঠাৎ একটা কর্কশ ডাকে দ্বারিকা চমকে পেছনে তাকাল। দেখল, দুজন বল্লমধারী প্রহরী ডাকছে তাকে। যেতে বলছে নারায়ণী চতুষ্পাঠীতে।

বিনাবাক্যবয়ে তাদের অনুসরণ করে নারায়ণী চতুষ্পাঠীতে গেল দ্বারিকা। গিয়ে অবাক হয়ে গেল। ওদের শ্রেণীর সব ছাত্র তো বটেই, বাকি শ্রেণীরও সব ছাত্র সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাতালের সামনে। সব মিলিয়ে প্রায় সত্তরজন।

ওকে সেই সারিতে ঢুকিয়ে দিয়েই ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেল দুই প্রহরী। দ্বারিকা এগিয়ে গিয়ে বনমালীকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কী হচ্ছে ভায়া?"

বনমালী তার স্বভাবসুলভ দাম্ভিক স্বরে উত্তর দিল, ”তুই অ্যাদ্দিন কোন গর্তে ঢুকে বসেছিলি দ্বারিকা? জানিস না, কাল বাদে পরশু মাহেন্দ্রমহোৎসব?”

”মহোৎসব জানি।” দ্বারিকা কিছু বুঝতে পারল না, কিন্তু শব্দটা যে ও আগে কোথাও শুনেছে সেটা মনে করতে পারল। বলল, ”মাহেন্দ্রমহোৎসব কী?”

বনমালীর পাশ থেকে ব্যাঙ্গের সুরে হাসল রাখহরি, ”কী ব্যাপার বল তো? তোর প্রাণসখার প্রাণবায়ু ফুরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই দেখছি, তুই যাও বা বেগুন ছিলি, এখনো একেবারে কানা বেগুন হয়ে উঠেছিস দ্বারিকা! গত চার পাঁচদিন তো মুখও দেখাসনি চতুষ্পাঠীতে!”

রাখহরির কথায় বনমালী তো বটেই, আশপাশের আরও দু-তিনটে ছেলে হেসে উঠল।

রাগে দ্বারিকার নাকের পাটা ফুলে উঠল। এরা সবাই ভেবেছে অচ্যুত মরে গিয়েছে। কিন্তু ও একেবারে নিশ্চিত, অচ্যুত বেঁচে রয়েছে। বেঁচে রয়েছে গুরুদেবের আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। জানাজানি হলে তা গুরুদেবের অপমান তো বটেই। তাই প্রচার করে দেওয়া হয়েছে, অচ্যুত মরে গেছে।

উহ! কী নিষ্ঠুর এরা!

দ্বারিকা সারির একেবারে পিছনে চলে গেল। আপাত নিরীহ গোছের এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করল, ”কী ব্যাপার রে? আমি তো ক'দিন আসতে পারিনি, তাই জানি না।”

ছাত্রটির নাম শ্রীহরি। চতুষ্পাঠীতে তার খ্যাতি মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী হিসেবে।

শ্রীহরি গড়গড় করে যান্ত্রিকভাবে বলে গেল, ”আমাদের বৈদিক সমাজের সবচেয়ে বড় কর্মকাণ্ডের দিন এই মাহেন্দ্রমহোৎসব। ওই দিনেই গুরুদেব আবির্ভূত হবেন কল্কি অবতার রূপে। গুরুদেবের মধ্যে সেদিন প্রকট হবেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, পরম গুরু ও প্রথম গুরু তিনজনেই। আর আমরা সবাই তাঁর হয়ে লড়াই করবো যুদ্ধক্ষেত্রে।”

**শ্রীকৃষ্ণ (ভগবান [illegible]

।

পরম গুরু (জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন)

।

প্রথম গুরু

।

বর্তমান গুরুদেব (কল্কি অবতার)

”যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই? মানে?” দ্বারিকা কিছু বুঝতে পারল না। কল্কি অবতার? অর্থাৎ যে অবতারের এখনো মর্ত্যে আগমন হয়নি?

দ্বারিকা দ্রুত রোমন্থন করতে চেষ্টা করছিল কিছুদিন আগে চতুষ্পাঠীতে বলা গুরুদেবের কথাগুলো।

"সত্যযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন চারজন অবতার। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ। ভালো করে লক্ষ করো, কীভাবে পৃথিবীর বিবর্তনের ক্রমবিকাশ মূর্ত করে তুলেছেন অবতাররা। প্রথম যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়, তার তিনভাগ জল ও একভাগ স্থলে প্রথম আবির্ভাব ঘটে জলচর প্রাণী মৎস্যের। তারপর জল ও স্থল, দুই স্থানেই প্রাণীর বসবাস শুরু হয়। তাই পরবর্তী অবতার কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপ। উভচর প্রাণী। তৃতীয় অবতার বরাহ, অর্থাৎ শূকর। তার মতোই জগতের প্রাণীরাও প্রধানত স্থলেই বসবাস করতে শেখে। সত্য যুগের চতুর্থ ও শেষ অবতার ছিলেন নৃসিংহ। পশু ও মানুষের সংমিশ্রণ। মানবজাতির পূর্বতন অবস্থাও ছিল পশুসুলভই। তখনো মানবদেহ পুরোপুরি পূর্ণতা পায়নি।"

দশাবতার
মৎস্য
কূর্ম
বরাহ
নৃসিংহ
বামন
পরশুরাম
রাম
বলরাম
কৃষ্ণ
কল্কি

"ত্রেতাযুগে প্রথমেই এলেন বামন। অর্থাৎ মানুষের ক্ষুদ্র বিকাশ। এরপর পরশুরাম। মানুষের আদিম পর্যায়। অরণ্যচারী মানুষ। এরপর রাম। সমাজ বিকাশের প্রথম উন্নত পর্যায়। সমাজ, গোষ্ঠী, রাজা, প্রজা ইত্যাদি। এরপর দ্বাপর যুগে অষ্টম অবতার কৃষ্ণ নিজরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিয়ে এলেন রাজনীতি। নবম অবতার বলরাম জ্ঞানী মানুষের প্রতীক। অবশেষে কলি যুগের একেবারে অন্তিমে আগমন ঘটবে কল্কি অবতারের। যার মধ্যে আধারিত থাকবে এমন এক প্রচণ্ড শক্তি যা হবে একইসঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টির ধারক ও বাহক। শেষ হবে কলিযুগ। শুরু হবে আবার সত্যযুগ।"

দ্বারিকার স্পষ্ট মনে পড়ছে গুরুদেবের সেদিনের বলা কথাগুলো। মনে পড়ছে, এরপরই বনমালী উঠে প্রশ্ন করেছিল, "কিন্তু আমরা তাঁকে কীভাবে চিনতে পারব, গুরুদেব?"

গুরুদেব তখন স্মিতমুখে বলেছিলেন, "ভাগবত পুরাণে স্পষ্ট লেখা রয়েছে। কলিযুগের অন্তিম ও সত্যযুগের প্রারম্ভের সন্ধিক্ষণে জন্ম নেবেন শ্রীকৃষ্ণের শেষ অবতার কল্কি। ওইসময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শাসক আসক্ত হবে অসততায়, শাসকরাই অধঃপতিত হয়ে নেমে আসবে সাধারণ ডাকাতের পর্যায়ে।

"গোটা পৃথিবী জুড়ে চলবে হত্যালীলা, দরিদ্র, নারী ও শিশুর প্রতি অকল্পনীয় অত্যাচার। সাধারণ মানুষের দুঃখ শোক ও ক্লেশের কোনো সীমা থাকবে না। দুষ্টরা হয়ে উঠবে দেশের রাজা, সৎরা হবে নির্যাতিত।

"কল্কি অবতার তখন আসবেন তাঁর বাহন পক্ষীরাজ দেবদত্তয় উড্ডীন হয়ে। তিনি সবাইকে বিনাশ করবেন। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে ধ্বংস হবে সবকিছু। সত্যযুগের পুনরারম্ভে বেঁচে থাকবে খুব কম সংখ্যক লোক, যারা সৎ ও ধার্মিক।"

দ্বারিকার মাথা ঝিমঝিম করছিল। ওদের এই বৈদিক সমাজের মুখ্য ব্যক্তি গুরুদেব নিজেই কল্কি অবতার? তিনি নিজে বিনাশ করবেন পৃথিবীর সব খারাপ মানুষদের? কলিযুগের অবসান ঘটিয়ে শুরু হবে সত্যযুগ?

তাহলে ওরা কে? কেনই বা এইভাবে জমায়েত হয়েছে সবাই ক্রীড়াঙ্গনে?

ও ফিসফিস করে শ্রীহরিকে জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কোথায় যাব রে?"

শ্রীহরি চোখ বন্ধ করে বলল, "সেই অভিশপ্ত পুণ্যধামে, যেখানে চলে যথেচ্ছ পাপলীলা। যেখানে কৃষ্ণের উপাসনা হলেও নিরন্তর চলে আধুনিক সভ্যতার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।"

জ্যোৎস্নাদি নিভে যাওয়া মুখে বলল, "এমা! আমি এত তরিবৎ করে বানালাম, দিদিমণি খাবে না?"

"না।" প্রিয়ম আরেকবার ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়িতে রাত পৌনে বারোটা। অফিস থেকে এসে রুদ্র একতলায় লাইব্রেরি ঘরে ঢুকেছে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। তারপর থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

জয়ন্ত আর ড্রাইভার পাঁচু এসেছিল চাবি রাখতে। বলছিল, আজ সারাদিন নাকি রুদ্র ত্রিবেণী থেকে বৈদ্যবাটী, চন্দননগর থেকে আদিসপ্তগ্রাম ছুটে বেরিয়েছে। এই থানা থেকে অমুক স্টাফকে তুলেছে, ওই থানা থেকে তমুক স্টাফকে। নানা জায়গায় ঘুরেছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়াই করেনি। শুকনো কিছু ফল খেয়ে কাটিয়েছে।

প্রিয়ম তাই তারপর থেকে আর বিরক্ত করেনি। ও বুঝতে পারছিল, এই কেসটা সলভ করা রুদ্রর কেরিয়ারের জন্য কতটা প্রয়োজন। এখন মিডিয়াগুলো রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। প্রতি মাসে যদি এই অদ্ভুত হত্যার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে, সেটা রুদ্রর জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের।

আর গোটা বিষয়টা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে রুদ্রকে একা থেকে নিজের মতো ভাবতে দেওয়াটা খুবই দরকার।

প্রিয়ম একটা পুরোনো ইংরেজি সিনেমা দেখছিল। ষাটের দশকের এই অ্যাকশনধর্মী ছবির প্রেক্ষাপট অবশ্য অষ্টাদশ শতকের ব্রিটেন। ওর প্রিয় অভিনেতা মার্লন ব্রান্ডো রয়েছেন মুখ্য ভূমিকায়। ওদের দুজনেরই একটা শখ হল পুরোনো ছবি দেখা। বিশেষত ঐতিহাসিক ঘরানায়। পুরোনো দিনের পটভূমিকায় সিনেমা দেখতে দেখতে তখনকার মানুষদের চালচলন সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যায়। টাইম ট্রাভেল করছে ভেবে রোমাঞ্চ জাগে বেশ।

আজ অবশ্যি সিনেমাটা দেখতে দেখতে প্রিয়মের বারবার মনে পড়ছিল গোটা আমেরিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমীশ সম্প্রদায়ের কথা।

কী অদ্ভুত! এই সিনেমায় ও যেরকম পোশাক পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রা দেখছে, তা যে এই একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বেও কেউ বা কারা একইরকম রেখেছে, ভাবলেই অবাক লাগে।

জ্যোৎস্নাদি বলল, "তাহলে আপনি খেয়ে নিন এবার?"

প্রিয়ম ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে মুখ তুলে বলল, "আমিও খাব না। তুমি খেয়ে নাও। খেয়ে শুয়ে পড়ো।"

জ্যোৎস্নাদি ছাড়ার পাত্রী নয়। সে বকে যেতে লাগল, "কোনো মানে হয়? এত ভালো করে রাঁধলুম, আর দুজনেই খাবে না? আবার বলে কিনা, তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো। আরে আপনারা খেলেন না, আর আমি খেয়ে শুয়ে পড়ব? জ্যোৎস্না সরখেল কি অমানুষ নাকি?"

জ্যোৎস্নাদি বহুবছর হল এই এ এস পি বাংলোয় কাজ করছে। অনেক এ এস পি গেছেন এসেছেন, কিন্তু রুদ্রর মতো আন্তরিকভাবে কেউ মেশেনি বলেই বোধ হয় ও-ও নিজের বাড়ির মতোই এতদিনে ভাবতে শুরু করেছে এই বাংলোটাকে।

প্রিয়ম একটু বিরক্ত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকল রুদ্র। মুখচোখ বিধ্বস্ত, চুল উসকোখুসকো।

ঘরে ঢুকে বেশ স্বাভাবিক স্বরে বলল, ”তোমার ডিনার হয়ে গেছে?”

”না।” প্রিয়ম বলল, ”আমি ভাবছিলাম, তুমি কখন বেরোবে, তাই ...।”

”তাহলে জ্যোৎস্নাদি, জলদি খেতে দাও, খুব খিদে পেয়েছে। রাতও হয়েছে অনেক।”

জ্যোৎস্নাদি’র মুখটা এবার ঝলমল করে উঠল। সে দ্রুত পায়ে ছুট লাগাল রান্নাঘরের দিকে।

রুদ্র একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে সোফায় বসতেই প্রিয়ম বলল, ”কি? কিছু ক্লিয়ার হল?”

”অনেককিছু ভাবার অবকাশ পেলাম। এস পি স্যারকে ফোন করছি বারবার বলব বলে, কিন্তু স্যারের ফোন বন্ধ।” রুদ্র ওর হাউজকোটের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। তারপর বলল, ”তুমি শুনবে?”

”বলো। ক্ষতি কী?”

”পয়েন্ট ওয়াইজ পড়ছি শোনো।

”একনম্বর। প্রথম খুন হয়েছিল ত্রিবেণীর সাইবার ক্যাফের মালিক শিবনাথ বিশ্বাস (৩৮)। লোকাল থানা প্রথমে স্ত্রী আরতি ও পাড়ার এক ছেলে রাজুকে প্রেমঘটিত কারণে সন্দেহ করলেও কোনো প্রুফ নেই। আজ রাজুকে ত্রিবেণী গিয়ে আমি নিজে ইন্টারোগেট করে এসেছি। সে জানিয়েছে, সম্প্রতি শিবনাথের এক নতুন বন্ধু হয়েছিল। নাম শ্যামসুন্দর। শিবনাথেরই বয়সি। কোথায় থাকত বা কী করত, রাজু কিছুই জানেনা। কিন্তু মাঝে দু’বার ওদিক দিয়ে যেতে গিয়ে শিবনাথের দোকানে দেখা করেছিল, দু’বারই দেখেছিল, শ্যামসুন্দর বসে আছে। শিবনাথই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। লোকটা নাকি বাইরে কাজ করে, ছুটিতে ত্রিবেণী এসেছে। যদিও কী কাজ, রাজু জানে না।”

”হুম!” প্রিয়ম বলল, ”তার মানে এখানেও উটকো একটা লোকের সন্ধান পাওয়া গেল অ্যাট লাস্ট!”

”তার থেকেও বড় আরেকটা তথ্য জানতে পেরেছি প্রিয়ম।” রুদ্র বলল, ”রাজুর কাছ থেকে ফেরার সময় আমি আবার গিয়েছিলাম শিবনাথের বাড়ি। আমার আগেরবার একটা সামান্য খটকা লেগেছিল, যখন শিবনাথ বিশ্বাসের টেবিলে ওর বাবা-মায়ের ছবি দেখেছিলাম।”

”কী খটকা?”

”শিবনাথের ছবি দেখেছি, গায়ের রং খুবই ফর্সা। কিন্তু ওর বাবা-মা খুব কালো।”

”তো?” প্রিয়ম ভ্রূ কুঁচকে বলল, ”তাতে কী হয়েছে? হয়তো শিবনাথ ওর দাদু বা ঠাকুমা-দিদিমার গায়ের রং পেয়েছে। মেন্ডেলের বংশগতির সেই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য তো পড়েছিলে নাকি!”

রুদ্র বলল, "পড়লেও এক্ষেত্রে আমার খটকাটাই সত্যি হয়েছে, প্রিয়ম। শিবনাথের স্ত্রী আরতি জিজ্ঞাসাবাদে আমায় জানিয়েছে, শিবনাথকে ছোট বেলায় গঙ্গার ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ওর বাবা। তাঁদের নিজেদের কোনো সন্তান ছিল না, তাই শিবনাথকেই মানুষ করেছিলেন ছেলের মতো। তখন শিবনাথের দশ-বারো বছর বয়স।

"দু'নম্বর, চন্দননগরের মহম্মদ তারেক। তার আসল পরিচয় কেউ জানে না। বদনপুর গ্রামের পল্টু এবং কানু চক্রবর্তীর কথা অনুযায়ী সে এসেছিল কোনো অন্য জায়গা থেকে। মন্দিরে পুজো করত, অর্থাৎ সে ছিল হিন্দু। কিছুদিন থেকে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। নতুন জীবন শুরু করে চন্দননগর রেলস্টেশনের গায়ে। নতুন নাম নেয়, মহম্মদ তারেক। অর্থাৎ মুসলমান। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, কেন? কেন তাঁকে এইভাবে নিজের পরিচয় পুরোপুরি পালটে ফেলতে হল?"

প্রিয়ম বলল, "নিশ্চয়ই সে কারুর থেকে লুকনোর চেষ্টা করছিল।"

রুদ্র বলল, "হ্যাঁ। এটা ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না। আরেকটা ব্যাপার, ঠিক তারেকেরই মতো আরেকজন ছেলে এখন কানু চক্রবর্তীর কাছে রয়েছে, যার সম্বন্ধেও গ্রামের মানুষ পুরো অন্ধকারে। এখানে তাহলে আরেকটা প্রশ্ন হল, কানু চক্রবর্তীর কাছেই এরা আসে কেন? আর কানু চক্রবর্তী বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ছিল কৃষ্ণভক্ত, ফিরে এসে শৈব হয়ে গেল কি করে? মাঝের কয়েকটা বছরই বা সে কোথায় ছিল? সে যখন বদনপুর গ্রামে ফিরে এল, তার সঙ্গী বন্ধুটি কোথায় গেল?"

প্রিয়ম মাথা নাড়ল, "কানু চক্রবর্তীর ব্যাপারটার সঙ্গে কি এই সিরিয়াল কিলিং এর আদৌ কোনো যোগসূত্র আছে? লোকটা হয়তো এমনিই ক্ষ্যাপা প্রকৃতির। তুমিই তো বললে!"

রুদ্র উত্তর দিল না। বলল, "তিন নম্বর খুনের ঘটনায় আসি। পরের কৃষ্ণপক্ষে খুন হল বৈদ্যবাটির চশমাব্যবসায়ী সুনীল ধাড়া। বছরখানেক আগে তার দোকানে কয়েকদিনের জন্য কর্মচারী ছিল বলরাম। তাকে কাজে ঢুকিয়েছিল কে, কিছুতেই জানা যায়নি।

"পাঁচ নম্বর খুন স্বপন সরকার, তার খুন হওয়ার আগে নতুন ঢুকেছিল গোবিন্দ। ছ'নম্বর খুন ব্রিজেশ তিওয়ারি, তার কাছে কিছুদিনের জন্য কাজ করেছিল কানাই। আমি আজ এই প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে গিয়ে নিজে কথা বলেছি। সুনীল ধাড়ার বাড়ির লোক বা স্বপন সরকারের অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গোরা প্রত্যেকেই জানিয়েছে, বলরাম আর গোবিন্দ দেখতে আলাদা হলেও দুজনেই ছিল পরিশ্রমী। কারেন্ট বা ওই জাতীয় জিনিসকে খুব ভয় পেত। পুজোআচ্চা করত। মানে ব্রিজেশ তিওয়ারির কাছে কিছুদিন কাজ করা কানাইয়ের ব্যাপারে ভট্টাচার্য বাড়ির মধুময়বাবু যা বলেছিলেন, সব মিলে যায়।"

৩৩

প্রিয়ম বলল, ”চার নম্বর খুনটা বাদ দিয়ে গেলে তো!”

রুদ্র বলল, ”বাদ দিইনি। চার নম্বর হৃষীকেশ জয়সোয়ালকে নিয়ে স্বপন সরকার গিয়েছিল বাগডাঙার সরলাশ্রমে। সেখানে দুজনের সঙ্গে কথা বলা অবস্থায় কানাইয়ের ছবি আছে।”

প্রিয়ম গভীরভাবে চিন্তা করছিল, ”অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ, এই কানাই, বলরাম, গোবিন্দ, এরা একই গ্রুপের লোক। এবং এরা কোনো না কোনোভাবে তর্কপঞ্চাননের বংশের সেই দত্তক নেওয়া লোকটার সঙ্গে যুক্ত।”

রুদ্র বলল, ”শুধু তাই নয়। শুভাশিসবাবু বলেছিলেন, তাঁদের সেই নকলদাদু আমেরিকায় আমীশদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নাম গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তিনি ভারতে ফিরে এসেছিলেন, তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমেরিকায় যে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন, তেমনও কোনো হদিশ নেই। উনি আমেরিকার যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করতেন, আমি সেখানেও খোঁজ নিয়েছি। কোর্স কমপ্লিট করার পর আর কোনো আপডেট ইউনিভার্সিটির কাছে নেই। কলকাতার ইউ এস এমব্যাসির কাছে পাসপোর্ট নম্বর দিয়ে ট্র্যাক করতেও পাঠিয়েছি। এটা খুবই সম্ভব যে, এই বাংলারই কোথাও সেই আমীশ সম্প্রদায় এখনো রয়েছে, যেখান থেকে আধুনিক পৃথিবীতে পালিয়ে আসার অপরাধে মল্লিকাদি’কে খুন হতে হয়েছে।”

”খুন হতে হয়েছে কেন?” প্রিয়ম ভ্রূ কুঁচকল।

রুদ্র বলল, ”যদি তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায়, তবে সেখান থেকে যারা পালাবে, তাদের তারা মুখ বন্ধ করতে খুন করতেই পারে। মল্লিকাদিকে বিষ মাখানো তির ছোঁড়াটাও আমীশদের দিকেই ইঙ্গিত করছে। এইদিক দিয়ে চিন্তা করলে একইভাবে জাস্টিফাই করা যায় ছোটবেলায় পালিয়ে আসা শিবনাথ বা কয়েকবছর আগে পালিয়ে আসা আইডেন্টিটি পুরো বদলে ফেলা মহম্মদ তারেকের খুনকেও।”

”তাহলে ক্ষমাকেও ওরকম কিছু না করে ধরে নিয়ে যাওয়া হল কেন?”

রুদ্র এবার চুপ করে রইল। তারপর বিড়বিড় করতে লাগল, ”ক্ষমা ভয় পেত ওর ভাশুরপো নাকি ওকে ধরে নিয়ে যাবে। ভাশুরপো ধরে নিয়ে যাবে কেন? তার মানে ক্ষমা শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়েছে। কিন্তু কেন পালিয়েছে?”

প্রিয়ম বলল, ”ক্ষমা যদি বিবাহিতই হয়ে থাকে, তাহলে ওর মাথায় সিঁদুর বা হাতে শাঁখাপলা কিছু ছিল না কেন? পুরনো দিনের মতো জীবনযাপন করলে সেগুলো থাকা উচিত ছিল।”

”হয়তো সেগুলো আগেই মুছে ফেলেছিল।” রুদ্র একটু ভেবে বলল, ”তুমি আর আমি ভোরবেলা বাংলোর বাইরে যখন ওদের রেসকিউ করি, তখন বেশ ঠান্ডা ছিল। দুজনেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল।”

প্রিয়ম বলল, ”তোমার যুক্তি যদি মেনেও নিই, সেখানেও অনেকগুলো কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করছে। শিবনাথ আর তারেক ছাড়া বাকিরা অন্য কোথাও থেকে আসেনি। সবাই নিজেদের বাড়িতেই জন্মেছে, বড় হয়েছে। রাইট? তবে তাদের মারা হল কেন?”

রুদ্র বলল, ”এমনিতে তো এরা সবাই এমন এমন পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যেগুলো ওই আমীশ সম্প্রদায়ের চোখে পাপ। শিবনাথ আর তারেক ওখান থেকে এসে হয়ত কাকতালীয়ভাবেই সাইবার ক্যাফে আর মোবাইল রিচার্জের ব্যবসা শুরু করে। তাতে তারা আমীশ সমাজের কাছে আরও বেশি করে অপরাধী হয়ে ওঠে। তাই ওদের দোকানও ভাঙচুর করা হয়েছে। আর সুনীল ধাড়ার চশমার দোকান। যার যা স্বাভাবিক আয়ু বা কোনো রোগজনিত যন্ত্রণাভোগ, সেটাকে চশমা বা কৃত্রিম কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে লঙ্ঘন করাটা আমীশ সমাজের কাছে অপরাধ।”

”সে তো হাজার হাজার চশমার দোকান আছে, গুচ্ছের নার্সিং হোম আছে। ওই আমীশ ব্যাটারা সুনীল ধাড়া আর ড. সুবল ভট্টাচার্যকেই টার্গেট করল কেন?” প্রিয়ম বুলেটের মত পরপর প্রশ্ন ছুঁড়ে যাচ্ছিল।

রুদ্র বিব্রত মুখে বলল, ”সেটার উত্তর আমি এখনো পাইনি প্রিয়ম। আমীশ সমাজ বাংলায় কোথাও লুকিয়ে থাকলেও তাদের প্রতিনিধি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে আধুনিক জগতে আসে। তারা হয়তো কোনোভাবে এইসব লোকগুলোর সঙ্গেই মিশেছে। সুনীল ধাড়ার দোকানের স্থায়ী কর্মচারী দানু জানিয়েছে, সে একবার লম্বা ছুটি নিয়েছিল, তখনই বলরামকে দোকানে রাখা হয়।”

প্রিয়ম না মানার ভঙ্গিতে দু’পাশে মাথা নাড়াল, ”তোমার মোটিভ একদমই কনভিন্সিং লাগছে না। যাইহোক, তারপর বলো।”

রুদ্রর মুখটা নিভে গেল। ম্লান গলায় ও বলল, ”নেক্সট হল বাগডাঙ্গার সরলাশ্রম। ওই আশ্রমের সঙ্গে আমীশ সমাজের ডেফিনিটলি কোন সরাসরি যোগাযোগ আছে। হয়ত ওই আশ্রমের মধ্যে দিয়েই বাংলার ওই আমীশ সম্প্রদায় আধুনিক জগতের সঙ্গে কানেকশন রাখে।”

প্রিয়ম বলল, ”এটা আবার কোথা থেকে ইনফার করলে? শুধু ওই আশ্রমে তর্কপঞ্চাননের বই দেখে?”

”না।” রুদ্র বলল, ”বাগডাঙা সরলাশ্রমে যে মহারাজের ছবি রয়েছে, তাঁর নামও গোপালকৃষ্ণ মহারাজ। এটাও তো হতে পারে, শুভাশিসবাবুর নকলদাদুই ওখানে ওই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর পাঁচনম্বর যিনি খুন হয়েছেন, সেই স্বপন সরকার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন ওই সরলাশ্রমের সঙ্গে। হৃষীকেশ আগরওয়ালকেও তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। গোবিন্দ বলে ছেলেটা ছিল তাঁর সহকারী। হতেই পারে যে স্বপন সরকারকে মারার জন্যই জড়ানো হয়েছিল সরলাশ্রমের সঙ্গে। যেহেতু তিনিও আধুনিক সভ্যতার অনিবার্য অঙ্গ গাড়ির ব্যবসা করেন। হৃষীকেশ আগরওয়ালও তাই। প্রোমোটারি।”

প্রিয়ম অদ্ভুত মুখব্যাদান করে বলল, ”মারুতি, টাটা এইসব কোম্পানিকে ছেড়ে তোমার এই বাঙালী আমীশদের এত ছেঁদো দিকে নজর কেন সেটাই বুঝতে পারছিনা। যাইহোক, বাকি দুজন?”

রুদ্র অপ্রতিভ মুখে বলল, ”ব্রিজেশ তেওয়ারি তো খোদ তর্কপঞ্চাননের বাড়িতেই ইনভার্টারের দোকান করেছিল। ওকে মারবে না? আর সুবল ভট্টাচার্য ডাক্তার, মানে রুগিকে বাঁচিয়ে …।”

”বুঝেছি বুঝেছি।” প্রিয়ম হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দিল। জোর গলায় বলল, ”ভাবো ভাবো। এগুলো একটাও আমার ঠিকঠাক লাগছে না। হয়তো তুমি ঠিক দিকেই এগোচ্ছ, নাহলে এতগুলো ঘটনা সেইম ডিরেকশনে ওভারল্যাপ করত না। কিন্তু আরও জোরালো মোটিভ আছে পেছনে। আগে বুঝতে হবে আমীশ সমাজের উদ্দেশ্যটা কী। কীভাবেই বা তুমি ধরে নিচ্ছ, বাগডাঙার ওই আশ্রম দিয়ে ওরা কানেকশন রাখে এদিকের সঙ্গে?”

রুদ্র বলল, ”সেটা বুঝলাম আশ্রমটার ভৌগোলিক অবস্থান দেখে। অফিস থেকে হুগলীর ডিটেইলড ম্যাপ চেয়ে আনলাম পাঁচুকে দিয়ে। আশ্রমের একেবারে সামনে দিয়ে যে সরু নদীটা বয়ে গিয়েছে, সেটা আসলে খাল। খালের অন্যদিকে কিছুদিন উজানে গেলেই বদনপুর। আর সেই খাল গিয়ে মিশেছে মৃতপ্রায় সরস্বতী নদীতে। আর সেই সরস্বতী নদী অনেকটা এঁকেবেঁকে গিয়ে পড়েছে গঙ্গায়, ত্রিবেণীর যাত্রাশুদি বলে একটা জায়গায়।”

”মানে?” প্রিয়মের ভ্রূ এবার কুঞ্চিত।

”মানেটা পরিষ্কার।” রুদ্র হাতে রোল করে পাকানো ম্যাপটা এবার বড় করে মেলে ধরল, ”আমরা ভেবে মরছিলাম, শিবনাথের দোকানে যাওয়ার রাস্তায় সিসিটিভি ফুটেজে কাউকে দেখা যায়নি কেন। কারণটা আর কিছুই নয়, আততায়ী এসেছিল গঙ্গা দিয়ে, নৌকো করে। শিবনাথের দোকান গঙ্গার ধারেই। শুধু শিবনাথ নয়, প্রতিটা খুনই এমনভাবে হয়েছে, যেখান থেকে নদীপথে পালানো খুব সহজ। হুগলীর এই পুরো অঞ্চলটার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা। বা আরো নির্ভুল বলতে গেলে আমাদের হুগলী নদী। আমরা গঙ্গা বলি তাই, আসল নাম তো হুগলী।”
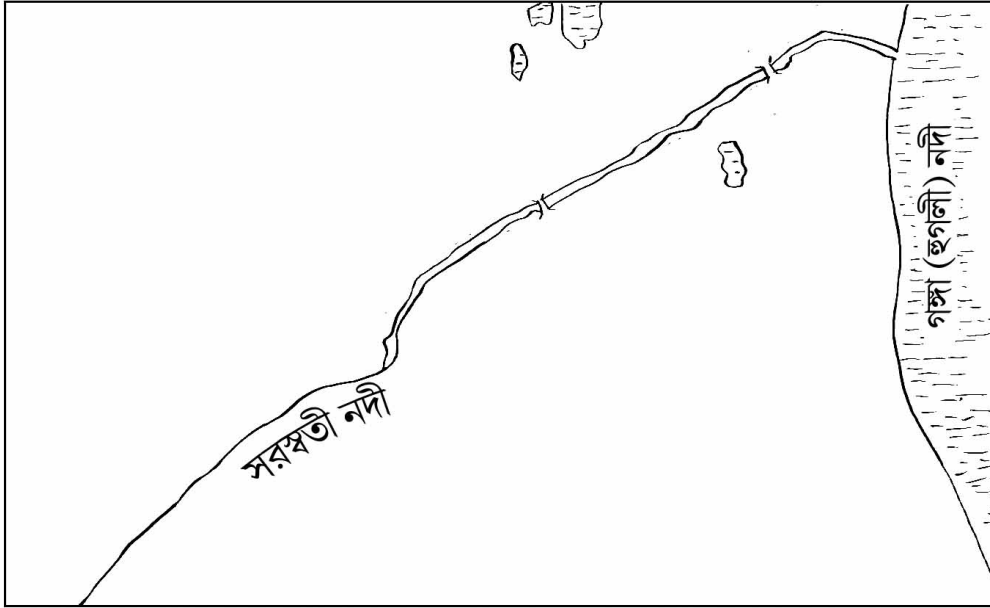
”তার মানে তুমি বলছ ওই বাংলা আমীশ সমাজ এই গঙ্গার ওপরেই কোথাও না কোথাও রয়েছে?” প্রিয়ম হুমড়ি খেয়ে পড়ে হুগলী জেলার ম্যাপটা দেখছিল।

”হতে পারে।” রুদ্র ম্যাপটার ওপর পেনসিল বোলাচ্ছিল, ”আবার লক্ষ্য করে দ্যাখো, গঙ্গা থেকে মাঝে মাঝেই অনেক সরু সরু খাল বেরিয়েছে, যেগুলো অনেকদূর প্রবাহিত হয়ে ধীরে ধীরে শুকিয়ে গিয়েছে। যেমন এই সরস্বতী নদীটা। কিংবা আরও একটু উত্তরে গেলে গঙ্গা নদীতে মুর্শিদাবাদ থেকে এসে মিশেছে জলঙ্গী নদী। কোথাও আবার গঙ্গা

থেকে একটা সরু শাখা বেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার গঙ্গাতেই মিশে গেছে। আমীশ সমাজ যেখানেই বাস করুক, নদীপথেই তারা যাতায়াত করে বাগডাঙা আশ্রম বা অন্য জায়গাগুলোয়। আর বদনপুর গ্রামটায় তারেক বা নতুন ছেলেটি পালিয়ে এসেছে কারণ নিশ্চয়ই সেটা জলপথে আমীশ সমাজ থেকে কাছে।"

"হুম।" প্রিয়ম বলল, "এইটা এতক্ষণে একটা সলিড পয়েন্ট বলেছ। এটা যদি হয়, তবে বেশ জটিল ব্যাপার। এবার কী করবে ভাবছ?"

রুদ্র বলল, "আপাতত বদনপুর গ্রামে একজন ইনফর্মার লাগিয়েছি। যে কানু চক্রবর্তী আর নদীর দিকটাকে ভালো করে অবজার্ভ করবে। একই জিনিস করেছি বাগডাঙা সরলাশ্রমে। আমি যখন গিয়েছিলাম আশ্রম ছিল ফাঁকা। নিশ্চয়ই তারা আবার আসবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে খবর পাব।"

প্রিয়ম বলল, "এত জটিলতার কী আছে? ওই কানু চক্রবর্তী আর ওই কী মহারাজ, তাদের থানায় তুলে এনে একটু কড়কালেই অনেক কিছু জানা যাবে।"

রুদ্র এবার জিভ দিয়ে আফশোসের আওয়াজ করে বলল, "সেটা করতে পারলে তো হয়েই যেত। কিন্তু এস পি রাধানাথ স্যারের স্ট্রিক্ট অর্ডার, শিবনাথ বিশ্বাসের কেসে ওই রাজুকে থানায় বারবার ডাকার জন্য লোকাল পার্টি থেকে অনেক ঝামেলা হয়েছে। কোনো প্রমাণ ছাড়া কাউকে যেন না কড়কানো হয়। তাই আপাতত এভিডেন্স জোগাড় করার জন্য ইনফর্মার ছাড়া আমার গতি নেই।"

"কিন্তু এইসব গ্রামগুলোয় তো একেবারেই কম লোকজন থাকে। বাইরের লোক দেখে যদি অ্যালার্ট হয়ে যায়?"

রুদ্র বলল, "প্রতিটা গ্রামেই পুলিশের কিছু নিজেদের লোক থাকে। আমরা তাদের বলি খোচর। এরা নিজেরা ছিঁচকে চুরি-টুরি করে। উপরি বকশিশের আশায় লোকাল থানায় ইনফর্মারের কাজও করে।"

"তাই বলো! সাধে কি লোকে বলে চোর আর পুলিশ একই গোত্রের?"

রুদ্র প্রিয়মের রসিকতায় অল্প হেসে বলল, "কিন্তু যতক্ষণ না আমি আমীশ সমাজের লোকেশনটা ট্র্যাক করতে পারছি, কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ওদের পরবর্তী টার্গেট কে। আর এর শেষ কোথায়!"

৩৪

উপবীতধারী অতিথি একটি ছাত্রের পিছু পিছু এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, ”আহ, আজ আমার চক্ষু সার্থক হল। দেশের জীবন্ত কিংবদন্তীকে নিজচোখে দেখার সৌভাগ্য হল। প্রণাম নেবেন, পণ্ডিতমশায়!”

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গড়গড়ায় তামাক সেবন করছিলেন। পাশে বসেছিলেন তাঁর বৈকালিক সঙ্গী বাসুদেব বাচস্পতি। অদূরেই তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠী সমাপনান্তে ছাত্ররা ফিরে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী ছাত্রাবাসে। সম্প্রতি তাঁর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা এক হাজার অতিক্রম করেছে। তাঁর উঁচুশ্রেণীর ছাত্ররাই মূলত শিক্ষাদান করেন। তর্কপঞ্চানন নিজে পড়ান একেবারে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রেণীকে। তবে চতুষ্পাঠীর ভাণ্ডারঘর থেকে রন্ধনশালা, ছাত্রাবাস থেকে অতিথিশালা, সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ থাকে তাঁর নখদর্পণে। বয়স হয়েছে অনেক, কিন্তু তাঁর শরীরে বা মনে কোথাওই বার্ধক্যের কোনো চিহ্ন এখনো নেই।

”শুভমস্তু। আসন গ্রহণ করতে আজ্ঞা হোক।” জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দক্ষিণ হস্ত তুলে আশীর্বাদ করলেন। তারপর পাশে দণ্ডায়মান ছাত্রটিকে কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে আসার ইঙ্গিত করে বললেন, ”আপনার পরিচয়?”

ব্রাহ্মণ তর্কপঞ্চাননের বিপরীতের চাটাইয়ে বসে পড়ে বললেন, ”আমি এক সাধারণ ব্রাহ্মণ। আবাস বর্ধমানের কাটোয়া। শিক্ষা ও পেশা দুইয়েরই প্রয়োজনে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছি। সঙ্গে আরবি, ফারসিও শিখেছি কর্মে অগ্রাধিকার পাওয়ার জন্য।”

”বাহ, অতি উত্তম।” তর্কপঞ্চানন বললেন, ”তা আমার কাছে কী অভিপ্রায়ে আগমন?”

”আজ্ঞে আমি হিন্দু ধর্মে অতিশয় শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে একটি সংশয়ের ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হচ্ছি। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের আশায় ছুটে গিয়েছি নবদ্বীপেও। কিন্তু খ্যাতনামা বা অখ্যাত কোনো পণ্ডিতই আমার কৌতূহল নিরসন করতে পারেননি। তাঁরা কেউ কেউ দুরূহ সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে আমাকে এড়িয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেছেন। আজ তাই ছুটে এসেছি ত্রিবেণীতে, সাক্ষাৎ জগন্নাথের কাছে। যদি তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রাঞ্জলভাবে ব্যখ্যা করেন।” ব্রাহ্মণ করজোড়ে বলে চলেছিলেন।

বাসুদেব বাচস্পতি এবার তাঁর দীর্ঘ ব্রহ্মশিখা দুলিয়ে বললেন, ”অ্যাদ্দিনে ঠিক লোকের কাছে এসেছেন।”

জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করলেন, ”কী প্রশ্ন?”

”ঈশ্বর কী? ব্রহ্ম কী? তিনি কি এক না অনেক?”

এমন আকস্মিক প্রশ্নে বাসুদেব বাচস্পতি বিব্রত চোখে তাকালেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের দিকে। এই প্রকার স্পর্শকাতর বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর অধিকাংশ পণ্ডিতই এড়িয়ে যান।

কিন্তু তর্কপঞ্চানন একটুও না ইতস্তত করে বললেন, ”ঈশ্বর এক।”

ব্রাহ্মণ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ”তবে শিব কে? বিষ্ণুকে? গণেশ কে? শক্তি কে?”

”এঁরা সকলেই ঈশ্বরের প্রকারভেদ। নামহীন কায়াহীন ঈশ্বরের উপাসনা সহজ নয়। তাই কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। বস্তুত শিব, বিষ্ণু, গণেশ, কার্তিক সব একই।”

বাসুদেব বাচস্পতি অস্ফুটে বললেন, ”এসব কী বলছ ভায়া! প্রকাশ্যে এ’সব বোলো না, তীব্র নিন্দার শিকার হবে।”

তর্কপঞ্চাননের কর্ণকুহরে কথাটা প্রবেশ করল বলে মনে হল না। তিনি নির্বিকার চিত্তে গড়গড়া টানতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করলেন, ”সকলে যদি অভিন্ন হন, তবে প্রত্যেকের পূজার ধরণ পৃথক কেন, পণ্ডিতমশাই? শিবঠাকুরকে পুজো করতে লাগে বেলপাতা, বিষ্ণুর জন্য তুলসীপাতা, আবার মা শক্তির জন্য রক্তজবা। কেন? যদি সকলেই এক হন, তবে এই ভিন্ন উপাচারের কারণ কী?”

তর্কপঞ্চানন এবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, ”একনটী যাত্রাপালা দেখেছেন কখনো?”

”হ্যাঁ।” ব্রাহ্মণ উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, ”আমাদের গ্রামে গতবছরই এসেছিল। একটিই লোক প্রথমে মা যশোদা সেজে গান গাইল। তারপর কেষ্টঠাকুর সেজে দুটো পালা গাইল। সবশেষে সাজল নারদ। আহা! খাসা করেছিল।”

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বললেন, ”সেই লোকটি আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য কখনো বাউটি, মল, চেলি পরে যশোদা সাজল, কখনো পাকা দাড়ি লাগিয়ে নারদ কিংবা বাঁশি হাতে কৃষ্ণ হল। ঈশ্বরও তাই। আমরা মানুষরা নিজেদের সন্তোষের জন্য ঈশ্বরকে নানা বেশ ধারণ করাই। কখনো জবা-মাংসে কালী আরাধনা করি, কখনো বেল ধুতরোয় ভোলানাথকে। আর কিছু নয়। সব আসলে একই জায়গায় যায়।”

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বোধ হয় নিজের যুক্তির যন্ত্রে যাচাই করে নিতে চাইলেন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠর মতবাদ। সংকোচের সঙ্গে বললেন, ”আর মোছলমানদের আল্লা বা ফিরিঙ্গিদের খ্রিস্টান?”

বাসুদেব বাচস্পতি শিহরিত চোখে তাকালেন, কিন্তু তর্কপঞ্চানন নির্বিকার। গড়গড়া টানতে টানতে সহাস্যে বললেন, ”বললাম তো, সব আসলে একই জায়গায় যায়। কেষ্ট আর খ্রিস্ট, আল্লা আর কমলা একই। সব আমাদের মনের সন্তুষ্টির জন্য। আমরাই গড়েছি এদের।”

”তবে এই পুজো আচ্চা, যজ্ঞ, উপাচার?”

তর্কপঞ্চানন বললেন, ”বেদে যেমন স্থূল দ্রব্যযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, আলোচিত হয়েছে প্রতীকী যজ্ঞও। যজ্ঞ না পুজো যেমন বাইরের উপাচার দিয়ে হয়, তেমনই হয় অন্তরের ভাব দিয়েও। কৌষিতকী আরণ্যক স্মরণ করুন।

”শ্রদ্ধা পয়ো বাক্ সমিৎ।

সত্যম্ আহুতিঃ প্রজ্ঞাত্মা স রসোঃ।

শ্রদ্ধাই দুগ্ধ, বাক্যই সমিৎ, সত্যই আহুতি, প্রজ্ঞাই আত্মা। এগুলো থাকলে আর কিচ্ছু লাগে না যে!”

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। বললেন, ”সাধু! সাধু! ধন্য জগন্নাথ পণ্ডিত! এইজন্যই বলে, ত্রিবেণীতে সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর বাস! এমন সহজভাবে কেউ তো বুঝিয়ে দেয়নি!”

তর্কপঞ্চানন এবার অট্টহাস্য করে বললেন, ”তা ত্রিবেণীতে সরস্বতীর বাস তো বটেই, সরস্বতী নদী তো ত্রিবেণী দিয়েই বয়ে গিয়েছে!”

"সরস্বতী তো এখন মৃতপ্রায় পণ্ডিতমশাই।" ব্রাহ্মণ বললেন, "সপ্তগ্রাম বন্দর তো ওইজন্যই বন্ধ হল। এখন আসল নদী হল গিয়ে আমাদের গঙ্গা। উত্তরে আপনাদের এই ত্রিবেণী, গুপ্তিপাড়া, অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, খাগড়াঘাট, মুর্শিদাবাদ হয়ে পাটনা, কাশী। আর দক্ষিণে তো ফিরিঙ্গিদের নতুন বন্দর কলকাতা। কত হাজার হাজার মণের বাণিজ্য চলে এই পথে! দিবারাত্রি মহাজনী নৌকোর সারি।"

তর্কপঞ্চানন বললেন, "মৃতপ্রায় আপাতদৃষ্টিতে। সরস্বতী অনন্তসলিলা। ঋগ্বেদেও এই নদীর উল্লেখ রয়েছে। যদিও তা অন্য নদী। যাইহোক, পরিচয় হয়ে ভালো লাগল। আবার আসবেন।"

ইতিমধ্যেই এক ছাত্র কিছু মিষ্টান্ন এনে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ সেগুলো সেবন করে আরও অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রস্থান করলেন।

বাসুদেব বাচস্পতি গম্ভীরমুখে বললেন, "যাই বলো জগন্নাথ, তোমার এইসব আলটপকা মন্তব্য একেবারেই করা উচিত নয়। ওইজন্যই তোমার ওপর নবদ্বীপের পণ্ডিতরা খাপ্পা। এইজন্যেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র …।"

"তাতে আমার কিছু যায় আসেনা বাসুদেব।" জগন্নাথ হুঁকায় একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, "সনাতন ধর্মের মতো প্রগতিশীল উদার শাস্ত্র বিরল। বৈদিক সাহিত্য পড়লেই তার উদারমনস্কতা বা যুক্তিবোধ বোঝা যায়। কিন্তু তার পরবর্তী হাজার হাজার বছর ধরে পণ্ডিতরা নিজেদের মতো করে নিজেদের স্বার্থ কায়েম করতে ইচ্ছেমতো নিয়ম বসিয়েছেন কিংবা সরিয়েছেন। আসল হিন্দু ধর্ম চাপা পড়ে গিয়েছে সেই পূতিগন্ধময় পুরু আস্তরণের নীচে।"

"তাই তুমি সেই আস্তরণ সরানোর দায়িত্ব নিয়েছ?" বাসুদেব বাচস্পতি শ্লেষযুক্ত স্বরে বললেন।

"নাহ! আমি আর কতটুকু পারব বাসুদেব। বয়স হচ্ছে। নেহাত আমার ওপর কেউ কথা বলার স্পর্ধা দেখায় না তাই, কিন্তু আমার এই চিন্তাধারাগুলো তো সকলের হজম হবে না।" তর্কপঞ্চানন ভারী গলায় বললেন, "তবে আমি স্বপ্ন দেখি।"

"কী স্বপ্ন দ্যাখো?"

"একদিন নিশ্চয়ই কেউ আমাদের এই বাংলায় আসবে। একদিন নিশ্চয়ই কেউ এইসব অর্ধশিক্ষিত স্মার্ত পণ্ডিতদের কবল থেকে টেনে বের করে আনবে সত্যিকারের সনাতন দর্শনকে। বন্ধ হবে সহমরণ। রাজবল্লভের কন্যার মতো মেয়েরা বিধবা হলেও আবার নতুন জীবন শুরু করতে পারবে। বৈদিক যুগের লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী, গার্গীরা আবার বাংলার ঘরে ঘরে জন্মাবে। সেদিন আমি হয়ত এই ধরাধামে থাকব না। কিন্তু যেখানেই থাক, মনেপ্রাণে আশীর্বাদ করব সেই যুগপুরুষকে। যে টান মেরে সরিয়ে দেবে এই মিথ্যে পুরু আস্তরণ।"

বাসুদেব বাচস্পতি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এসে উপস্থিত হলেন উইলিয়াম জোন্স।

তাঁর চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনি বেশ উত্তেজিত। বিস্ফারিত চোখে নিজের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসে বললেন, "সংবাদ শ্রবণ করেছ, পণ্ডিত?"

তর্কপঞ্চানন শান্তস্বরে বললেন, "কোন সংবাদের কথা বলছ? চারপাশে তো অনেক কিছুই ঘটে চলেছে। নবাবের মসনদ থেকে শুরু করে বাংলার রাজধানী, পট পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত।"

জোন্স বললেন, "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নবাব কারাগারে পুরেছেন। এই নবাব মিরকাশিম যে কী শুরু করলেন! কোম্পানির গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট নবাব মিরজাফরকে অকর্মণ্য অপদার্থ বলে সরিয়ে দিয়ে মিরকাশিমকে বসিয়ে খাল কেটে কুমীর আনলেন। মিরকাশিম তো দেখছি ইংরেজদের ওপর হাড়ে চটা। একদিকে রাজধানী বদলাল মুঙ্গেরে, অন্যদিকে পলাশির চক্রান্তের সবার ওপর একে একে প্রতিশোধ নিচ্ছেন। জগৎ শেঠ মহতাবচাঁদ,

স্বরূপচন্দের পর এবার কৃষ্ণচন্দ্র! কারণ অতি বিচিত্র। কৃষ্ণচন্দ্র নাকি বহুদিনের রাজস্ব নবাবের তহবিলে বকেয়া রেখেছিলেন।”

”নবাবকে তাঁর প্রাপ্য রাজস্ব না দিলে তো কয়েদ করবেই।” বাসুদেব বাচস্পতি মন্তব্য করলেন।

উইলিয়াম জোন্স একটু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, ”এ তো আর কোনো ছোটখাটো জমিদার নয়, যে তুলে নিয়ে যাবে সটান। গোটা নদীয়ার অধিপতি, তামাম নবদ্বীপের পণ্ডিতুলের পৃষ্ঠপোষক, ন্যূনতম সম্মান তো তাঁর প্রাপ্য! রাতারাতি রাজা আর যুবরাজ শিবচন্দ্রকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে মুঙ্গেরের কয়েদখানায় পোরা, এ তো চরম অন্যায়!”

”অন্যায়!” তর্কপঞ্চানন বললেন, ”ন্যায় অন্যায় তুমি কাকে দেখাচ্ছ, সাহেব! আলিবর্দি খাঁ যখন নবাব ছিলেন, তখন এই কৃষ্ণচন্দ্রই এক অসহায় বিধবার সম্পত্তি গাপ করেছিলেন, তা কি জানো? ত্রিবেণীর পাশেই যে বংশবাটীর রাজা গোবিন্দদেবের মৃত্যুকালে তাঁর মহিষী গর্ভবতী ছিলেন, এত বড় সত্য জানা সত্ত্বেও তিনি নবাবের কাছে দরবার করেছিলেন বংশবাটির জমিদারি বাজেয়াপ্ত করতে। গোবিন্দদেবের বিধবা জানতেও পারেননি, কখন তাঁদের জমিদারি নবাব বাজেয়াপ্ত করে নয়া ব্যবস্থা করলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে। যখন সংবাদ পেলেন, তড়িঘড়ি দূত পাঠালেন নবাব দরবারে। কিন্তু কৃষচন্দ্র লোক লাগিয়ে তাঁর সেই দূতের এত্তেলা হাজারদুয়ারির আমদরবার পেরোতে দিলেন না। আরও মোটা খাজনা ও নজরানা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নবাবের মুখবন্ধ করলেন। গোবিন্দদেবের সেই পুত্র এখন সদ্যযুবা। নাম নৃসিংহদেব। হন্যে হয়ে সে ঘুরছে জমিদারি পুনরুদ্ধারের আশায়। জানো তো, পাপ বাপকেও ছাড়ে না? যে রাজস্বের লোভে কৃষ্ণচন্দ্র এত জমিদারি বাড়িয়েছিলেন, সেই রাজস্ব অনাদায়েই তিনি কয়েদ হলেন।”

উইলিয়াম জোন্স কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এক ছাত্র এসে বলল, ”কাল প্রত্যুষে একেবারে প্রথম প্রহরে বজরা ছাড়বে, পণ্ডিতমশাই। খাজাঞ্চিমশাই আপনাকে জানাতে বললেন।”

”বেশ।” তর্কপঞ্চানন বললেন।

”আগামীকাল কি কোথাও যাচ্ছ নাকি, পণ্ডিত?”

তর্কপঞ্চানন কিছু বলার আগেই বাসুদেব বাচস্পতি বললেন, ”হ্যাঁ। কাল উনি মুর্শিদাবাদ যাবেন।”

”হঠাৎ?”

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কিয়ৎক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ”রায় রায়ান নন্দকুমারের সঙ্গে কিছু কথা আছে, তাই যেতে হচ্ছে। বিশেষ জরুরি প্রয়োজন।”

”কী প্রয়োজন?” উইলিয়াম জোন্স সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর ও তর্কপঞ্চাননের যতই মতবিরোধ হোক, তাঁরা পরম বন্ধু। এই বন্ধুত্ব এমন, যে দুজনেই দুজনকে নিঃসংকোচে সবকিছু বলতে পারেন।

জগন্নাথ পণ্ডিত সামান্য ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, ”নন্দকুমারকে অনুরোধ করব, যাতে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে মুক্তি দেন।”

”অর্থাৎ?” উইলিয়াম জোন্সের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ”খুব যদি ভ্রম না করি, তুমিই তো কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি প্রতিশোধ নিতে তাঁকে কয়েদ করেছ। দেওয়ান নন্দকুমার যে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমি জানি।”

তর্কপঞ্চানন বললেন, ”আমাদের শাস্ত্রে কী বলে জানো? অপরাধীকে তাঁর দোষের শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু তাঁকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনাও কর্তব্য। তবেই তো ভ্রম সংশোধনের সুযোগ পাবে। কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথ পণ্ডিতকে অপমান করেছিল, উপেক্ষা করার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। তাই সে শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু এবার তাকে যে ক্ষমা করতেই হবে!”

উইলিয়াম জোন্স অভিভূত কণ্ঠে বললেন, ”সত্যি পণ্ডিত! তোমাকে এতবছর দেখছি, তবু যেন মাঝেমাঝে অচেনা লাগে। তুমি ধন্য!”

ভবানীপুরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত 'চৌধুরীভিলা' যেমন বিশাল, তেমনই সুন্দরভাবে সাজানো। বাড়ির সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে কেয়ারি করা ফুলের বাগান, তার পাশ দিয়ে সবুজ লন ঢুকে গিয়েছে গাড়িবারান্দা পেরিয়ে।

রুদ্র আর প্রিয়াঙ্কা ইচ্ছে করেই পুলিশ উর্দি পরেনি। সাধারণ পোশাকে বাড়ির পরিচারকের পিছুপিছু গিয়ে ওরা প্রকাণ্ড ড্রয়িং রুমে বসে হাঁ হয়ে গেল।

প্রিয়াঙ্কা চাপাস্বরে বলল, "এ'কোথায় এলাম ম্যাডাম! কোন মিউজিয়াম মনে হচ্ছে।"

রুদ্রও বেশ অবাক হয়ে দেখছিল। গোটা ড্রয়িং রুমটাই নানারকম বহুমূল্য আসবাবপত্র ও শৌখিন জিনিসপত্রে সুসজ্জিত। দুর্মূল্য ঝাড়বাতি থেকে শুরু করে অ্যান্টিক ভাস্কর্য, কী নেই! দেওয়ালের একেবারে ওপরদিকে রয়েছে বেশ কিছু স্টাফ করা প্রাণীর মুখ। বোঝাই যাচ্ছে, এই পরিবার যেমন বনেদি, তেমনই বিত্তশালী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। পরনে দামি পাজামা-পাঞ্জাবি। বয়স আন্দাজ পঁচাত্তর, পরিবারের ধারা মেনেই গৌরকান্তি ও অসম্ভব সুপুরুষ। রুদ্রর উলটোদিকে বসে নমস্কার করলেন, "আমি শেখর চৌধুরী। আমিই আপনার ফোন ধরেছিলাম।"

"নমস্কার।" রুদ্র বলল, "আমাদের হাতে সময় এতটাই কম যে আমি সরাসরি প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। আপনাদের আদি নিবাস তো হুগলীর বদনপুর গ্রামে ছিল?"

"হ্যাঁ।" শেখর চৌধুরী সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন, "অনেক বছর আগে আমার বাবা ওখানকার পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। তখন আমি বাইশ বছরের যুবক, লন্ডনে পড়াশুনো করছি। আমাদের অন্যান্য শরিকেরা তারও আগে গ্রাম ছেড়েছিল। আমরাই অতদিন ছিলাম। তবে ওই গ্রামে আমাদের নাটমন্দির, জমিদারবাড়ি, সেসব এখনো আছে। মানে থাকার কথা।"

"আর আপনাদের মন্দির?" রুদ্র জিজ্ঞাসা করল।

শেখর চৌধুরী মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "ও হ্যাঁ। নদীর ধারে আমাদের পারিবারিক চণ্ডীমন্দির ছিল। পারিবারিক হলেও গোটা গ্রামই তার প্রসাদ পেত। পাশের দুর্গাদালানে দুর্গাপুজোও হত। আমাদের বংশ ঘোরতরভাবে শক্তির উপাসক।"

"সেই মন্দিরের পুরোহিত কে ছিলেন, মনে আছে?"

শেখর চৌধুরী মনে করার চেষ্টা করে বললেন, "না, মানে আমি তো স্কুলের পাট শেষ করেই বিলেতে পড়তে চলে যাই। আমার ঠিক মনে নেই।"

রুদ্র বলল, "আপনার কানু চক্রবর্তী বলে কাউকে মনে আছে? আপনাদের ওই চণ্ডীমন্দিরের পুরোহিতের ছেলে। আপনাদেরই বাড়ির এক ছেলের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালায়?"

"আমাদের বাড়ির ছেলে?" শেখর চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন, "আমি তো আমার বাবার একমাত্র পুত্র। আপনি যে সময়ের কথা বলছেন, সেইসময় তো এরকম কিছু

ঘটেনি! আর কোনো শরিকও সেইসময় গ্রামে থাকত না।”

রুদ্রর মুখটা কালো হয়ে গেল। অনেক আশা করে ও এসেছিল আজ। ওর বারবার মনে হচ্ছিল, কানু চক্রবর্তীর সঙ্গে পালানো ওই ছেলেটির সঙ্গে এই ঘটনার কিছু যোগাযোগ আছে।

কিন্তু ইনি বলছেন, তেমন কিছু ঘটেইনি। তবে কি লোকেশবাবুকে কেউ ভুল তথ্য দিয়েছে?

ভদ্রলোক তখন তাকিয়ে আছেন দেখে ও জিজ্ঞেস করল, ”আপনি কী করেন?”

শেখর চৌধুরী বললেন, ”আমার বাবা গ্রামে থাকার সময়েই কলকাতায় গার্মেন্টের ব্যবসায় লগ্নি শুরু করেছিলেন। আমি বিলেত থেকে ফিরে সেটাকেই বাড়িয়েছি। এখন হাওড়া, কলকাতা মিলিয়ে মোট তিনটে ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি আমাদের। আমার ছেলেই সবকিছুর দেখাশোনা করে। স্ত্রী গত হয়েছেন।”

”আপনার ছেলেও এখানেই থাকে?”

শেখর চৌধুরী বললেন, ”না। ও বাইপাসের ধারে ফ্ল্যাট কিনেছে। সেখানেই স্ত্রীকন্যা নিয়ে থাকে। আমিই বলেছিলাম বিয়ের পর আলাদা থাকতে। দূরে থাকলে সম্পর্ক ভালো থাকে। ভালোই আছি। আর সে তো খুব ব্যস্ত, ব্যবসার নানা ডিলের জন্য দেশবিদেশ ট্যুর করতে হয়। তবে যতই ব্যস্ত হোক, এক দেড়মাস অন্তর বউ-মেয়েকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে।”

”কী নাম আপনাদের কোম্পানির?”

”মৃন্ময়ী টেক্সটাইলস।”

রুদ্রর চোখ চলে গেল অদূরে রাখা একটা বিশাল শো-পিসের দিকে। কোম্পানির বার্ষিক সম্মেলনে বানানো একটি আবক্ষ দুর্গামূর্তি। নিপুণ হাতের কাজ। মূর্তির নীচে লেখা ‘গোল্ডেন জুবিলি সেলিব্রেশন— মৃন্ময়ী টেক্সটাইলস পরিবার।’ কোম্পানির লোগোটিও দুর্গার ধাঁচের।

রুদ্রর মনে পড়ে গেল, চৌধুরীরা বংশানুক্রমে মা চণ্ডীর সেবাইত। মৃন্ময়ী মানেও তো দুর্গা।

ও আগ্রহী চোখে তাকিয়ে আছে দেখে শেখর চৌধুরী বললেন, ”আমাদের কারখানা একটা আস্ত পরিবার। আমাদের কর্মচারীরা একেবারে নিজেদের মতো।”

রুদ্র জিজ্ঞেস করল, ”আপনি এত বড় বাড়িতে একাই থাকেন?”

শেখর চৌধুরী হাসলেন। বললেন, ”হ্যাঁ। একাকীত্ব আমি বেশ পছন্দ করি। ঠিকে কাজের লোক আছে কয়েকজন, তবে তারা আসে চলে যায়।”

রুদ্র নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়ল। এখানে আর সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে প্রিয়াঙ্কা বলল, ”কী হবে বলুন তো, ম্যাডাম! এদিকে একটা একটা করে দিন কমছে।”

”কীসের দিন?”

প্রিয়াঙ্কা বলল, "আপনার ওই কৃষ্ণপক্ষ থিওরিটা ঠিক হলে এই মাসের কৃষ্ণপক্ষ তো শুরু হয়ে গিয়েছে। এই আগস্ট মাসের ৪ তারিখ থেকে ১৯ তারিখ, যে কোনোদিন আবার খুন হবে।"

মাথায় যখন দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ একসঙ্গে কাজ করা শুরু করে, তখন একটা অসম্ভব বিরক্তি এসে জাপটে ধরে। রুদ্ররও সেটাই হচ্ছিল। প্রিয়াঙ্কার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ও একটা নম্বরে ফোন করল।

নম্বরটা মিন্টু বলে একটা ছেলের। সে বদনপুর গ্রামে থাকে। পুলিশের ইনফর্মারের কাজ করে। লোকাল থানার ওসি আশুতোষ তরফদার, তিনিই খোঁজ দিয়েছেন। আজ সকালে কলকাতা আসার আগেও মিন্টুর সঙ্গে রুদ্রর কথা হয়েছে। রুদ্র তাকে যতটা সম্ভব খুলে বলেছে, যাতে ছেলেটার কাজ করতে সুবিধা হয়।

মিন্টু ফোন রিসিভ করে বলল, "আরে ম্যাডাম, আমি আপনাকেই কল করতে যাচ্ছিলাম। হেব্বি খবর আছে।"

"কী খবর?"

"কানু চক্রবর্তী যতই মুখ বুজে থাকুক, লোকটা অনেক কিছু জানে। রাতবিরেতে কার সঙ্গে ফোনে তর্কাতর্কি করে। হাউহাউ করে কাঁদে। আবার চিৎকারও করে।"

"কানু চক্রবর্তীর নম্বরটা আশুতোষবাবুকে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। দিয়েছি। উনি খোঁজ নিচ্ছেন। আপনি কী জানতে পারলেন?"

"বিশেষ কিছুই নয়। শেখর চৌধুরী বললেন, ওরকম কোনো ঘটনাই নাকি ঘটেনি। কানু চক্রবর্তীর সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির কেউ পালায়নি।"

"সে আবার কি!" গাড়ির হর্নের আওয়াজ পেরিয়ে মিন্টুর গলা শোনা গেল, "বললেই হল? মামদোবাজি নাকি! আমাদের এই গ্রামে তিনপুরুষের বাস। আমার ঠাকুমা এখনো বেঁচে, তিনি সব জানেন। ওই শেখর চৌধুরীর ভাইয়ের নাম ছিল শঙ্কর চৌধুরী। দুই ভাইয়ের বয়সের পনেরো ষোলো বছরের তফাত। শঙ্করের সঙ্গে ছোট থেকে বাড়ির লোকদের লাফড়া। কানু আর শঙ্কর ছিল গলায় গলায় বন্ধু, ওরা যখন পালায়, তখন বয়স তেরো কি চোদ্দো। কানু চক্রবর্তী গ্রামে ফিরে আসে প্রায় দশবছর পর। কিন্তু শঙ্কর হাওয়া হয়ে যায়।"

"শেখর চৌধুরী তাহলে জেনেশুনে মিথ্যা বললেন?" নিজের মনে ফিসফিস করল রুদ্র, "কিন্তু কেন?"

"আরও শুনুন। শেখর আর শঙ্করের মা ছিলেন আপনাদের সেই ত্রিবেণীর ভট্টাচার্য বাড়ির মেয়ে।"

"অ্যাঁ?" রুদ্র অবাক।

"ইয়েস ম্যাডাম। মৃন্ময়ী চৌধুরী। লেট নীলকণ্ঠ চৌধুরীর স্ত্রী। তাঁদের বিয়ের সময় হেব্বি ঝামেলা হয়েছিল।"

"কেন? ঝামেলা হয়েছিল কেন?"

"বাহ, চৌধুরীরা তো চণ্ডীর উপাসক। আর ওই ত্রিবেণীর ভটচায বাড়ি যে ঘোর বৈষ্ণব! ক্যাচাল হবে না? তবে নীলকণ্ঠ চৌধুরী ঠিক করেছিলেন, বিয়ে করলে তিনি ওই মৃন্ময়ীকেই করবেন।"

”ঠিক আছে আমি রাখছি। আর কিছু জানতে পারলে জানিও।”

রুদ্র বিহ্বল হয়ে ফোনটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন বাজল।

”হ্যাঁ স্যার বলুন।”

ওপাশ থেকে রাধানাথ রায়ের রাগত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ”তুমি কোথায় রয়েছ, রুদ্রাণী?”

রুদ্র বলল, ”ভবানীপুরে। ওই বদনপুর গ্রাম থেকে একটা ক্ল্যু পেয়েছিলাম, সেইজন্য ইন্টারো ...।”

রাধানাথ রায় এবার প্রায় চিৎকার করে বললেন, ”তুমি নিজেকে কী মনে করছ? একটা ইনভেস্টিগেশন টিমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে তুমি কোনো প্রোটোকল মানবে না? যাকে যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা জেরা করতে চলে যাবে? লিসন রুদ্রাণী, তোমাকে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। তোমার এইসব কাজের জন্য আমাকে অ্যাকাউন্টেবল হতে হয়। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট?”

”কী হয়েছে স্যার?” রুদ্র থতমত খেয়ে গেল। বলল, ”আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা।”

”তুমি একটু আগে যাকে তোমার তদন্তের জন্য জেরা করতে গিয়েছিলে, সেই ভদ্রলোকের অনেক উঁচুমহলে রেফারেন্স রয়েছে। উনি ফোন করে হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ জানিয়েছেন। তোমার জন্য কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে আমাকে কথা শুনতে হচ্ছে। তুমি জানো না, যে অন্য জুরিসডিকশনে ইনভেস্টিগেট করতে গেলে সেখানকার পুলিশের সঙ্গে আগে কথা বলতে হয়? যতই ক্ষমতা থাকুক রুদ্রাণী, আসলে আমাদের হাতপাগুলো বাঁধা। তুমি কি নিজেকে একজন গোয়েন্দা ভাবছ? তুমি জানো আমি ছুটিতে রয়েছি, এই সময়েও তোমার জন্য আমাকে এইসব পরিস্থিতি ফেস করতে হচ্ছে। বারবার তুমি আমাকে ইনসিস্ট করছ তোমার বিরুদ্ধে কোনো পিউনিটিভ অ্যাকশন নেওয়ার জন্য।”

রুদ্রর মেজাজটা তেতো হয়ে আসছিল। একটু আগে মিন্টুর মুখে শোনা চৌধুরীবাড়ি আর তর্কপঞ্চাননের বাড়ির যোগসূত্র খুঁজে পেয়ে যতটা উত্তেজনা হচ্ছিল, তা এখন প্রায় পুরোটাই স্তিমিত হয়ে আসছে।

মনে হচ্ছে, কাজটা যেন এখানে গৌণ, অফিসিয়াল নিয়মকানুনগুলোই মুখ্য। শেখর চৌধুরী যত ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোকই হোন, তাঁর যত ওপরমহলেই চেনাজানা থাকুক, রুদ্র তো তাঁকে কোনরকম অসম্মান করেনি। শুধু কয়েকটা তথ্য জানতে গিয়েছিল মাত্র!

হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ ওঠে কি করে! এত দ্রুত ওর যাওয়ার কথাটা স্যারের কাছে পৌঁছলই বা কী করে!

কিন্তু এত কথা ওর এই মুহূর্তে এস পি স্যারকে বলতে ইচ্ছে হল না। স্যার আরও কী সব বলে যাচ্ছিলেন, আওয়াজে ও ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছিল না। ও ম্লানগলায় বলল, ”স্যরি স্যার। এরকম আর হবে না।”

এস পি স্যার বললেন, ”তোমাকে যতটুকু কাজ দেওয়া হয়েছে, ততটুকুই করবে। আপাতত তোমার কাজ হল ডেইলি বেসিসে প্রোগ্রেস রিপোর্ট পাঠানো। আমি জয়েন

করলে নেক্সট স্টেপ ভাবা যাবে। রিমেম্বার, দিজ ইজ মাই ফাইনাল ওয়ার্নিং।”

”ওকে স্যার!” রুদ্র অন্ধকার মুখে ফোন রেখে দিল। স্যার খুব রেগে গিয়েছেন।

প্রিয়াঙ্কা বলল, ”এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি, ম্যাডাম?”

”পার্কস্ট্রিট। এশিয়াটিক সোসাইটি।” রুদ্র খুব আস্তে করে উত্তর দিল। ওর মনের মধ্যে কী যেন একটা খচখচ করছে। কিন্তু সেটা কি, তা ও কিছুতেই বুঝতে পারছেনা।

শেখর চৌধুরী নিজের ভাইয়ের ব্যাপারে এত বড় মিথ্যা বললেন কেন?

৩৭

দ্বারিকা মনে মনে হিসাব করছিল। ওদের বৈদিক সমাজের ব্রাহ্মণপল্লির মোট জনসংখ্যা হাজার দেড়েক হবে। তার মধ্যে পুরুষ আট-ন'শো। তার মধ্যে জনা আড়াইশো লোক কিছুদিন ধরেই ধাপে ধাপে উধাও হয়েছে সমাজ থেকে। তারা কোথায় গিয়েছে দ্বারিকা জানে না।

যত মানুষকে ও এখন দেখতে পাচ্ছে, তার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ওর মনে প্রশ্ন জাগছে, বৈদিক সমাজের সমস্ত পুরুষই কি আজ বাইরে বেরিয়ে এসেছে?

ওর প্রশ্নটা অমূলক নয়। গোলাপদীঘির পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত শস্যখেত, খেলাধুলার জন্য যে সবুজ মাঠ, প্রধান পুষ্করিণীর ওপারের আরেকটি শস্যখেত, সমস্ত স্থানেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাতাতে কাতারে মানুষ। কোনো সারি ব্রাহ্মণের, কোনো সারি তাঁতিদের, কোনো সারি আবার তিলি বা কামারদের।

একেবারে দক্ষিণের সারিগুলোতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কৈবর্ত ও বাগদিরা।

এখানে দ্বারিকার নিজের বাবা, দাদারাও কি রয়েছে? নিশ্চয়ই রয়েছে। বৈদিক সমাজের কঠোর নিয়ম, দশবছর বয়সে নারায়ণী চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মানসিকভাবে দূরত্ব বৃদ্ধি করতে হবে পরিবারের সঙ্গে। তাতে নাকি কিশোর বয়সে মনঃসংযোগের অভাব হয়। তাই এখানে প্রশ্রয় দেওয়া হয়না কোনরকম ঘনিষ্ঠতা। বাবা পৃথক সংসার পাতলেও দাদা আর সে তো এক ছাদের তলাতেই থাকে। কিন্তু তবু তেমন কথাবার্তা হয় না।

এতদিন ও যেন চোখ থাকতেও ছিল অন্ধ, সবকিছুকেই শাস্ত্রের অনুশাসন বলে মেনে নিত। সেই মেনে নেওয়ার অনেকটা স্থান জুড়ে থাকত ভয়। ওর সেই ভয় নিয়ে অচ্যুত মজা করত, হাসত।

অচ্যুত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি দ্বারিকার ভেতর বছরের পর বছর ধরে জাঁকিয়ে বসা ভয়টাকেও টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে?

নাহলে এত খোলামনে ভাবতে কবে থেকে শুরু করল ও?

হঠাৎ এক প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনিতে দ্বারিকার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। দেখল, দূরে বিষ্ণু মন্দির আর কীর্তন মঞ্চের দালান থেকে শাখে ফুঁ দিচ্ছে সমাজের মহিলারা। যেমন তেমন করে নয়, প্রত্যেকে যেন একই তরঙ্গে বাজিয়ে চলেছে শঙ্খ। অনেকক্ষণ ধরে একটানা, তারপর সামান্য থেমে দু'বার ছাড়া ছাড়া। তারপর আবার একটানা। এভাবেই চক্রাকারে গোটা বৈদিক সমাজে আবর্তিত হতে শুরু করল শঙ্খধ্বনি।

নিরবচ্ছিন্ন সেই ধ্বনি শুনতে শুনতে যেন ঘোর লেগে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন দেবলোকে পৌঁছে গিয়েছে।

প্রায় এক দণ্ড এইভাবে চলল। তারপর হঠাৎ একসময় থেমে গেল শঙ্খ। সকলেই যেন উঁকিঝুঁকি মেরে প্রণাম জানাতে লাগল একেবারে সামনে এসে দাঁড়ানো কাউকে উদ্দেশ্য করে।

গুরুদেব। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সদ্য স্নান করে উঠে এসেছেন প্রধান পুষ্করিণী থেকে। পরনে শ্বেতশুভ্র ধুতি। নিরাবরণ ঊর্ধাঙ্গে শোভা পাচ্ছে সামবেদী উপবীত। গুরুদেবের দুই পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কৃষ্ণকান্ত লাহিড়ী, গোপাল ব্যানার্জি এবং তরুণ শিক্ষক বংশীধর।

দ্বারিকা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়েও ওদের শ্রেণীশিক্ষক মধুসূদনকে দেখতে পেল না।

ও মনে করতে চেষ্টা করল। আজ কী বার? গুরুদেব তো প্রতি বুধবার উপস্থিত থাকেন এখানে। আজ কি বুধবার?

হঠাৎ সমস্ত নৈঃশব্দকে খান খান করে দিয়ে গুরুদেবের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"শুভমস্তু। আজ পবিত্র বৈদিক সমাজের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। আগামীকাল মাহেন্দ্র মহোৎসব। মহোৎসব অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যজন্মতিথি। আর মাহেন্দ্রযোগ শুধু এইবছরেই রয়েছে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ পক্ষের এই অষ্টমী তিথিতে যখন রোহিণী নক্ষত্র তার প্রাধান্য বিস্তার করছিল, তখনই দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ। দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রের যুগে যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। যিনি আদতে সমগ্র মহাভারতের মহানায়ক ও প্রাণপুরুষ। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দুর্বাসার আতিথ্য থেকে শুরু করে যুদ্ধক্ষেত্রে বারবার অর্জুনকে প্রতিটি মুহূর্তে কূটনৈতিক পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন কৃষ্ণ। বলেছেন,

"যদা যদা হি ধর্মস্য

গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য

তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

পরিত্রাণায় সাধুনাং

বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।।

ধর্মসংস্থাপনার্থায়

সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

গুরুদেব কিছুক্ষণ থামলেন। একঝলক চোখ বুলিয়ে নিলেন সকলের ওপর। তারপর ইঙ্গিত করলেন গোপাল ব্যানার্জিকে।

গোপাল ব্যানার্জি সামান্য গলা পরিষ্কার করে এগিয়ে এলেন। বললেন, "বাবাসকল! আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশবছর আগের এক পুণ্যলগ্নে পাপে নিমজ্জিত আধুনিক সমাজ ত্যাগ করে এসে আমাদের বৈদিক সমাজ শুরু হয়েছিল। তখন আমরা যে কয়েকজন মিলে আমাদের প্রথম গুরু ও বর্তমান গুরুদেবের সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ আর ইহলোকে নেই। থাকলে তাঁরা হয়তো সাক্ষী হতেন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের। যে মুহূর্তে শুরু হবে যুগাবসানের মহৎ প্রক্রিয়া। শুভসূচনা হবে মাহেন্দ্রমহোৎসবের।"

দ্বারিকা যত শুনছিল, ওর মনের ভেতর রাগ উত্তরোত্তর বাড়ছিল। পুতুর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এই গোপাল ব্যানার্জিকে দেখলেই ওর অসম্ভব রাগ হয়। পুতুর মতো একটা শিশুকে যে প্রৌঢ় বিবাহ করতে পারেন, সে বিকৃতকাম ছাড়া আর কি? দ্বারিকার মনে পড়ে যায় অচ্যুতের কথাগুলো।

"শোন দ্বারিকা, আমাদের এই সমাজের নাম বৈদিক সমাজ বটে, কিন্তু আসলে বৈদিক কোনো রীতিনীতিই এখানে অনুসরণ করা হয় না। বৈদিক যুগে মেয়েরা অনেকেই বিবাহ করতেন না। তাঁরা বেদ পড়তেন, পড়াতেন এবং জ্ঞানার্জনের জন্য নানা দেশে যেতেন। নিয়মিত দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনায় অংশ নিতেন। তাঁদের বলা হত ব্রহ্মবাদিনী। এমনকি তাঁদের উপনয়নও হত। গরুড়পুরাণ পড়ার সময় মিনা ও বৈতরণী নামে দুজন

ব্রহ্মবাদিনীর কথা পেয়েছিলি, মনে করে দ্যাখ। এছাড়াও গার্গী, অপালাদের নাম তো শুনেইছিস।"

"কোনো মেয়েই বিবাহ করত না? তা কী করে হয়?" দ্বারিকা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।

অচ্যুত বলেছিল, "যারা বিবাহ করতেন, তাঁরা উত্তমরূপে শিক্ষিত হয়ে যুবতীদশায় বিবাহ করতেন। তাঁদের বলা হত সদ্যোদ্বাহা। বৈদিকযুগে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাও নিষেধ ছিল না, এইসব বাচ্চাবয়সে তাঁদের বিবাহ দেওয়াও হত না। পরের কয়েকশো বছরে নানা অপভ্রংশে এইসব কুসংস্কার জাঁকিয়ে বসেছে আমাদের সমাজে।"

"সে কিরে!" দ্বারিকা অবাক হয়ে বলেছিল, "তবে ক্ষমাকে জোর করে ওর বরের সাথে সহমরণে পাঠানো হচ্ছিল কেন? ব্রজেন্দ্রদাদা তো তবে কোনো অন্যায় করেনি ক্ষমাকে বাঁচাতে চেয়ে?"

অচ্যুত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দাঁতে দাঁত চিপেছিল, "আমাদের এই সমাজ অনেকগুলো মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, দ্বারিকা! এখানে সবাই অন্ধ। কেউ জেনে অন্ধ। কেউ না জেনে।"

তরুণ শিক্ষক বংশীধরের উদাত্ত কণ্ঠে দ্বারিকা আবার বাস্তবের মাটিতে ফিরে এল।

"কলিযুগের শেষ ঘনিয়ে এসেছে দুশো বছর পূর্বেই। পরম গুরুর জন্ম হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যেই। পিতার প্রায় বার্ধক্যে দৈব নির্দেশেই ভগবান বিষ্ণু ধরাধামে এসেছিলেন 'জগন্নাথ' নাম নিয়ে।

"কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, পরম গুরু তাঁর সেই কাজ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। সেই কাজকে সফল করতে পরবর্তীকালে আমাদের যুগপুরুষ প্রথম গুরু চেষ্টা করেছিলেন। সফল না হলেও আজকের এই পথ সুগম করে দিয়ে গিয়েছেন তিনিই।

"কোনো সন্দেহ নেই, আমাদের বর্তমান গুরুদেবই কল্কি অবতার। যিনি তাঁর দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ করে এসেছেন গোটা কলিযুগের অবসান ঘটাতে। যিনি ভগবান বিষ্ণুর অন্তিম অবতার। পৃথিবী এখন পাপের পাঁকে নিমজ্জিত। অপরাধ ও নির্মমতা মানুষের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে পড়েছে। আধুনিক সভ্যতার অভিশাপে মানুষ এখন যন্ত্র, তার মধ্যে নেই কোনো মনুষ্যত্ব, মমত্ব। শাসক এখন দুরাচারী, দুষ্কৃতিরা আজ সমাজপতি। কল্কি অবতার তাই অবসান ঘটাবেন এই কলঙ্কিত কলিযুগের। তাঁর হাত ধরে পুনরাগমন ঘটবে সত্য যুগের।

"এই কাজের শুরু হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে। আমাদের নারায়ণী সেনারা সকলের অলক্ষ্যে ছড়িয়ে গিয়েছেন কলুষিত পৃথিবীর সেই ভরকেন্দ্রে, যেখানে পাপে নিমজ্জিত হয়ে আরাধনা করা হচ্ছে ভগবানের। এবং তা দ্বিগুণ অপরাধ।"

পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা চাপা কণ্ঠস্বরের কথোপকথনে দ্বারিকার শ্রবণে বারবার বাধা পড়ছিল।

"আজ রাতেই সারতে হবে।"

"আমরা কি তাহলে যাব না?"

"না। আমরা গেলে এই কাজটা করবে কে? গুরুদেব জানলে মত দেবেন না। হাজার হোক, স্বামীর চিতা ছাড়া সতীদাহ করা যায় না। পরে প্রজ্বলনের কোনো গুরুত্ব নেই। পুণ্যও নেই।"

"তাহলে পরে শুনলে তো রেগে যাবেন!"

"রাগলেও তা সাময়িক। গেরস্থবাড়িতে এত বড় পাপ রয়েছে, তাতে আমাদেরও তো পাপ হচ্ছে। পরজন্মে গিয়ে সেগুলোর হিসেব কে দেবে শুনি? ভয় পাস না। এখন তো আর ব্রজেন্দ্র নেই।"

দ্বারিকা আড়চোখে ঘাড় ঘোরাল। কেষ্টহরি ঘোষালের দুই ছেলে নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করছে।

পুরো বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করতে কয়েক মুহূর্ত লাগল দ্বারিকার। সতীদাহ, পাপ, ব্রজেন্দ্র, এইসব টুকরো টুকরো শব্দগুলো নিজের মতো করে জোড়া লাগানো মাত্র কেঁপে উঠল ও। আগে হলে হয়তো ভয়ে কাঁপত, কিন্তু অচ্যুত চলে গিয়ে ওকে সাহস জুগিয়ে দিয়ে গিয়েছে বলেই বোধ হয় ও রাগে কাঁপতে লাগল।

গ্রামে ফিরে আসা ক্ষমার সরল নিষ্পাপ মুখটা ওর আবার মনে পড়ে গেল। মা কথায় কথায় বলেছিলেন, মেয়েটাকে নিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ির সকলে কতটা অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। এমনকি মেয়েটার নিজের বাবা থাকোগোপালও পাপের ভয়ে রুষ্ট।

আজ রাতে তার মানে ক্ষমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে? ওকে মারার জন্যই ধরে নিয়ে এসেছে কেষ্টহরি ঘোষালের ছেলেরা?

বংশীধর বলে চলেছিলেন, "এখানে যারা ব্রাহ্মণ, প্রত্যেকে কোনো না কোনো সময় শিক্ষালাভ করেছেন আমাদের নারায়ণী চতুষ্পাঠীতে। তাই প্রবীণ থেকে নবীন, সকলেই আপনারা নারায়ণী সেনা। নিশ্চয়ই বিস্মৃত হননি, শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব একটি অসম শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল, যার নাম নারায়ণী সেনা। দুর্ধর্ষ সেই সংসপ্তক সেনাবাহিনী শ্রীকৃষ্ণ গড়ে তুলেছিলেন নিজরাজ্যকে প্রতিরক্ষায়। আমরাও কল্কি অবতারের, আমাদের গুরুদেবের নারায়ণী সেনা। তাই আমরা, এই বৈদিক সমাজের প্রতিটি ব্রাহ্মণ বহন করে চলেছি শ্রীকৃষ্ণের একেকটি নাম। নির্ভীকভাবে আমরা লড়াই করবো আমৃত্যু।

"কুরুক্ষেত্রের মতো এখানেও লড়তে লড়তে মৃত্যু হলে আমরা স্বর্গেই যাব। আমরা নেতৃত্ব দেব কায়স্থ, নবশায়ক ও তিলিকৈবর্তদের। শ্রদ্ধেয় প্রথম গুরুর জন্মশতবর্ষে এই অর্ঘ্যই দেব আমরা।"

ভগবান বিষ্ণু

পরম গুরু জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

।

প্রথম গুরু গোপালকৃষ্ণ মহারাজ

।

বর্তমান গুরুদেব (কল্কি অবতার)

দ্বারিকা শুনছিল বংশীধরের কথা। ওরা সকলে নারায়ণী সেনা? সত্যিই গুরুদেব নিজে ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতার?

নারায়ণী সেনারা কুরুক্ষেত্রে লড়েছিল, ওরা কোথায় লড়বে? আর কেনই বা লড়বে? এই পঙ্কিল সমাজের জন্য?

যেখানে প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত হচ্ছে পাপ, অন্যায়, অবিচার?

৩৯

পার্কস্ট্রিটের একনম্বর বাড়িটাই হল এশিয়াটিক সোসাইটি। ব্যস্ত রাজপথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একভাবে। সকাল এগারোটা। সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে অজস্র গাড়ি। অদূরেই পার্ক স্ট্রিটের নামীদামি সব রেস্তোরাঁ। তাদের দিন সবে শুরু হচ্ছে। ঝাঁপ খুলছে একে একে।

প্রিয়াঙ্কা রুদ্রর পিছন পিছন ঢুকছিল। সামনে লাগানো প্রস্তরফলকটা দেখে বলল, ”বাপরে! ১৭৮৪ সালে তৈরি হয়েছিল। এখানে কী থাকে, ম্যাডাম? বই?”

রুদ্র উত্তর দিল, ”বই ঠিক নয়। এখানে বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আছে। অধিকাংশই সংস্কৃত। তাছাড়াও বহু দুষ্প্রাপ্য বই, মানচিত্র …।”

রুদ্রর কথা শেষ হওয়ার আগেই শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসেছেন একজন কর্মচারী। বাইরে পুলিশের গাড়ি দেখে বোধ হয় দ্বাররক্ষক গিয়ে খবর দিয়েছে তাঁকে।

রুদ্রর কাঁধে দুটি তারা সহযোগে ‘আই পি এস’ এমব্লেম দেখে তিনি সসম্ভ্রমে বললেন, ”নমস্কার ম্যাডাম।”

”নমস্কার। চন্দননগর কমিশনারেট থেকে আসছি, আমি এ এস পি রুদ্রাণী সিংহরায়।” রুদ্র হাতজোড় করে নমস্কার করল, ”আপনাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলা যাবে?”

”হ্যাঁ। নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু উনি তো একটু পরে আসেন। আমি চিফ লাইব্রেরিয়ান। আমার নাম সমর বসু। আপনারা আমার চেম্বারে এসে বসতে পারেন।” ভদ্রলোক বললেন।

”ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা নেই।” রুদ্র পা বাড়াল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, ”ততক্ষণ না হয় আপনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলি। এইট্টিন্থ সেঞ্চুরির বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন? আইনের বই লিখেছিলেন। এখানে তাঁর কোনো ম্যানুস্ক্রিপ্ট আছে?”

সমর বসু খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললেন, ”অবশ্যই। আমাদের এই এশিয়াটিক সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জানেন তো? সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স। তিনি ছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওই আইন জাতীয় বই লেখার সুবাদেই দুজনের হৃদ্যতা বাড়ে। আটানব্বই বছর বয়সে তর্কপঞ্চানন আটশো পৃষ্ঠার বিবাদভঙ্গার্ণব বইটি লেখা শেষ করেছিলেন।”

* * *

এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বেরোতে বেরোতে বিকেল চারটে বেজে গেল। রুদ্র যতক্ষণ ম্যানুস্ক্রিপ্ট ডিভিশনে সমরবাবুর সঙ্গে এদিক ওদিক ঘাঁটছিল, প্রিয়াঙ্কা ততক্ষণ বাইরে বসেছিল।

সব কাজ শেষে রুদ্র বাইরে বেরোতে বেরোতে সমরবাবুর দিকে ফিরে বলল, ”হ্যাঁ, আপনি যা বলছিলেন। এইরকম মাইক্রোফিশ আপনাদের সংগ্রহে কত আছে, সমরবাবু?”

সমর বসু উত্তর দিলেন, ”প্রায় পঞ্চাশ হাজার।”

রুদ্র বলল, "আপনি ওই ম্যাপটা আর ওই ক'টা মাইক্রোফিশ আমাকে তাহলে স্ক্যান করে ...।"

"হ্যাঁ, সে বলতে হবেনা।" সমরবাবু বললেন, "আমি আপনাকে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই সব পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ!"

প্রিয়াঙ্কা রুদ্রকে দেখতে পাওয়া মাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ম্যাডাম, সুগন্ধা থানার ওসি আশুতোষ তরফদার ফোন করেছিলেন। আপনাকে না পেয়ে আমাকে। ওই কানু চক্রবর্তীর সঙ্গে থাকা ছেলেটা আজ ভোরে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।"

"হোয়াট!" রুদ্র স্তম্ভিত হয়ে গেল।

"ইয়েস ম্যাডাম।" প্রিয়াঙ্কা বলল, "ভোরবেলা সে নাকি মন্দিরের পেছনের জঙ্গলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি।"

"ভোরবেলা সে জঙ্গলে গিয়েছিলই বা কেন?"

"বলতে পারব না ম্যাডাম। থানা থেকে আশপাশের সব জায়গা সার্চ করা হয়েছে। কানু চক্রবর্তীকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গেছে। আপনি কি এখন একবার যাবেন?"

রুদ্র উত্তর না দিয়ে ফোন করল লোকেশবাবুকে। রাগে ওর কপালের রগদুটো দপদপ করছিল। লোকেশবাবু 'হ্যালো' বলামাত্র ও স্থান কাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, "আপনাকে বলেছিলাম, কানু চক্রবর্তীর সঙ্গে থাকা ছেলেটাকে টাইট সিকিউরিটি দিতে। প্রয়োজনে কোনো ক্লু দেখিয়ে কয়েকদিনের জন্য থানায় নিয়ে গিয়ে লক আপে পুরে রাখতে। আপনি সেই ব্যবস্থা করেননি?"

যথারীতি সেই খোলকরতালের আওয়াজ। তার মধ্যেই লোকেশবাবুর অপরাধী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "স্যরি ম্যাডাম, একদম ভুলে গিয়েছি। আসলে এখানে দিনরাত এত কাজে ব্যস্ত ...!"

"রাবিশ!" রুদ্র দাঁতে দাঁত চিপে বলল, "ওখান থেকে ফিরে এসে আর ডিউটিতে জয়েন করবেন না। আমার অফিসে এসে সাসপেনশন অর্ডার নিয়ে যাবেন।"

"এত চেষ্টা করেও ছেলেটাকে আটকাতে পারলাম না। ঠিক ক্ষমার মতোই ...!" ফোনটা রেখে ও আফসোসের ভঙ্গিতে কয়েক মুহূর্ত দীর্ঘশ্বাস নিল। তারপর নিজেকে কিছুটা সংযত করে গাড়িতে উঠে বসল।

"এখন কোথায় যাবেন ম্যাডাম।"

"সুগন্ধা।" রুদ্র ছোট্ট করে উত্তর দিল। নিজের মনে একের পর এক ঘটনাগুলো ও সাজাচ্ছিল।

১। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের এক দত্তক নেওয়া বংশধর গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আমেরিকার আমীশ সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাতেও এমনই কোন আমীশ সমাজ গড়ে তোলার চিন্তা করেন।

২। দেশে ফিরে তিনি বাংলার কোথাও, সম্ভবত গঙ্গা নদীর তীরে সেই সমাজ গড়ে তোলেন। সেই সমাজ থেকে পালিয়ে আসা শিবনাথ বিশ্বাস বা মহম্মদ তারেককে একে একে খুন করা হয়েছে। প্রতিটি কৃষ্ণপক্ষে। যে সাতটি মানুষ খুন হয়েছে, প্রত্যেকেই এমন পেশার সঙ্গে জড়িত ছিল, যেটা আমীশ সমাজের কাছে পাপ।

হত্যার কারণ কি শুধুই তাই?

কী চাইছে তারা?

৩। বাংলার সেই আমীশ সমাজের সঙ্গে কি বাগডাঙার ওই সরলাশ্রমের কোনো যোগ আছে? সরলাশ্রমের সেই বইয়ের আলমারিতে বিবাদভঙ্গার্ণব কেন? কেনই বা শেষ দিন আশ্রম সুনসান ছিল? স্বপন সরকার ওই আশ্রমে কেন যেতেন?

৪। কানাই, বলরাম, গোবিন্দ, শ্যামসুন্দর। এদেরকে কি আধুনিক জগতে পাঠানো হয়েছিল শুধুমাত্র ভিক্টিমের সঙ্গে সখ্যতা করে পৃথিবী থেকে সরানোর জন্য? তাই যদি হয়, তবে এই মাসের ৪ থেকে ১৯ কৃষ্ণপক্ষ, এইসময় কোথায় খুন হবে? কে খুন হবে?

৫। প্রতিটি খুন নদীর পাশের টাউনে হয়েছে। তারা যদি খুনের জন্য নদীপথ ব্যবহার করে থাকে, তবে তারা থাকে কোথায়? বদনপুরে একে একে পালিয়ে এসেছে মহম্মদ তারেক ও এখনকার কানু চক্রবর্তীর কাছে থাকা ছেলেটি। তবে কি বদনপুর গ্রামের কাছাকাছি কোথাও তাদের আস্তানা?

৪০

সুগন্ধা থানাটা ছোট হলেও ভেতরে যে একটামাত্র লক-আপ সেটা বেশ বড়। কোর্টে চালান দেওয়ার আগে পর্যন্ত স্থানীয় অপরাধীদের এখানেই রাখা হয়। কম ব্যবহৃত হয় বলেই বোধ হয় অন্যান্য থানার লক-আপের মতো অতটা নোংরা নয়।

রুদ্র আর প্রিয়াঙ্কা যখন ঢুকল, তখন ঘড়িতে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

ফোনে সব কথাবার্তা হয়েই ছিল, থানার ওসি আশুতোষ তরফদার বেশ খানিকক্ষণ রুদ্রকে এলাকার সুস্বাদু শিঙাড়া খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি করে বিফলমনোরথ হয়ে অবশেষে ওকে নিয়ে গেলেন লক-আপের কাছে।

লক-আপের ভেতরে কানু চক্রবর্তী চুপ করে মাটিতে বসেছিল। নিজের ঘর থেকে যখন তাকে তুলে আনা হয়, তখন সে নাকি কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি করেনি। মিন্টুও ছিল সেইসময় পুলিশের সঙ্গে। ছেলেটাকে সেও কোথাও দেখতে পায়নি।

ওসি লক আপের এপারে দাঁড়িয়ে রুদ্রর দিকে সামান্য ঝুঁকে ফিসফিস করলেন, "ম্যাডাম, এসে থেকে কোনো কথা বলছে না। আমরা অনেকরকম ভাবে জেরা করেছি।"

রুদ্র লক আপের ওপারে বসে থাকা কানু চক্রবর্তীকে দেখছিল ভালো করে। কপালের ওপর দিয়ে খয়েরি মতো কিছু একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। সেটা কী?

আশুতোষ তরফদারকে জিজ্ঞেস করতে তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, "দেখেছি ম্যাডাম। কপালে একটা ইনজুরি আছে। কোথায় লেগেছে জানতে চাইলে কিছুতেই বলছে না। আজকের দিনটা দেখবো, কাল থেকে কড়া ডোজ দেব।"

রুদ্র আবারও তাকাল লক-আপের ভেতরে। কানু চক্রবর্তী হাঁটুদুটো বুকের কাছে জড়ো করে শক্ত হয়ে বসে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কাঁচাপাকা চুলগুলো এলোমেলো।

চোখ দিয়ে ওটা কী নেমেছে? জলের ধারা?

আলো-আঁধারিতে রুদ্র ভাল করে বুঝতে পারল না।

ওরা যে এতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কানু চক্রবর্তীর দৃষ্টি একবারের জন্যও মেঝে থেকে উত্থিত হয়নি। কে আসছে, কে যাচ্ছে তা নিয়েই যেন তার কোনো মাথাব্যথা নেই।

রুদ্র ওসি আশুতোষ তরফদারের দিকে তাকাল, "আমি একটু ভেতরে গিয়ে একা কথা বলব। প্রিয়াঙ্কা থাকুক আমার সঙ্গে।"

"নো প্রবলেম ম্যাডাম।" ওসি ও তাঁর কনস্টেবল লক-আপের দরজাটা টেনে রুদ্র আর প্রিয়াঙ্কাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

দরজার বাইরে শুধু দাঁড়িয়ে রইল একজন গার্ড।

রুদ্র দ্রুত চারপাশে চোখ বোলাল। অদূরে সামান্য আড়াল করা শৌচব্যবস্থা। সেখান থেকে খুব মৃদু হলেও প্রস্রাবের ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে। অন্যদিকে একটা তক্তা। তক্তার

পাশে ছোট টুল।

একটা হলদে বাল্ব জ্বলছে ঘরের মাঝখানে। কানু চক্রবর্তী একইরকম পাথরের মতো মুখ করে বসে রয়েছে।

রুদ্র বলল, "আপনার সঙ্গের ছেলেটি কে, কানুবাবু? সে কোথায়?"

কানু চক্রবর্তীর চোখের পাতাগুলো সামান্য কেঁপেই আবার স্থির হয়ে গেল।

রুদ্র আবার জিজ্ঞেস করল, "আমি জানি আপনি অনেক কিছু জানেন। আপনি যদি মুখ খোলেন, আমাদের তদন্তে অনেক সুবিধা হবে।"

এবারেও কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

রুদ্র এবার টুলটা টেনে নিয়ে এসে কানু চক্রবর্তীর মুখোমুখি বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "শঙ্কর চৌধুরী কোথায়, কানুবাবু? আপনারা তো একইসঙ্গে বদনপুর ছেড়েছিলেন। আপনি একা ফিরে এলেন কেন?"

কানু চক্রবর্তী এবার সামান্য চমকাল। তারপর দাঁড়িগোঁফের ফাঁক দিয়ে সামান্য কিছু বিড়বিড় করল। তারপর আবার চুপ করে গেল।

রুদ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দেখুন কানুবাবু, আপনি যতই লুকনোর চেষ্টা করুন, আমরা কিন্তু সব জেনে গিয়েছি। শঙ্কর চৌধুরীর সঙ্গে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পারিবারিক যোগ বা আপনার সঙ্গের ওই ছেলেটি যেখান থেকে পালিয়ে এসেছে, তারা যে আধুনিক সভ্যতাকে কতটা ঘৃণা করে, তাও জানতে পেরেছি আমরা। ওখান থেকে যারাই পালিয়ে এসেছে, তাদেরকেই তারা খুন করেছে। আপনি এইভাবে নিরপরাধ মানুষদের হত্যাকে সমর্থন করেন?"

এবার কানু চক্রবর্তীর ডানদিকের চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

রুদ্র বলে যেতে লাগল, "এবং এর পরের খুনটাও হবে খুব শীগগিরই। এই কৃষ্ণপক্ষেই। এরপরেও আপনি যদি পুলিশকে কিছু খুলে না বলেন, আমি কিন্তু ওসির মার থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারব না।"

কানু চক্রবর্তী একভাবে বসে রইল।

রুদ্র এবার সুর কিছুটা নরম করল। বলল, "বলুন কানুবাবু। কী চায় তারা? কেন এভাবে একের পর এক মানুষ মারছে? এরপর তাদের পরিকল্পনা কী?"

কানু চক্রবর্তী এবারেও কোনো উত্তর দিল না। প্রিয়াঙ্কা একটু কড়া গলায় বলে উঠল, "কী ব্যাপার, কথা কি কানে যাচ্ছে না, নাকি? ম্যাডাম কী জিজ্ঞেস করছেন, বলতে পারছেন না?"

আরো তিন-চারবার পীড়াপীড়ির পর রুদ্র হতাশ মুখে উঠে দাঁড়াল। বোঝাই যাচ্ছে কানু চক্রবর্তীর কাছ থেকে কোনো কথা আদায় করা যাবে না। তবু ও শেষ চেষ্টা করল।

"বলুন প্লিজ। কানুবাবু। ওরা কী চাইছে? আপনি কেন এভাবে মানুষ খুনে মদত দিচ্ছেন?"

মিনিট তিনেক পর রুদ্র আর প্রিয়াঙ্কা যখন সেল থেকে বেরিয়ে আসছে, গার্ড সেলে চাবি লাগাচ্ছে, পেছন থেকে কানু চক্রবর্তীর জড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

”আ-আমি মদত দিইনি!”

রুদ্র উদগ্রীব হয়ে পেছন ফিরল। বলল, ”তবে? তবে কেন আপনি কিছু বলছেন না কানুবাবু?

”ছেলেটাকে ওরা জোর করে ... আমি বাধা দিয়েছিলাম! প্রতিবারই দিই। কিন্তু কেউ শোনেনা আমার কথা!”

”কারা শোনেনা?” রুদ্র এগিয়ে এল কানু চক্রবর্তীর দিকে, ”কারা জোর করে ছেলেটাকে নিয়ে গেল কানুবাবু? বলুন। আপনি যা জানেন, বলুন প্লিজ!”

”রাধা ... আমার রাধা সব জানে!” হঠাৎ ঘোলাটে চোখে বিড়বিড় করে উঠল কানু চক্রবর্তী।

”রাধা? রাধা কে?” রুদ্র ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

কানু চক্রবর্তী কেমন অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসল। ফিসফিস করে বলল, ”আমি তো কানু। আর কানুর রাধাকে চেনেন না?”

প্রিয়াঙ্কা এবার ধমকে উঠল, ”ইয়ার্কি হচ্ছে ম্যাডামের সঙ্গে? জুতিয়ে মুখ লাল করে দেব!”

কানু চক্রবর্তীর চোখদুটো দপ করে জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল। কিন্তু কালো ঠোঁটদুটো বিড়বিড় করতে লাগল, ”বললাম তো। আ-আমার রাধা জানে!”

রুদ্র আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না। কানু চক্রবর্তীর চোখ এবার সম্পূর্ণ বুজে গিয়েছে। ঘাড় কাত হয়ে হেলে পড়েছে একদিকে।

মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে সাদা ফেনা।

৪১

প্রিয়ম অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। সারাদিন অফিসে একটানা কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, টানা দশ-বারো ঘণ্টার মাথার পরিশ্রমের পর রাতের ঘুমের সময় কোন হুঁশ থাকেনা। যে কোনো পছন্দের একটা বই নিয়ে শোয়, দু-তিন পাতা পড়ার পরই চোখ ভারী হয়ে আসে।

কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ওর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল, রুদ্র উদগ্রীব হয়ে ওর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে ডাকছে।

"ওঠো, ওঠো! শীগগিরই ওঠো!"

"কী হল?" প্রিয়ম ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘড়িতে রাত সাড়ে বারোটা। বিছানা লাগোয়া পড়ার টেবিলে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। রুদ্র তার মানে এতক্ষণ পড়াশুনো করছিল।

রুদ্রর চোখমুখ উত্তেজিত। বলল, "আট নম্বর খুনটা হবে নবদ্বীপে!"

প্রিয়ম বলল, "মানে? নবদ্বীপ কোথা থেকে এল? নবদ্বীপ তো হুগলীতে নয়!"

"হুগলী টুগলী কোনো ফ্যাক্টর নয়। ওটা আমাদের একটা ভাঁওতা দেওয়ার চেষ্টা। দ্যাখো!" রুদ্র ল্যাপটপে একটা ডকুমেন্ট খুলল। বলল, "এটা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের প্রামাণ্য জীবনীচরিত। প্রায় দেড়শোবছর আগের লেখা, এখন আর পাওয়া যায় না। আজ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে আমাকে ইমেল করেছে। এই বইতে কীভাবে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কিংবদন্তী হয়ে উঠলেন, লেখা রয়েছে।"

প্রিয়ম ঝুঁকে পড়ে দেখল, "এটা তো সংস্কৃত?"

"হ্যাঁ।" রুদ্র বলল, "নীচের ট্রান্সলেশনটা দ্যাখো। এশিয়াটিক সোসাইটির সমরবাবু খুব কাজের মানুষ। এক রাতের মধ্যেই সবকিছু আমাদের কথ্য বাংলায় ট্রান্সলেট করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 'দশানন বধ' নামক একটা সংকল্প নিয়েছিলেন। বাংলার আটটি স্থানে আটজন পণ্ডিতকে বাকযুদ্ধে বধ করার সংকল্প। প্রথমে তিনি এক পৌষ সংক্রান্তিতে ত্রিবেণীতে আয়োজিত এক বিখ্যাত তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন রামকান্ত তর্কবাগীশ নামক খ্যাতনামা পণ্ডিতকে। সেই শুরু হয় তাঁর জয়যাত্রা। পরের মাসে তিনি একাই ধরাশায়ী করে দেন ফরাসডাঙার পণ্ডিতদের। তার পরের মাসে বৈদ্যবাটি। তার পরের মাসে ওলন্দাজনগর। তার পরের মাসে কনেনগর। তারপর আবার নিজের ত্রিবেণীতে। তারপরের মাসে বংশবাটি রাজবাড়ির বেদান্তযুদ্ধ। গোঁড়া পণ্ডিতরা সকলে মিলেও জগন্নাথের অদ্বৈতবাদকে অসার প্রমাণ করতে পারেননি।

"এরপর সবশেষে নবদ্বীপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সেই বিখ্যাত বাজপেয় যজ্ঞ। ততদিনে ত্রিবেণীর জগন্নাথ পণ্ডিত একাই ম্লান করে দিয়েছেন নবদ্বীপের দর্প। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা নিজেদের পাণ্ডিত্য ও কৌলীন্যের অহংকারে ডগমগ হলেও বাজপেয় যজ্ঞের নানা আলোচনায় কেউ দাঁড়াতে পারেননি তর্কপঞ্চাননের সামনে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজেও জগন্নাথ পণ্ডিতের ওপর বিরূপ ছিলেন। তাঁর সামনেই নবদ্বীপের এক

পণ্ডিত কথা কথায় দম্ভভরে বলছিলেন, ''মা সরস্বতী সারাদিনে অন্তত একবার নবদ্বীপে অধিষ্ঠিত হতে বাধ্য হন, কোনো না কোনো পণ্ডিতের ভদ্রাসনে ... ।

''ইঙ্গিতটি পরিষ্কার। নবদ্বীপে অসংখ্য পণ্ডিত, কিন্তু ত্রিবেণীতে একজনই। অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ।

জলঙ্গী
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর
চূর্ণী
কালনা
শান্তিপুর
উ
রাণাঘাট
(রণারঘাঁটি)
চাকদহ(চক্রদহ)
গঙ্গা (হুগলী নদী)
ত্রিবেণী
বাঁশবেড়িয়া (বংশবাটি)
কাঁচড়াপাড়া(কাঞ্চনপল্লী)
আদিসপ্তগ্রাম
ব্যাণ্ডেল(বন্দর)
চুঁচুড়া(ওলন্দাজনগর)
কাঁকিনাড়া(ভাটপাড়া)
চন্দননগর(ফরাসীডাঙ্গা)
ভদ্রেশ্বর
বৈদ্যবাটী
ব্যারাকপুর(চাণক)
খড়দহ
শ্রীরামপুর(ফ্রেড্রিকনগর)
রিষড়া
সোদপুর
কোন্নগর(কনেনগর)
উত্তরপাড়া
হাওড়া
উলুবেড়িয়া
কলিকাতা
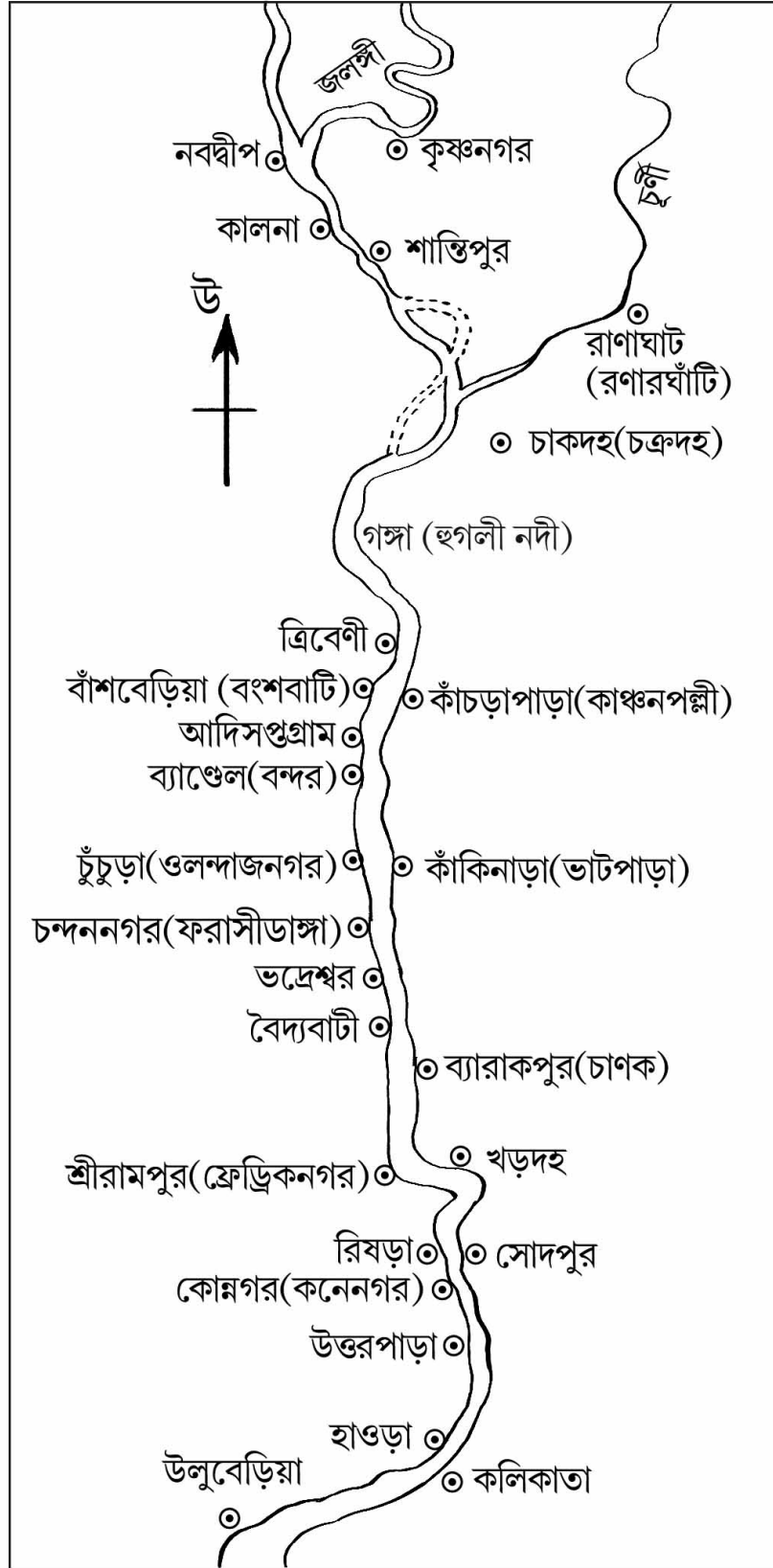
"জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, "ওখানেই নবদ্বীপের সঙ্গে ত্রিবেণীর পার্থক্য। নবদ্বীপে দিনে একবার, কিন্তু ত্রিবেণীতে দেবী সরস্বতী দিবারাত্র অধিষ্ঠান করেন।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রসহ সভার সকলেই চমকে উঠলেন জগন্নাথের আত্মপ্রশংসায়।

তখন সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ হেসে বললেন, "কী আশ্চর্য! বুঝতে পারলেন না। ত্রিবেণীতে তো সরস্বতী দিবারাত্র বয়ে চলেছেন। নবদ্বীপে সেই নদী কোথায়?"

রুদ্র থামল। টেবল ল্যাম্পের হলদে আলোয় ওর মুখটা জ্বলজ্বল করছিল। বলল, "তুমি যদি দ্যাখো, জগন্নাথের বিভিন্ন স্থানের বাকযুদ্ধের সঙ্গে আমাদের খুনের ভেন্যুগুলো পুরো মিলে যায়। এমনকি তিথিও। আমরা ভাবছিলাম হুগলী জেলার মধ্যে খুন। কিন্তু আসলে তা নয়। খুনগুলো হচ্ছে তর্কপঞ্চাননের ফুটস্টেপস অনুযায়ী। এই আটটা জায়গাতে তিনি বড় বড় তর্কযুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। এবং একদম শেষে কৃষ্ণচন্দ্রের বাজপেয় যজ্ঞের পরই তিনি অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে দেশবিখ্যাত হন।"

প্রিয়ম ভ্রূ কুঁচকে দেখছিল। রুদ্র একটা তালিকা বানিয়েছে।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের 'দশানন বধ' :

প্রথম খুন	১৫ই জানুয়ারি	বুধবার পৌষসংক্রান্তি	কৃষ্ণপক্ষ ত্রিবেণী
দ্বিতীয় খুন	১২ই ফেব্রুয়ারি	বুধবার তৃতীয়া	কৃষ্ণপক্ষ চন্দননগর (ফরাসডাঙা)
তৃতীয় খুন	১১ই মার্চ	বুধবার দ্বিতীয়া	কৃষ্ণপক্ষ বৈদ্যবাটি
চতুর্থ খুন	১৫ই এপ্রিল	বুধবার অষ্টমী	কৃষ্ণপক্ষ চুঁচুড়া (ওলন্দাজনগর)
পঞ্চম খুন	১৩ই মে	বুধবার ষষ্ঠী	কৃষ্ণপক্ষ কোন্নগর (কনেনগর)
ষষ্ঠ খুন	১০ ই জুন	বুধবার পঞ্চমী	কৃষ্ণপক্ষ ত্রিবেণী
সপ্তম খুন	৮ই জুলাই	বুধবার তৃতীয়া	কৃষ্ণপক্ষ বাঁশবেড়িয়া (বংশবাটী)
অষ্টম খুন	১২ই আগস্ট	বুধবার জন্মাষ্টমী	কৃষ্ণপক্ষ নবদ্বীপ

প্রিয়ম বলল, ”এটা কো-ইনসিডেন্স নয়তো?”

”এত বড় কো-ইন্সিডেন্স কি একটু অস্বাভাবিক নয়?” রুদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বলল, ”একটা জিনিস খেয়াল করেছ, প্রিয়ম? যে সাতজন খুন হয়েছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিল কৃষ্ণভক্ত? শিবনাথ বিশ্বাসের বাড়িতে বড় করে টাঙানো ছিল শ্রীকৃষ্ণের ছবি। ওর সাইবার ক্যাফে'র নামও ছিল শ্রীহরি সাইবার ক্যাফে। শুধু তাই নয়, ওর ল্যাপটপেও আমি দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ ওয়ালপেপার। আমি আজ সন্ধ্যাবেলায় ওর স্ত্রী আরতিকে ফোন করেছিলাম। আরতি আমাকে জানিয়েছে, শ্যামসুন্দর নামে যে নতুন বন্ধুটি ইদানীং শিবনাথের সঙ্গে খুব মিশছিল, মেয়ে হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে তার সঙ্গে শিবনাথ একবার মায়াপুরে ইসকনের মন্দিরে যায়। কিন্তু ফেরার পর থেকেই শিবনাথ নাকি বেশ চিন্তিত থাকতো। এবং শ্যামসুন্দরের সঙ্গে ও দূরত্বও বাড়াতে শুরু করেছিল। আমরা যতজন উটকো লোকের সন্ধান পেয়েছি, কানাই, গোবিন্দ, বলরাম, শ্যামসুন্দর। প্রতিটাই কৃষ্ণের একেকটা নাম। এমনকি ক্ষমাও আমাকে বলেছিল, ও কেষ্টঠাকুরের জন্য মালা গাঁথবে।”

রুদ্র থামল। বলল, ”গঙ্গা বরাবর উত্তরদিকে সোজা গেলে তো নবদ্বীপ পৌঁছনো যায়। সেখানে গঙ্গার সঙ্গে এসে মিশেছে জলঙ্গী নদী। নদীপথে যাওয়াও কোন সমস্যার নয়। নবদ্বীপ অধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সঙ্গে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ছিল বহুবছরের বিরোধ। রাজা ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল, শক্তির উপাসক, জগন্নাথ বৈষ্ণব, উদারমনস্ক। নানাকারণে মতানৈক্য হতে হতে দুজনের বিরোধ এতদূর পৌঁছেছিল যে তর্কপঞ্চানন নবাবি দপ্তরে নিজের ইনফ্লুয়েন্স ইউজ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে জেলও খাটিয়েছিলেন। পরে যদিও কৃষ্ণচন্দ্র নিজের সভাকবি ভারতচন্দ্রকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন যে দেবী চণ্ডীর প্রসাদেই তিনি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। কিন্তু আসল ঘটনা হল, তিনি জগন্নাথের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করে তবেই ছাড়া পেয়েছিলেন।”

প্রিয়ম এবার একটা হাই তুলল। তারপর একটু বিরক্ত গলায় বলল, ”আমি বুঝতে পারছি না, তুমি বর্তমান সময়ের খুনের কিনারা করতে গিয়ে বারবার অতীতে চলে যাচ্ছ কেন! জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের লিঙ্ক তবু বুঝলাম, কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তর্কপঞ্চাননের কী ঝামেলা হয়েছিল, তার সঙ্গে এই মিস্ট্রিকেসের সংযোগ কী?”

রুদ্র বলল, "বদনপুর চৌধুরী পরিবার।"

প্রিয়ম বলল, "বদনপুরের চৌধুরী মানে ওই শেখর চৌধুরী। উনি আবার কী করে এর মধ্যে আসছেন?"

রুদ্র বলল, "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশের একটি শাখা প্রায় দেড়শোবছর আগে নদীয়া থেকে হুগলী চলে আসেন। বদনপুর গ্রামের পূর্বে কিছুদূর জলপথে গেলে বাঁশবেড়িয়ার গঙ্গা। অন্যদিকে সরু সরস্বতীও মিশেছে। সেই বদনপুর গ্রামে এসে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক বংশধর বসতি স্থাপন করেন। তাঁর নাম ছিল রামরাম রায়। তিনি স্থানীয় জমিদার হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে বেশ সুসম্পর্ক তৈরি করেন। তাঁরা বংশপরম্পরায় শক্তির উপাসক, দুর্গাপুজোর জাঁকজমকে তাক লাগিয়ে দেন হুগলীর বাকি জমিদারদের। রামরাম রায় ছোটলাটের তরফে পান 'রায়চৌধুরী' উপাধি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু কালের নিয়মে বদনপুরের জমিদাররা হয়ে ওঠেন শুধুই চৌধুরী।"

কথা শেষ করে রুদ্র প্রিয়মের দিকে একটা মোটা বই বাড়িয়ে দিল।

বইটির নাম হুগলী জেলার প্রাচীন ইতিহাস। বিবর্ণ, অতি পুরোনো। প্রিয়ম হাত বাড়িয়ে বইটা নিল। প্রথম পৃষ্ঠায় উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীর স্ট্যাম্প।

রুদ্র বলে চলল, "সেই বংশের একজন হলেন নীলকণ্ঠ চৌধুরী। তিনি বিবাহ করলেন ত্রিবেণীর জগন্নাথ পণ্ডিতের বাড়ির মেয়ে মৃন্ময়ীকে। কলকাতায় শুরু করলেন 'মৃন্ময়ী টেক্সটাইলস' ব্যবসা। তাঁদের দুই পুত্র হল। শেখর ও শঙ্কর। বাড়িতে চণ্ডীমন্দির। এদিকে শঙ্কর ছোট থেকেই কৃষ্ণভক্ত। এই ব্যাপারে তার দোসর বাড়ির পুরোহিতের ছেলে কানু। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সে তারা বাড়ি থেকে পালাল। গ্রামের একজন বাসিন্দা কানুকে একবার মায়াপুরের মন্দিরেও দেখতে পেল। একেবারে বৈষ্ণবদের ধাঁচে রসকলি আঁকা মুখে।

"কানু একা গ্রামে ফিরে এল কুড়ি বছর পর। সম্পূর্ণ ভোল পালটে। কৃষ্ণভক্ত কানু তখন ঘোর শাক্ত। নিষ্ঠাভরে মন্দিরে দেবীর পূজা করে। অথচ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে, 'রাধা জানে।' কেন?"

প্রিয়ম আবার একটা লম্বা হাই তুলল। বলল, "কানু চক্রবর্তীর ছবি নিয়ে মায়াপুরে গিয়ে খোঁজ করলেই হয়। তোমার ওই লোকেশ ব্যানার্জিও তো এখনো মায়াপুরে আছেন। আর তাছাড়া তুমি যে বলছ, আট নম্বর খুন হবে নবদ্বীপে, তা নবদ্বীপ একটা বড় শহর। সেখানে কাকে খুন করার পরিকল্পনা চলছে, তুমি কী করে জানবে? আমার মনে হয় তোমার এখুনি এস পি স্যারকে ফোন করে সবকিছু জানানো উচিত।"

রুদ্র অন্যমনস্কভাবে বলল, "অনেকবার ফোন করেছি। স্যারের ফোন সুইচড অফ। লিভ থেকে এখনো ফেরেননি।"

প্রিয়ম বলল, "ওঁর গার্ডকে করে দ্যাখো।"

"জানোই তো স্যার কেমন। সবসময় গার্ড নিয়ে ঘোরা পছন্দ করেন না। আর তাছাড়া এইসব হিস্টোরিকাল রেফারেন্স শুনলেই উনি রেগে যাবেন।" রুদ্র ল্যাপটপের পাশ থেকে একটা ছোট নোটবুক তুলে নিল। সেখানে গুচ্ছের কাটাকুটি হিজিবিজি কাটা।

ও বিড়বিড় করে বলল, "শেখর আর শঙ্কর, এই দুই ভাইয়ের শরীরে বইছে একদিকে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, অন্যদিকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রক্তধারা। একদিকে কৃষ্ণ, অন্যদিকে

শক্তি। জগন্নাথ ও কৃষ্ণচন্দ্র, দুই শত্রু এসে মিলেমিশে গিয়েছে। কিন্তু শঙ্কর চৌধুরী কোথায়? শেখর চৌধুরী কেন ভাইয়ের অস্তিত্ব চেপে গেলেন আমার কাছে?"

"আট। এই আট সংখ্যাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণ-উপাসকদের কাছে পবিত্রতমও। সামনে যে খুনটা হবে, সেটা আটনম্বর। ওদিকে বাগডাঙা সরলাশ্রমে যে গোপালকৃষ্ণ মহারাজের ছবি দেখেছিলাম, তিনিও জন্মেছিলেন ১৩২৭ বঙ্গাব্দের জন্মাষ্টমী তিথিতে। ঠিক একশো বছর আগে। আগামীকাল জন্মাষ্টমী। কৃষ্ণপক্ষও বটে।"

প্রিয়ম অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল স্ত্রীর দিকে।

রুদ্র বিড়বিড় করেই যাচ্ছিল, "কালই কি কিছু ঘটবে? নবদ্বীপে কি এমন কেউ রয়েছে, যে পালিয়ে এসেছে ওই আমীশ সমাজ থেকে?"

"কানু চক্রবর্তীর 'রাধা' টা কে? তার কোন প্রেমিকা? আমি কি খুব সহজ কিছু মিস করে যাচ্ছি? আমার চোখের সামনেই জ্বলজ্বল করছে, অথচ আমি কি বুঝতে পারছিনা? কোথায় ওই শঙ্কর চৌধুরী?"

৪২

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া। অপরাহ্ন। দুর্গাপুজো সদ্যই সমাপ্ত হয়েছে, কোজাগরী পূর্ণিমা অন্তে বাতাসে হেমন্তের আগমনের আভাষ। আকাশ নির্মেঘ, শ্বেতশুভ্র মেঘ ভেসে চলেছে রাজহংসের মত।

ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরে গত কয়েকদিন ধরেই এক স্থানে জটলা। এই পড়ন্ত বেলাতেও দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে, বেশ কিছু মানুষ একসঙ্গে ভিড় করে রয়েছে। বাজছে খোল কর্তাল। খুব অস্ফুটে ভেসে আসছে মন্ত্রোচ্চারণ।

মাঝেমধ্যেই ঘাটে উপস্থিত হচ্ছে কিছু মানুষজন, তারা ইতস্ততপদে এগিয়ে যাচ্ছে সেই ভিড়ের দিকে, কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থেকে প্রণামান্তে আবার ফিরে আসছে। বেশ কিছুজন আবার দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখান থেকেই প্রণাম সারছে তারা।

সুসজ্জিত এক বজরা থেকে গঙ্গার ঘাটে নামলেন দু'জন ব্যক্তি। বজরাটি কলকাতা থেকে এসেছে। ব্যক্তি দুইজনের প্রথম জন গৌরবর্ণ ইংরেজ, পরনে পুরোদস্তুর বিদেশী পোশাক। অপরজন মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ। বেশভূষা অভিজাত।

তাঁরা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্ভবত প্রস্তুত করে নিলেন নিজেদের।

দূরের ভিড় থেকে বেরিয়ে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি পাশ দিয়েই আসছিলেন, বজরায় আগত ব্রাহ্মণ তাকে সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, "কীসের ভিড় ওদিকে?"

মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিটি কপালে দুই হাত জোড় করে উত্তর দিলেন, "জগন্নাথ পণ্ডিত অন্তর্জলি যাত্রায় এসেছেন যে ঠাকুরমশাই! দিনসাত-আট হয়ে গেল, ওখানেই রয়েছেন তিনি। তাই দূরদূরান্ত থেকে শেষ দেখা দেখতে আসছে সবাই। আমিও সেখানেই গিয়েছিলাম। এও তো এক বড় পুণ্যি!"

ইংরেজ লোকটি ভাঙা বাংলায় সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, "জগন্নাথ পণ্ডিত মানে সেই সেঞ্চুরি ওল্ড লেজেন্ডারি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তো?"

মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি লম্বা ঘাড় নাড়লেন, "আজ্ঞে। দশমীর দিন অপরাহ্নে নিজের পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্র-প্রপৌত্র সহযোগে নিজের বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনে এসেছিলেন। সেখান থেকেই মনস্থির করেছিলেন, আর বাড়ি ফিরবেন না। এখান থেকেই গঙ্গাযাত্রা করবেন। সেইমত সব ব্যবস্থা হয়েছে। কীর্তন হচ্ছে। পুজোআচ্চা চলছে। আজ আটদিনে পড়েছে।"

ইংরেজ লোকটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে বললেন, "একশো বারো বছর বয়সেও তিনি সশরীরে প্রতিমা বিসর্জন করতে নদীতে এসেছিলেন?"

"আজ্ঞে, উনি যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর সাহেব, এত বয়সেও শক্তিহ্রাস তো দূর, স্মৃতিবৈকল্য পর্যন্ত হয়নি। আজ আটদিন একভাবে নদীতে পা স্পর্শ করে শুয়ে রয়েছেন। প্রথম তিনদিন একটু করে দুধ মুখে দিয়েছিলেন। আজ পাঁচদিন হয়ে গেল, কয়েক ফোঁটা গঙ্গাজল ছাড়া মুখে কিছুই দিচ্ছেন না। কত লোক দেখতে আসছে, আপনার মত সাহেবসুবোরাও আসছে।"

ইংরেজটি এবার সঙ্গের ব্রাহ্মণের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধচোখে বললেন, "সত্যিই আনবিলিভেবল কৃষ্ণদাস! খবর পেয়ে তোমার সঙ্গে এসে দেখছি ভুল করিনি।"

কৃষ্ণদাস এতক্ষণ নির্বাক ছিলেন, এবার হাসলেন। বললেন, "গুরুদেবের শিষ্য বলে বলছি না, ওঁর মত মুক্তমনা হিন্দু পণ্ডিত খুব কম রয়েছেন, অ্যালবার্ট। জোন্স সাহেব ছিলেন তোমারই মত সংস্কৃতপাগল। প্রাচ্যের সবকিছুই বড় আপন করে নিয়েছিলেন তিনি। গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর ছিল গাঢ় বন্ধুত্ব। দিনের পর দিন তাঁদের দুজনের কথোপকথনগুলো আজও যেন কানে বাজে। জোন্স সাহেব বেঁচে থাকলে পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই হোক, ছুটে আসতেন। চলো অ্যালবার্ট, যাওয়া যাক!"

অ্যালবার্ট আর কৃষ্ণদাস এগোতে থাকেন ভিড়ের দিকে। ত্রিবেণীর জগন্নাথ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর একসময়ের ছাত্র কৃষ্ণদাস এখন কলকাতার আদালতের জজ পণ্ডিত। পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অবশ্য বরাবরই অক্ষুণ। বার্ষিক এক থেকে দুইবার গুরুদর্শনে আসেন তিনি।

কৃষ্ণদাস স্বভাবগতভাবে রাশভারী, কিন্তু আজ যেন কেমন আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছেন। অতি প্রত্যুষে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছেন শুধুমাত্র গুরুদেবকে শেষ দেখার জন্য।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন তাঁরা।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একভাবে শুয়ে ছিলেন। চোখ অর্ধ-উন্মীলিত, সম্মুখে গঙ্গার দিকে দৃষ্টি। কৃষ্ণদাস কিছু না বলে নিশ্চুপে গিয়ে বসলেন পায়ের কাছে। কম্পিত হস্তে স্পর্শ করলেন শিক্ষকের পা। অনুদাত্তে বললেন, "স্বেচ্ছামৃত্যুর কি খুব প্রয়োজন ছিল গুরুদেব?"

তর্কপঞ্চানন বিস্মিত হলেন না। তিনি যেন প্রতীক্ষায় ছিলেন কৃষ্ণদাসের। বললেন,

"কেচিৎ ব্রহ্ম নিরাকারং নরাকারঞ্চ কেচনঃ।

বয়ন্তু দীর্ঘ যোগেন নীরাকার মুপাস্মহে।।

আবারও বলছি, ব্রহ্ম নিরাকার। কর্মার্থে তিনি কখনো নররূপ ধারণ করেন, কখনো অন্য। সেই কর্মার্থ আমার ক্ষেত্রে ফুরিয়েছে কৃষ্ণদাস। আর কেন? বৃথা এই জীবন। মানবকল্যাণার্থে কতটুকু নিয়োজিত করতে পারলাম নিজেকে? মেয়াদ যে এবার শেষ!"

কৃষ্ণদাস বললেন, "আপনি যদি এই কথা বলেন গুরুদেব, তবে আমরা কোথায় মুখ লুকোই? আপনার দশানন বধের পর অনেক পণ্ডিতই আদি বেদ পড়তে আগ্রহী হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই বেদোত্তর সাহিত্যের অপভ্রংশকে অতিক্রম করার প্রবণতা লক্ষ্য করেছি অনেকের মধ্যে। এ কি আপনারই জয় নয়?"

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তিক্তস্বরে বললেন, "কীসের জয় কৃষ্ণদাস? এই দুর্গাপুজোর মধ্যেও ত্রিবেণীর একটি বাচ্চা মেয়ে স্বামীর চিতায় সহমৃতা হয়েছে। আমার দেখা একাধিক শিশুকন্যা দাঁতে দাঁত চেপে বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে। নমঃশূদ্র কারুর ছায়া মাড়ালে স্নান করতে ছুটছে ব্রাহ্মণের দল। অথচ আমি কীভাবে বোঝাব, সহমরণ বেদসিদ্ধ নয়? কীভাবে সেই নিষ্পাপ শিশুগুলোর বাপদের লোকলজ্জা এড়িয়ে সম্মত করাব পুনর্বিবাহে? কী করে বলব, যজুর্বেদে লেখা রয়েছে, তপসে শুদ্রম?[১] জন্মাধিকারে নয়, বহুপরিশ্রমী, কঠিন কার্যকারী পুরুষমাত্রেই শুদ্র? আমি... আমি একজন ব্যর্থ মানুষ, কৃষ্ণদাস! শ্রী

চৈতন্যের মত মানসিক শক্তি আমার নেই, ক্ষমতা নেই সমাজের বিষস্ফোটকগুলো সারিয়ে তাকে পাল্টে দেওয়ার!"

কৃষ্ণদাস চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "সতী নিশ্চয়ই একদিন বন্ধ হবে গুরুদেব। পরাশর মুনির সেই নষ্টে মৃতে প্রবজ্রিতে শ্লোকও কেউ একদিন ধুলোর আস্তরণ সরিয়ে নিয়ে আসবে মুক্তির আলোকে। শুদ্ররাও শিক্ষিত হবে।"

"সেই আশাতেই তো এই জীবন সম্পূর্ণ করছি কৃষ্ণদাস!" ফিসফিস করে বললেন তর্কপঞ্চানন। তাঁর চোখ বুজে গিয়েছে, একদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু, "যে যাই বলুক, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ... ঈশ্বর এক। ঈশ্বর অভিন্ন। সেই ঈশ্বর শুধুমাত্র মানবপ্রেমের মন্ত্রে তুষ্ট হন। ভেদাভেদ, শোষণে নয়। একদিন এমন কেউ আসবেন যিনি এই বৈষম্য শোষণ নিগ্রহ বন্ধ করে আবার সমাজকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন সত্যযুগের সাম্যবাদে। তিনিই হবেন প্রকৃত কল্কি! তেমন কাউকে ঈশ্বর একদিন নিশ্চয়ই মর্ত্যে পাঠাবেন, বলো!"

কৃষ্ণদাস চেপে ধরলেন শতায়ু বৃদ্ধের শীর্ণ হাত। কম্পিত স্বরে বললেন, "নিশ্চয়ই গুরুদেব! সেদিনের আর বেশি দেরি নেই!"

দূরে দণ্ডায়মান প্রাচ্যভক্ত তরুণ ইংরেজ অ্যালবার্ট সাহেবের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ত্রিবেণীর সূর্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রিয় শিষ্যের মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, "আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ। রুচং শুভ্রেষু।"[২]

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন চোখ বুজলেন। দেহ এলিয়ে দিলেন শেষশয্যায়। কেউ একজন ঠোঁটে ঠেকালেন গঙ্গাজলে পূর্ণ তাম্রপাত্রটি। সেই জল মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হল না। গড়িয়ে পড়ল পাশে।

শায়িত অবস্থায় প্রণাম অনুচিত জেনেও কৃষ্ণদাস যখন গুরুর চরণে মস্তক স্পর্শ করলেন, ততক্ষণে ত্রিবেণীসূর্য বিলীন হয়ে গিয়েছেন। অন্তর্জলী যাত্রান্তে হচ্ছে শঙ্খধ্বনি। বাড়ছে কীর্তনের কলরোল।

এই অপরাহ্নে অস্তায়মান সূর্যের মতই প্রাকনবজাগরণপর্বের প্রথম আলোকপুরুষ চলে গিয়েছেন অস্তাচলে। দায়ভার অর্পণ করে দিয়ে গিয়েছেন উত্তরসূরীদের স্কন্ধে।*

---

১ যজুর্বেদ, ৩০/৫

২ শুভচিন্তার উদয় হোক। ব্রাহ্মণ হোক বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হোক বা শুদ্র, পুরুষ হোক বা নারী, সকলকে সমভাবে সম্মান কোরো। - যজুর্বেদ, ১৮/৪৮

* জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের তিরোভাব হয় ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে। ততদিনে জন্মে গিয়েছেন রামমোহন, নিরলস পরিশ্রম করে তিনি খুঁড়ে বের করছেন প্রকৃত বৈদিক শাস্ত্রগুলি। আর তার তেরোবছর পরই ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও। সতীদাহ আইন পাশ হবে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে, বিধবা বিবাহ ১৮৫৬। আরো পরে আসবে ভারত সরকারের অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইন। ত্রিবেণীর 'রোমশ পন্ডিত'এর শেষ ইচ্ছা সত্যিই ঈশ্বর পূরণ করেছিলেন।

ভোর যখন চারটে, আবার এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে প্রিয়মের ঘুম ভেঙে গেল।

"কী হল'টা কি! তুমি কি একটু ঘুমোতেও দেবে না?" প্রিয়ম অতিকষ্টে চোখ খুলল। বাইরে এখনো অন্ধকার। বাগানের গাছগুলোর পাতায় রাত্রি এখনো জমাট বেঁধে রয়েছে।

প্রিয়ম দেখল, রুদ্রর পরনে পুরোদস্তুর পুলিশ উর্দি। একহাতে কোমরে বেল্ট আঁটছে, অন্যহাতে চিরুনি, কোনমতে এলোমেলো চুলগুলো টেনে বাঁধার চেষ্টা করছে।

"একি! তুমি কোথায় যাচ্ছ!"

রুদ্রর চোখদুটো লাল, বোঝাই যাচ্ছে সারারাত সে জেগে রয়েছে। শান্ত গলায় বলল, "বললাম তো, নবদ্বীপে।"

"কিন্তু নবদ্বীপে কে খুন হবে?"

রুদ্র মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি জানি না। আদৌ আমার এই গোটা অ্যানালিসিসটা ঠিক কিনা তাও আমি শিওর নই। কিন্তু এত বড় ঝুঁকি নিয়ে বসে থাকা যায় না। এবারেও কোনো মার্ডার হলে রাধানাথ স্যার আমায় কোনোভাবেই বাঁচাতে পারবেন না। আমেরিকায় এখন ক'টা বাজে?"

রুদ্রর শেষ বাক্যে প্রিয়ম হকচকিয়ে গেল। বলল, "অ্যাঁ?"

রুদ্র কাকে ফোন করছিল। একবার দু'বার। লাইন পাওয়া মাত্র ও চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যালো শুভাশিসবাবু, রমণীমোহন ভট্টাচার্য যাকে দত্তক নিয়েছিলেন, সেই নকলদাদুর নাম গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, রাইট?"

রুদ্র ফোনটাকে স্পীকারে করে চুল বাঁধছিল। প্রিয়ম পরিষ্কার শুনতে পেল, শুভাশিসদা বলল, "হ্যাঁ।"

"আপনি বলেছিলেন, দত্তক নিলেও গোপালকৃষ্ণবাবু আসলে আপনাদেরই এক দুঃসম্পর্কের আত্মীয়ের ছেলে ছিলেন। কিরকম আত্মীয় বলতে পারবেন?"

"এইরে! দাঁড়ান আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আপনার ভাগ্যটা ভালো। বাবা-মা আমার কাছে এসে রয়েছেন আজ মাসতিনেক হল।" শুভাশিসবাবু কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ হয়ে গেলেন।

প্রায় মিনিট খানেক পর বললেন, "হ্যাঁ। নকলদাদু ছিলেন রমণীমোহনের শ্যালকের পুত্র। নিজের শ্যালক নয়। রমণীমোহনের স্ত্রীর কীরকম এক তুতো ভাই। তাঁর তিন ছেলে, এক মেয়ে। ছোট ছেলে গোপালকৃষ্ণ।"

রুদ্র কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, "আ-আপনার বাবাকে জিজ্ঞেস করুন তো, সেই বোনের নাম কি মৃন্ময়ী? বিয়ে হয়েছিল হুগলীর কোন জমিদারবাড়িতে?"

শুভাশিসবাবুও বোধহয় ফোনটা স্পীকারে করে দিয়েছিলেন। পাশ থেকে এক বয়স্ক ভদ্রলোকের ভরাট কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"হ্যাঁ। নকলজ্যাঠার বোনের বিয়ে হয়েছিল হুগলীর এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সেই গ্রামের নাম বদনপুর। গ্রামটা প্রত্যন্ত হলেও সেখানকার ভূতপূর্ব জমিদার চৌধুরীদের বংশকৌলীন্যে বেশ নাম ছিল। আর তাছাড়া রমণীমোহন তাঁর একটা বিশাল সম্পত্তি নকলজ্যাঠার নামে লিখে দিয়েছিলেন, যেটা বদনপুর থেকে কাছেই। নকলজ্যাঠা যতদিন সংসারে ছিলেন, নিজের পরিবার ও আমাদের পরিবার দুই তরফেই সম্পর্করক্ষা করতেন।"

রুদ্র শুনতে শুনতে ঝড়ের বেগে একটা বংশের ডায়াগ্রাম আঁকছিল।
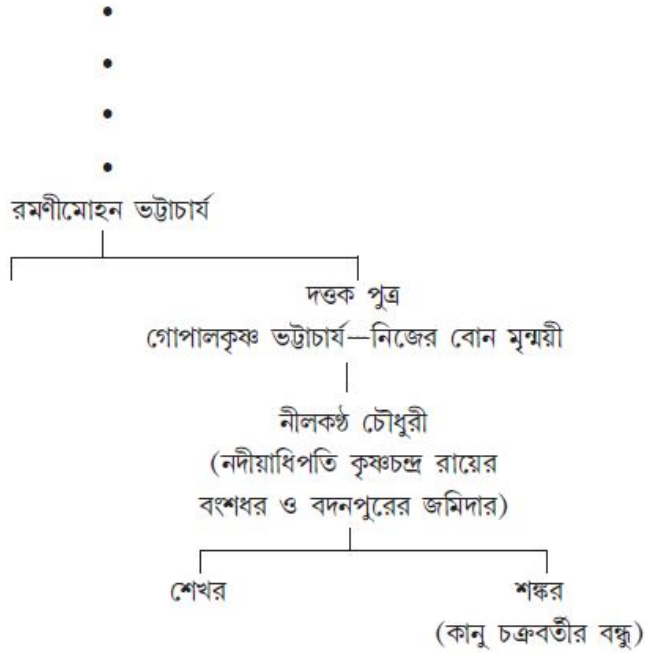
শুভাশিসবাবুর বাবা থামতেই উদগ্রীব হয়ে ও প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কেন নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, জ্যেঠু?"

"নিরুদ্দেশ হননি তো!" রুদ্র আর প্রিয়মকে বিস্মিত করে বললেন শুভাশিসবাবুর বাবা, "আমেরিকায় পড়তে এসে উনি প্রথমে জড়িয়ে পড়েছিলেন হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের সঙ্গে।"

"হরেকৃষ্ণ আন্দোলন!"

"হ্যাঁ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের যে কৃষ্ণ আন্দোলন আমেরিকা থেকে শুরু করে নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা বিশ্বকে। শ্রীল প্রভুপাদ তৈরি করেছিলেন ইসকন। নকলজ্যাঠা একেবারে প্রথম থেকে ইসকনের সঙ্গে ছিলেন। প্রভুপাদের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। অনেক দেশও ঘুরেছিলেন ইসকনের প্রচারে। তবে পরে শুনেছিলাম মতানৈক্য হচ্ছিল। তারপর আর কোনো যোগাযোগ নেই।"

"মাই গড!" রুদ্র ফোনটা রেখে অস্ফুটে বলল।

"কী!" প্রিয়ম জিজ্ঞেস করল।

রুদ্র বলল, "আমি একটা হাঁদা। মস্ত বড় হাঁদা।"

"মানে?" প্রিয়ম বলল, "কেন, এরকম বলছ কেন?"

রুদ্র বলল, "শোনো! নবদ্বীপ নয়, আট নম্বর খুনটা হবে মায়াপুরে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সময়ে মায়াপুরটাও নবদ্বীপেই ছিল। আমি প্রিয়াঙ্কা, জয়ন্ত আর বীরেনবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছি। সবাই এখুনি আসছে। নবদ্বীপ নয়, আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে মায়াপুরের উদ্দেশ্যে। কাছাকাছিই অবশ্য।"

"মায়াপুর?" প্রিয়ম অবাক, "সেটা কী করে বুঝতে পারলে?"

রুদ্র উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল, "মাথায় যার সামান্যতম গ্রে ম্যাটার থাকবে, সে-ই বুঝতে পারবে। মায়াপুরে ইসকন মন্দিরে হাজার হাজার ভক্ত রয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে সেখানে কৃষ্ণ অনুরাগীরা আসেন। তারা সকলেই কৃষ্ণভক্ত, অথচ ইসকন আধুনিক সভ্যতার সবকিছুই ব্যবহার করে। বিশাল বড় ইমারৎ থেকে শুরু করে কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিসিটি, হাসপাতাল সব! তাই, মায়াপুরের ওপর তো আমীশ সমাজের সবচেয়ে বেশি রাগ হওয়া উচিত! তাই না? আর সেই রাগ মেটানোর জন্য যদি তারা আজকের দিনটাকে টার্গেট করে? আজ জন্মাষ্টমী। সেখানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছে। অনেক বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে প্রিয়ম! আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে!"

"তুমি শিওর?"

"শিওর কিনা জানি না, ঝুঁকি নিতে পারব না। এক-একটা মিনিটও এখানে ক্রুশিয়াল। এস পি স্যারকে ফোনে পাইনি, আমি কমিশনার স্যারকে এখুনি ফোন করে সব জানাচ্ছি। এত ক্রুশিয়াল ব্যাপার, সুনীত বসু নিশ্চয়ই পারমিশন দেবেন। মায়াপুরে ঢোকার পর থেকেই যদি নদীয়া পুলিশের একটা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স আমাদের সঙ্গে থাকে, অনেক ইজি হয়ে যাবে ব্যাপারটা!"

আজ কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী। চন্দ্রদেব প্রায় অস্পষ্ট হয়ে অবস্থান করছেন মহাকাশে। তাঁর ক্ষীণ আলোয় চারপাশ এক অদ্ভুত আবছা মেদুরতায় ভরে উঠেছে। কেমন এক অপার্থিব পরিবেশে নিস্তব্ধ গঙ্গা দিয়ে বয়ে চলেছে কয়েকটি নৌকো। ঠিকমতো গুণে দেখলে দেখা যাবে, তাদের সংখ্যা আট। ভটভটি নৌকো নয়, দাঁড় টানা নৌকোর ছলাত ছলাত শব্দে মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দ্য যেন থেকে থেকেই চমকে উঠছে।

সারিবদ্ধ পিঁপড়ের মতো নৌকোগুলো বয়ে চলেছে গঙ্গা দিয়ে। অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে তারা। সামনেই জলঙ্গী নদীর সঙ্গে গঙ্গার মিলন।

শ্রীহরি বলে মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী ছাত্রটা শক্তমুখে বসেছিল। ওদের নৌকোয় নারায়ণী চতুষ্পাঠীর অনেকজন ছাত্র একসঙ্গে চলেছে। সবাইকে সার দিয়ে প্রধান পুষ্করিণী কৈবর্ত ও বাগদিদের পাড়ার পাশ দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল শ্মশানে। তারপর একে একে সকলকে শ্মশানঘাট থেকে তোলা হয়েছিল নৌকোয়।

বনমালী শ্রেষ্ঠ ছাত্র, তাকেই দেওয়া হয়েছে দল নেতৃত্বের দায়ভার।

বনমালী বলছিল, "ওখানে পৌঁছে আমাদের মিশে যেতে হবে সকলের সঙ্গে। ভর্তৃহরি মহারাজ ও তাঁর ছাত্ররা সেখানে থাকবেন। তাঁরাই নির্দেশ দেবেন আমাদের কী করতে হবে। আজ সারারাত জুড়ে চলবে কর্মকাণ্ড। আমরা আবার বৈদিক সমাজে ফিরব আগামীকাল ভোরে। যুদ্ধজয় শেষে।"

ছাত্ররা সকলে একসঙ্গে থাকায় সবাই নীচুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। কিন্তু শ্রীহরি কোনো কথা বলছিল না। ওর ভাবনাচিন্তা খুব একটা পরিণত নয়। চিন্তা করতে পারেনা বলেই সবকিছুকে নিজের মুখস্থবিদ্যা দিয়ে অতিক্রম করতে চায় ও।

কিন্তু আজ ওর মন যেন ভীষণ এক কু ডাকছে। দ্বারিকা যা বলল, তা কি সত্যি? ও তো আজ পর্যন্ত এভাবে কখনো ভেবে দেখেনি!

কল্কি অবতারের সৈনিক হয়ে ওরা যা করতে যাচ্ছে, তা কি আদৌ শুভকাজ?

ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে গিয়েছিল শ্রীহরি, হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেল পিঠে একটা খোঁচায়।

পেছন ফিরে দেখে, ওর একেবারে পেছনে বসে রয়েছে রাখহরি। মুখ গম্ভীর, চোখে এই স্বল্প আলোতেও স্পষ্ট বিদ্যমান সংশয়।

"দ্বারিকা কোথায়?"

শ্রীহরির মুখচোখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তার উপস্থিত বুদ্ধি বা বানিয়ে বলার ক্ষমতা দুটোই প্রায় শূন্য। পুঁথিগত স্মৃতিশক্তিই তার একমাত্র সম্বল। সেখানে এই প্রশ্নটা যে কোথাও নেই, সেই বিষয়ে ও নিঃসংশয়।

"কীরে? মুখে কুলুপ আঁটলি কেন?" রাখহরি গর্জে ওঠে, "শ্মশানে আসার সময়েও তো দেখলাম দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে গুজগুজ করছিলি। সে গেল কোথায়?"

শ্রীহরি প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে উত্তর দেওয়ার। দ্বারিকা যে শ্মশানঘাট থেকে কৌশলে ঢুকে পড়েছে বাগদিদের পাড়ায়, তা বলা যাবে না কোনমতেই।

বুদ্ধিটা দ্বারিকাই দিয়েছিল।

বলেছিল, "আমি যাব না শ্রীহরি।"

"যাবি না মানে!" শ্রীহরি ভিতুচোখে তাকিয়েছিল বন্ধুর দিকে, "সকলে যাচ্ছে, আর তুই যাবি না, এ'কেমন কথা হল?"

দ্বারিকা কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামিয়ে বলেছিল, "অনেকেই যাচ্ছে না। আমার একটা কাজ পড়ে গেছে শ্রীহরি।"

"কী কাজ?"

"তোর ব্রজেন্দ্রদাদাকে মনে আছে?"

শ্রীহরির মুখ সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত হয়ে গিয়েছিল, "একি। ব্রজেন্দ্রদাদাকে মনে থাকবে না? সেই কালোপুকুরের মাঝখানে ... ওইরকম দৃশ্য কেউ ভুলতে পারে?"

"ঠিক বলেছিস।" দ্বারিকা প্রায় শুনতে না পাওয়ার মতো করে বলেছিল, "ব্রজেন্দ্রদাদার অপূর্ণ রেখে যাওয়া কাজটা আমাকেই সম্পূর্ণ করতে হবে, শ্রীহরি!"

"তোকে!"

"হ্যাঁ। আমি ঠিক সুযোগ বুঝে সরে পড়ব। কেউ জিজ্ঞেস করলে যাহোক কিছু বলে দিস।"

"কিরে, তুই কি কানে কালা হয়ে গেলি নাকি?" রাখহরির পর এখন ঝুঁকে এসেছে বনমালীও।

আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে শ্রীহরির মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে যায়, "ওই যে দেখছিস পেছনের নৌকোটা, তাতে করে আসছে।"

সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে যায়। রাখহরি, বনমালীরা বসে আছে নদীর দিকে পেছন ফিরে, গলুইয়ের মধ্যে আড়াআড়ি। আর শ্রীহরি বসে আছে নদীর মুখোমুখি।

নৌকো সত্যিই আসছে। একটা নয়, তিনটে। সবচেয়ে সামনের নৌকোটার মাঝি বোধ হয় এই নৌকোর চেয়ে বেশি বলশালী, দ্রুত দাঁড় টানায় নৌকোটা এগিয়ে আসছে তাড়াতাড়ি। দাঁড় টানার শব্দ হচ্ছে ছপছপ।

বনমালী বলে, "অ। আমি ভাবলুম তোর বিজ্ঞ বন্ধুটি বোধ হয় ভয়ে পালিয়েছে, হা হা!"

সবাই যোগ দেয় হাসিতে। কিন্তু শ্রীহরি হাসতে পারে না।

কারণ ততক্ষণে পেছনের নৌকোটার গলুইয়ের ওপর পড়া চাঁদের আলোয় স্বল্প উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা দৃশ্যটা ওর অন্তরাত্মা ভয়ে হিম করে তুলেছে।

চাঁদের আলোয় নদীর ঠান্ডা হাওয়ায় শ্রীহরি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, নৌকোর গলুইয়ে শুয়ে রয়েছে অচ্যুত।

চোখ সম্ভবত বোজা।

আর তার দুদিকে হাতদুটো শক্ত করে চেপে বসে রয়েছে গোপাল ব্যানার্জির দুই শাকরেদ!

অচ্যুত তার মানে বেঁচে রয়েছে?

৪৫

”মায়াপুরের আগের নাম ছিল মিয়াঁপুর। নবদ্বীপের একেবারে কাছেই, গঙ্গা ও জলঙ্গী নদী যেখানে মিশেছে। এখানকার সনাতনধর্মীদের দৃঢ় বিশ্বাস, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভাই বলরাম এখানে পুনরাবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ হয়ে। কলিযুগ দিনে দিনে যেভাবে পঙ্কিল হয়ে উঠছিল, সেইসময়ে শ্রীচৈতন্য এসে মানুষের মধ্যে ভক্তিরসের জোয়ার আনেন। হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে তিনি মানুষকে বোঝান, এই জাতপাত, ছোঁয়াছুঁয়ি সব ভুল। মানুষ হয়ে মানুষকে নিঃশর্ত ভালোবাসাই হল ঈশ্বর প্রেম।”

লোকেশবাবু একটানা বলে দম নেওয়ার জন্য থামতেই প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন করল, ”তারপর?”

”শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন, মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে, কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে। তিনি মুসলমান হয়েও যবন হরিদাসকে কোল দিয়েছিলেন, সত্যবাঈ, লক্ষীবাঈয়ের মতো পতিতাকে সৎপথে এনেছিলেন, শূদ্র রামানন্দ তাঁর আদেশে করেছিলেন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। তিনি কোনো উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করেননি। কৃষ্ণনামকে তিনি জন আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন। ঝিমিয়ে পড়া, কুসংস্কারের জাঁতাকলে ডুবে থাকা হিন্দুরা এতে প্রাণ পেয়েছিল। সকলে আবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এমনকি, মুসলমানরাও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিতে শুরু করেছিল। তখন বাংলার শাসক হুসেন শাহ। চৈতন্যের এই প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা না মুসলমান সমাজ, না গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণরা, কেউই পছন্দ করেননি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত’ তে রয়েছে, একদল মুসলমান সংঘবদ্ধভাবে তাদের কাজির কাছে গিয়ে নালিশ জানাচ্ছে।”

মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্তন মহাধ্বনি।

হরি হর বিনা অন্য নাহি শুনি।।

শুনিয়া সে ক্রুদ্ধ হইল সকল যবন।

কাজী পাশে আসি সব কৈল নিবেদন।।

”নবদ্বীপের তখন আইনি ব্যাপারে নগরকর্তা চাঁদ কাজী। যিনি আবার সুলতান হুসেইন শাহর আধ্যাত্মিক গুরুও। তিনি নালিশ পেয়ে রেগেমেগে সেনা পাঠিয়ে সংকীর্তনের মৃদঙ্গ, খোল-করতাল সব ভেঙে দিলেন। সঙ্গে বললেন, কেউ যদি আর হরিনাম জপ করে, তিনি তার সর্বস্ব কেড়ে নেবেন। এমনকি ধর্মও।

আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইনু।

সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার যাতি সে লইমু।।

‘চৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু এই অন্যায় হুকুমনামা আর পাঁচজন ভীতু অমেরুদণ্ডী ব্রাহ্মণের মত মেনে নেননি। তিনি নবদ্বীপের আশপাশের প্রচুর গ্রাম, যেমন, পারডাঙ্গা, গাদিগাছা এমন গ্রামের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং গোটা নগর জুড়ে হরিনাম সংকীর্তনের নির্দেশ দেন। তিনি একজন বলিষ্ঠ নেতাও ছিলেন। মিছিলের একেবারে সামনে থেকে তিনি গোটা নবদ্বীপবাসীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।”

চাঁদ কাজি তখন ভয় পেয়ে যান।

কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।

তর্জন গর্জন শুনি না আসে বাহিরে।।

মহাপ্রভুর সঙ্গে চাঁদকাজীর তুমুল যুক্তিতর্ক বাদানুবাদ হয়। বিচারে কাজী হার মানেন। কিন্তু মহাপ্রভু তারপরই নবদ্বীপধাম ছেড়ে চলে যান উড়িষ্যায়। সেখানে তখন হিন্দু রাজত্ব। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র নিজে মহাপ্রভুর ভক্ত। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মহাপ্রভু আর কখনো নবদ্বীপে ফেরেননি। ইহলীলা সাঙ্গ করেন নীলাচলধাম পুরীতেই।"

লোকেশ ব্যানার্জি হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে দুবার 'হরে কৃষ্ণ' জপলেন।

"বাবা! আপনার তো দেখছি সব কণ্ঠস্থ!" প্রিয়াঙ্কা বলল।

লোকেশ ব্যানার্জি আড়চোখে একবার এ এস পি ম্যাডামের দিকে তাকালেন।

রুদ্রর মুখ ভাবলেশহীন। এখনো অবধি লোকেশবাবুর সঙ্গে সে একটা বাক্যালাপও করেনি।

লোকেশবাবুকে মৌখিকভাবে সাসপেন্ড করার হুমকি শোনালেও লিখিত অর্ডার এখনো ইস্যু করা হয়নি। আর সেই জোরেই বোধ হয় অ্যাডিশনাল এস পি ম্যাডামের মায়াপুর আসার খবর পেয়ে লোকেশ ব্যানার্জি রাতেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন মায়াপুর থেকে। কিছুদূর এসে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রাস্তার ওপরে।

রুদ্র দেখে চমকে গেলে তিনি কাঁচুমাচু মুখে বলেছেন, "এক্সট্রিমলি স্যরি ম্যাডাম!"

রুদ্রদের গাড়ি এখন ছুটছে উত্তরদিকে। গাড়ি চালাচ্ছে পাঁচু, পাঁচুর পাশেই বসে রয়েছে রুদ্র। পেছনে প্রিয়াঙ্কা আর জয়ন্ত। একেবারে পেছনে লোকেশবাবু আর রুদ্রর দেহরক্ষী তিমির। লোকেশবাবুর গাড়িতে করে পেছনে আসছেন বীরেনবাবু আর তিনজন কনস্টেবল। কমিশনার সুনীত বসু প্রয়োজনীয় পারমিশন ও অন্যান্য অফিশিয়াল অর্ডারে সম্মতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি মাঝেমাঝেই রুদ্রর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখছেন। ধর্মীয় স্থান, এমনিতেই স্পর্শকাতর। খুব সতর্কভাবে এগোতে হবে।

শেওড়াফুলি, সুগন্ধা, সপ্তগ্রাম, কালনা পেরিয়ে এসে গাড়ি এখন ধাত্রীগ্রাম পেরোচ্ছে। এতক্ষণ গঙ্গার দেখা না মিললেও তিনি সমান্তরালে বয়ে চলেছিলেন কিছুদূর দিয়ে। এখন ধাত্রীগ্রামে এসে একেবারে পাশাপাশি চলছে রাস্তা ও নদী।

রুদ্র অনেকক্ষণ পর গলাখাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "শ্রীচৈতন্যের শুরু করা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনই কি এখনো চলছে মায়াপুরে?"

"না।" লোকেশ ব্যানার্জি ম্যাডামের প্রশ্নে উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। দ্রুত মাথা নেড়ে বললেন, "যদিও মায়াপুরেরও মেইন অ্যাজেন্ডা কৃষ্ণনাম কিন্তু এই মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল আমেরিকা থেকে। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদ ষাটের দশে আমেরিকায় এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রচার শুরু করেন। তরুণ আমেরিকানদের মধ্যে তিনি প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। নিউইয়র্কে ইসকন প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি চোদ্দবার গোটা বিশ্বভ্রমণ করেন। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, সব মহাদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষজন ইসকনের সদস্য হন। ইসকনের পুরো অর্থ ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের অবতার আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভু, তাই তাঁর জন্মস্থানে

তৈরি করা হয় ইসকনের প্রধান দপ্তর। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় চন্দ্রোদয় মন্দির। বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়াম। আরো অনেক কিছু। গেলে দেখতে পাবেন। বিশাল ক্যাম্পাস। গোশালা থেকে শুরু করে অতিথি নিবাস সবকিছু আছে। সারা পৃথিবী থেকে ভক্তরা আসেন তো। জয় গৌরনিতাই।”

প্রিয়াঙ্কা বলল, ”ম্যাডাম, এস পি স্যারকে কি এখনো পেলেন না ফোনে?”

”না!” রুদ্র অন্যমনস্কভাবে বলল। কমিশনার সুনীত বসু এস পি স্যারের ওপর খুব রেগে গিয়েছেন। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে শো-কজ চলে আসত। ওদের এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কথায় কথায় শো-কজ, কথায় কথায় সাসপেনশন অর্ডার। কিন্তু রাধানাথ স্যারের আর কয়েকমাস মাত্র বাকি, তার ওপর ওঁর কেরিয়ার এতটাই দাগবিহীন, কমিশনার স্যার কিছু বলতে পারেননি।

লোকেশ ব্যানার্জি বললেন, ”এস পি সাহেবকে এখন পাওয়া যায় নাকি! আজ জন্মাষ্টমী। চোদ্দোবছর ধরে সাহেবকে দেখছি। খাঁটি বৈষ্ণব, জন্মাষ্টমী এলেই ওঁর ফার্মহাউজে চলে যান।”

”এস পি স্যারের ফার্ম হাউজ?” বীরেন শিকদার উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন, ”সেটা কোথায়?”

”হুগলীরই কোথাও একটা। আমি ঠিক জানি না। তবে শুনেছি স্যার খুব বনেদি বংশের ছেলে। একবার ইসকনেও দেখেছিলাম। সবাই খুব খাতির করছিল। এমনকি ইসকনের সন্ন্যাসীরাও।” কথাটা বলেই চেঁচিয়ে উঠলেন লোকেশ ব্যানার্জি, ”এই পাঁচু, হাটশিমলা পেরিয়ে গেছে। সামনে সমুদ্রগড় মোড়। সেখান থেকে ডানদিকে নাও। সোজা কিছুদূর গিয়ে গৌরাঙ্গ সেতু পেরোলেই আমরা মায়াপুরে ঢুকে যাব। বড়জোর আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট। গৌরাঙ্গ সেতুর মুখেই নদীয়া পুলিশের ফোর্স দাঁড়িয়ে থাকবে। হরে কৃষ্ণ।”

রুদ্র হঠাৎ বলল, ”জয়ন্ত, তোমার যে বন্ধু ডায়রেক্টোরেটে পোস্টেড রয়েছে, তাকে একবার ফোন করতে পারবে?”

”সুবিমল?” জয়ন্ত সচকিত হয়ে বলল, ”পারব। কিন্তু আজ তো জন্মাষ্টমী, ওদের ছুটি।”

রুদ্রর মাথা কাজ করছিল না। এখুনি সার্ভিস বুক দেখা প্রয়োজন! কিন্তু আজ সরকারি ছুটি, কীভাবে দেখবে?

হঠাৎ করে ওর মনে পড়ে গেল, ইন্টারনেটে সমস্ত আই এ এস বা আই পি এস অফিসারদের ডেটাবেস রয়েছে। সেখানেই দেওয়া থাকে তাদের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল।

সাংঘাতিক … সাংঘাতিক বাজে দিকে ইঙ্গিত যাচ্ছে! এর চেয়ে ভয়ংকর, এর চেয়ে শকিং কিছু হতে পারে কি?

রাধানাথ রায় … রাধানাথ রায় … কোন ব্যাচের আই পি এস?

নাহ, তার প্রয়োজন নেই। নাম দিয়ে সার্চ করলেই সরকারি ওয়েবসাইট দেখিয়ে দিচ্ছে।

নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পিতার নাম	অ্যালটমেন্ট ইয়ার	বর্তমান পোস্টিং	পে স্কেল	ছবি
শ্রী রাধানাথ রায়	M.A. (Vedic Studies)	নীঁলকণ্ঠ রায়চৌধুরী	১৯৮৫	সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, শ্রীরামপুর	---	

রুদ্র স্তব্ধ হয়ে বসে রইল গাড়িতে। গাড়ি গৌরাঙ্গ সেতু দিয়ে গঙ্গা পেরোচ্ছে। নদীর ঠান্ডা হাওয়া এসে ঝাপটা দিচ্ছে ওর নাকেমুখে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না ও!

সেদিন ভবানীপুরের বিলাসবহুল 'চৌধুরীভিলা' থেকে বেরোনো ইস্তক ওর মনে কিছু একটা খচখচ করছিল। কিছু একটা খটকা, যা মেলাতে পারছিল না ওর অবচেতন মন। এখন বুঝতে পারছে।

চৌধুরীভিলার ড্রয়িং রুমে থাকা পঞ্চাশ বছর পূর্তির 'মৃন্ময়ী টেক্সটাইলস' এর সেই দুর্গামূর্তিতে কোম্পানির লোগোটা দেখেই ওর চেনা চেনা লেগেছিল। কারণ মাসখানেক আগেই যে ওই একই লোগো ও দেখেছিল এস পি স্যারের ডায়েরির কভারে। যেদিন স্যারের বাংলোয় ও একা গিয়েছিল। রাধানাথ স্যার সুদৃশ্য ডায়েরির পাতা খুলে ওকে দেখিয়েছিলেন পরপর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ।

সেই ডায়রির একেবারে প্রচ্ছদে জ্বলজ্বল করছিল 'মৃন্ময়ী টেক্সটাইলস' এর লোগো।

ওহ্! এতদিনের তদন্তশেষে ও এই বাঁকে এসে উপনীত হল? শেখর চৌধুরীর একমাত্র ভাই কৃষ্ণভক্ত শঙ্কর চৌধুরী পালিয়ে গিয়েছিল বন্ধু কানু চক্রবর্তীর সঙ্গে। সেই 'শঙ্কর' পরে নতুন নাম নিয়েছে 'রাধানাথ'? শেখর চৌধুরী ইচ্ছা করেই প্রকাশ্যে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না?

বুঝতে পারছে কেন প্রথম থেকে 'হুগলীর খুন' বলে জেলাশাসক থেকে কমিশনার প্রত্যেককে বিভ্রান্ত করেছিলেন রাধানাথ স্যার। বুঝতে পারছে কেন এত সিনিয়র অফিসাররা থাকতে রুদ্রর মতো আনকোরা নভিশ একজন অফিসারকে দিয়েছিলেন স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম লিড করার দায়িত্ব। ভেবেছিলেন রুদ্রর মতো প্রোবেশনারের ক্ষমতা হবে না এই রহস্যজাল ভেদ করার।

বুঝতে পারছে, ক্ষমাকে অপহরণের দিন কেন রুদ্রর 'অফ' থাকা সত্ত্বেও আর্জেন্ট মিটিং এ তাকে নিজের অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন রাধানাথ রায়। যাতে বাংলো ফাঁকা থাকে।

এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ওর বুকের ভেতরটা কেমন হালকা লাগছিল। মনে পড়ে যাচ্ছিল, বদনপুরের চৌধুরীরা আসলে 'রায়চৌধুরী'। খেতাব পেয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের থেকে। এস পি স্যার নিজে শুধু রায়' টাই ব্যবহার করেন।

উঁচু তরফের কেউ এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনা যে একেবারেই ওর মাথায় উদয় হয়নি তা নয়। প্রথম থেকে সাতখানা খুনে যেভাবে লোকাল থানা একটুও এগোতে পারেনি, তাতে মনে হতেই পারে কোন মহল থেকে চাপ এসেছে। কিন্তু তা যে পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার এবং আর কেউ নয়, স্বয়ং রুদ্রর বস রাধানাথ রায়, তা ও দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি।

মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক কিছু। সেদিন শেখর চৌধুরীর বাড়ি থেকে বেরোনোর পর রাধানাথ স্যার ক্রুদ্ধভাবে ফোন করেছিলেন ওকে। বলেছিলেন, কলকাতা পুলিশ থেকে অভিযোগ গিয়েছিল উঁচুমহলে জানাশোনা থাকা শেখর চৌধুরীকে রুদ্র বিনা অনুমতিতে হ্যারাস করেছে।

আসলে কেউ ফোন করেনি স্যারকে। স্যার নিজেই রুদ্রকে ফোন করে ভড়কে দিয়েছিলেন। যাতে নতুন অফিসার হিসেবে রুদ্র আর খোলামনে কাজ করতে না পারে। বাগডাঙা সরলাশ্রম থেকে অন্যান্য মার্ডার কেস, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারবার।

জেলাশাসক এবং কমিশনার মিলে যখন ঠিক করছিলেন এই ম্যারাথন খুনের জন্য টিম গঠন করতে হবে, ইচ্ছে করে নিজের আণ্ডারে থাকা অনভিজ্ঞ অফিসার রুদ্রকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি। যাতে রুদ্রর তদন্তের প্রোগ্রেস জানা থেকে শুরু করে প্রয়োজনে রাশ টানা, সব কিছুই তাঁর কন্ট্রোলে থাকে।

কিন্তু কেন? কেন করলেন স্যার এরকম? স্যারই কি মূল পান্ডা? না আরো কেউ রয়েছে এর পেছনে? কী উদ্দেশ্য তাদের?

রুদ্র আর কিছু ভাবতে পারছিল না।

মনে পড়ে যাচ্ছিল কানু চক্রবর্তীর সেই বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো।

"রাধা জানে!"

রাধা অর্থাৎ রাধানাথ। কানু চক্রবর্তী কি বাল্যবন্ধুর দিনের পর দিন এই অন্যায় দেখেও কিছু প্রতিবাদ করতে পারত না? তাই কি লক-আপের অন্তরালে তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল জল?

সেই জল কি অনুশোচনার? কেন পারত না প্রতিবাদ করতে?

গৌরাঙ্গ সেতু পেরোতেই দেখা গেল ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে নদীয়া পুলিশের জিপ।

রুদ্র ছটফট করে উঠল। বলল, "লোকেশবাবু। আপনি সবচেয়ে সিনিয়র। আপনাকে আমি এই মিশনটার দায়িত্ব দিচ্ছি। আপনি নদীয়া পুলিশের সঙ্গে কোলাবরেশনে মায়াপুর মন্দির ভ্যাকেট করান। প্রিয়াঙ্কা আর বীরেনবাবু আপনাকে সহযোগিতা করবে। আমি জয়ন্তকে নিয়ে এখুনি চন্দননগরে ফিরব।"

লোকেশবাবু তো বটেই, গোটা গাড়ির সকলেই হকচকিত। এমন একটা ক্রুশিয়াল অপারেশন, আর ম্যাডাম নিজে পিছু হটছেন!

এটা কী করে হয়?

"আমি পরে আপনাদের সব ক্ল্যারিফাই করবো।" রুদ্র গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, "শুধু একটা কথা মাথায় রাখবেন। মায়াপুর মন্দিরে যদি কোন হামলার প্ল্যান করা থাকে, সেটা হবে প্রাচীন পদ্ধতিতে। অর্থাৎ, বম্বিং বা ফায়ার আর্মস নয়। আপনারা ক্যাম্পাসের ভেতরে সমস্ত অতিথি এবং আবাসিকদের সার্চ করুন। পুকুর বা রান্নার জায়গাগুলোও বাদ দেবেন না। আমি ফোনে যোগাযোগ রাখছি।"

কারুর কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই ও নেমে পড়ল। পেছনের গাড়ি থেকে বীরেনবাবুকে নিয়ে এল সামনের গাড়িতে। তারপর জয়ন্তকে নিয়ে পেছনের গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা দিল উলটোপথে।

জয়ন্ত হতভম্ব মুখে বলল, "কী হচ্ছে ম্যাডাম? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা। আমরা ফেরত যাচ্ছি কেন?"

"ফেরত যাচ্ছি না জয়ন্ত। আমরা যাচ্ছি সেই আমীশ সমাজের গ্রামটাকে খুঁজে বের করতে। সেটা অনেক বেশি ইম্পরট্যান্ট।"

এ এক ভয়ংকর লড়াই। যে লড়াই অসম হলেও শুভশক্তিকে জয়ী করতেই হবে।

কমিশনার সাহেবের নম্বরে ডায়াল করল রুদ্র।

প্রিয়াঙ্কা সতর্ক চোখে নজর রাখছিল। সুবিশাল এই মায়াপুরের মন্দির ক্যাম্পাস। চারপাশে একাধিক প্রাসাদোপম অট্টালিকা, অধিকাংশই অতিথি নিবাস। সারা বিশ্ব থেকে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছে এখন মায়াপুরে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে। উচ্চকিত স্বরে ভেসে আসছে কীর্তন।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।

মাঝে মাঝেই পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে সংকীর্তনরত ভক্তদের ছোট ছোট দল। অধিকাংশই বিদেশি। সনাতন ধর্মের প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজেদের দেহমন সমর্পণ করেছে তারা।

প্রিয়াঙ্কা ওয়াকিটকিটা মুখের কাছে আনল। রুদ্রাণী ম্যাডামের নির্দেশ মতো প্রিয়াঙ্কাদের গোটা টিমটা ছড়িয়ে পড়েছে ক্যাম্পাসে। নদীয়া পুলিশ থেকে দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ জনের টাস্ক ফোর্স, সঙ্গে রয়েছেন অফিসার র‍্যাংকের দশজন অফিসার। প্রিয়াঙ্কা, বীরেন শিকদার ও লোকেশ ব্যানার্জি তাঁদের সঙ্গেই কাজ করছেন। টাস্ক ফোর্সের প্রত্যেকে সাধারণ পোশাকে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা চত্বরে।

"হ্যালো লোকেশবাবু, হ্যালো ... গোশালা'র দিকটা লোক পাঠিয়েছেন? হ্যালো ... হ্যালো?"

লোকেশবাবু পেছন থেকে এগিয়ে এলেন, "আরে আমি তো এদিকেই আসছিলাম।"

প্রিয়াঙ্কা পেছন ফিরে বলল, "বীরেনবাবু কোথায়?"

"উনি গেস্টহাউজগুলো দেখছেন।" লোকেশবাবু বললেন, "এত বড় জায়গা, হাতের তালুর মতো চিনি আমি। অসংখ্যবার এসেছি। কিন্তু কীভাবে যে কে খুন হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আপনার মিসেস কোথায়?"

লোকেশবাবু বললেন, "তিনি তো মন্দিরে রয়েছেন। সকাল থেকে বেচারিকে একা একা কাটাতে হচ্ছে। কী করে জানব যে প্রভুর ধামে এত বড় কাণ্ড হতে পারে! আচ্ছা, ম্যাডাম শিওর?"

প্রিয়াঙ্কা বলল, "যে সংকীর্তনের আওয়াজ আসছে, সেটা কতক্ষণ চলবে?"

"আজ তো জন্মাষ্টমী। সকাল থেকে শুরু হয়ে রাত পর্যন্ত চলবে এই হরিনাম কীর্তন। তারপর রাত বারোটায় মহা আরতি মিটলে মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে।" লোকেশবাবু কথাগুলো বলে মাথায় জোড়হাত ঠেকালেন।

প্রিয়াঙ্কা হাতে ধরা ম্যাপটার দিকে চোখ রাখল। রাধামাধব মন্দির, শ্রীল প্রভুপাদের পুষ্পসমাধি মন্দির, ভজন কুটির পেরিয়ে গোশালা। অন্যদিকে গীতা ভবন, গদা ভবন।

এই প্রতিটা জায়গাতেই ছড়িয়ে রয়েছে পুলিশের লোক। সতর্ক দৃষ্টিতে দেখভাল করছে সবকিছু।

ম্যাডাম যাওয়ার সময় যেন কী বলে গেলেন? প্রিয়াঙ্কা মনে করতে থাকে। প্রাচীন কোনো পদ্ধতিতে হামলার চেষ্টা হবে। অর্থাৎ গোলাগুলি বা কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নয়। প্রাচীন পদ্ধতি বলতে কী কী হতে পারে?

আগের সাতটা মার্ডার যদি লক্ষ্য করা যায়, তবে ছুরি চালানো, গলা টিপে শ্বাসরোধ করা, পুকুরে চুবিয়ে মারা কিংবা উঁচু বহুতল থেকে ফেলে দেওয়া। ম্যাডামের বাংলোয় যে খুন হয়েছিল, সেটা তির ছুঁড়ে।

অতিথি নিবাসে থাকা প্রতিটা মানুষকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি আগে থেকেই কোথাও লুকিয়ে থাকে?

প্রিয়াঙ্কা অন্যমনস্কভাবে নিজের সালোয়ার কামিজের ওড়নায় কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল। ঘড়িতে রাত সাড়ে আটটা।

এ এস পি ম্যাডামের ফোনে ডায়াল করতে যাবে, হঠাৎ লোকেশবাবুর ইশারায় মুখ তুলে তাকাল।

একেবারে কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে চোদ্দো-পনেরোজনের একটি দল। তাদের প্রত্যেকের মস্তক মুণ্ডিত, মাথার পেছনদিকে দুলছে ব্রহ্মশিখা। পরনে আশ্রমের অন্যান্য সেবাইতদের মতোই সাদা ধুতি-ফতুয়া।

কিন্তু প্রিয়াঙ্কা সে'সব দেখছে না। দলটির একেবারে পেছনে যে কিশোরটা হাঁটছে, সে হাত দিয়ে কী যেন ইশারা করছে এদিকে।

প্রিয়াঙ্কা কিছু বুঝতে পারল না। কিশোরটির মুখচোখে ক্লান্তির ছাপ। আয়ত চোখদুটোয় একাকার হয়ে রয়েছে ভয়, আশঙ্কা ও উদ্বেগ। ভয়ে ভয়ে সে একবার তাকাল পাশে হেঁটে চলা দলের এক যুবকের দিকে।

প্রিয়াঙ্কা চোখ সরু করল।

কিশোরটি কি লুকিয়ে তাকে কিছু বলতে চাইছে?

নাম সংকীর্তনের শব্দ ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।

"আপনার মিসেস কোথায় লোকেশবাবু?"

লোকেশবাবু বললেন, "ও এই কাছেপিঠেই কোথাও রয়েছে। আমি তো কাজে ঢুকে গেলাম, বেচারি একলা হয়ে পড়ল। মন্দিরে বসে আছে বোধ হয়।"

"তাঁকে একটু ফোন করে এখানে আসতে বলুন না। আমি এখুনি আসছি।"

লোকেশবাবুর উদ্দেশ্যে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে প্রিয়াঙ্কা খুব মৃদু লয়ে এগিয়ে গেল।

ছেলেটা কে?

৪৮

সুনীত বসু বললেন, "আমি তোমার কথা শুনে ডি এম ম্যাডামের সঙ্গে কথা বললাম। একজন স্টাফকে ডাইরেক্টোরেটে পাঠিয়ে এমারজেন্সি বেসিসে অফিস খুলিয়ে মি. রায়ের সার্ভিসবুকও নিয়ে এলাম। রাধানাথ রায় পড়াশুনো করেছেন মায়াপুরের আবাসিক স্কুলে। সেখান থেকেই আই এস সি পাশ করেন, তারপর দিল্লি চলে যান। সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ।"

রুদ্র আর জয়ন্ত বিমূঢ় হয়ে বসেছিল।

রুদ্র বলল, "আমি প্রচণ্ড শকড স্যার! আমাদের এখন কী করা উচিত?"

"স্বাভাবিক। রাধানাথ রায়ের এই কেসে কী ভূমিকা তা এখনো স্পষ্ট না হলেও তিনি যে স্ট্রংলি কানেক্টেড, তা পরিষ্কার।" সুনীত বসু বললেন, "আমাদের খুব কেয়ারফুলি এগোতে হবে। রাধানাথ রায়ের অ্যাসেট লায়াবিলিটি রিপোর্টও হাতে এসেছে। মি. রায়ের নামে কোনো বড় অ্যাসেট নেই।"

"স্যার আপনাকে যে বললাম, শেখর চৌধুরীর নামে হুগলী, হাওড়া, কলকাতা এইসব জেলায় কী অ্যাসেট আছে, সেগুলোর রেকর্ড বের করতে, সেটা কি করেছেন?" রুদ্র জিজ্ঞেস করল।

কমিশনার সুনীত বসু মাথা নাড়লেন, "তাও করা হয়েছে। শেখর চৌধুরীর মৃন্ময়ী টেক্সটাইলসের নামে হাওড়া, কলকাতা ছাড়াও হুগলীতে একটা বিশাল প্লট রয়েছে। খোশলাপুর বলে একটা জায়গায়। প্রায় এক হাজার একর।"

"হাজার একর!" বিস্ময়ে রুদ্র চমকে উঠল, "তা কী করে হয় স্যার? ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট অনুযায়ী, চব্বিশ একরের বেশি তো একজন কোনো জমি হোল্ড করতে পারে না।"

"সে তো ব্যক্তিগত কারণে। এখানে তো জমিটা রয়েছে মৃন্ময়ী টেক্সটাইলসের নামে। কারখানার কারণে সরকার প্রয়োজন বুঝে বেশি জমি দিতেই পারে। কিন্তু সেই জমি প্রপারলি ইউটিলাইজ করা হচ্ছে কিনা, সেটাও রেগুলার মনিটর করা হয়। এক্ষেত্রে সে'সব কিছুই হয়নি। প্রায় কুড়িবছর ধরে সেই জমিতে কারখানার কিছুই হয়নি। ইন্ডাস্ট্রির বদলে সেখানে নাকি গড়ে উঠেছে ফার্মহাউজ। যেটা পুরোপুরি ইললিগ্যাল। এক্ষেত্রেও নিজের ইনফ্লুয়েন্স ইউজ করেছেন রাধানাথ রায়।" কমিশনার বললেন, "আপাতত এই চার্জ এনে তাঁর এগেন্সটে এনকোয়ারি শুরু করাই যায়। কিন্তু তাতে ফোকাস সরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এবং তাতে মি. রায় অ্যালার্টও হয়ে যেতে পারেন। আমাদের খুব কশাসলি এগোতে হবে।"

সুবিশাল পুলিশ কমিশনারের অফিস ঘর। সুনিত বসু বসে আছেন একটি প্রকাণ্ড কাঁচের টেবিলের বিপরীতে। উলটোদিকে ঘরের কোণায় তিনখানা কম্পিউটার সেট। সেগুলো মূলত কোনো চিঠি ড্রাফট বা অফিশিয়াল কাজে কমিশনারের সহকারীরা ব্যবহার করেন।

রুদ্র বলল, "আমি কি কম্পিউটারটা একবার ব্যবহার করতে পারি, স্যার?"

"ইয়েস! শিওর।"

রুদ্র গিয়ে কম্পিউটারে বসল। মিনিটদুয়েকের মধ্যেই ও উজ্জ্বল চোখে বলে উঠল, "যা ভেবেছি তাই। দেখুন স্যার! বাগডাঙার সামনে দিয়ে যে খালটা চলে গিয়েছে, সেটাই বইছে খোশলাপুরের পাশ দিয়ে। সেটা পুরোনো সরস্বতী নদীর একটা শাখা। অনেকদূর এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে গঙ্গায়। অর্থাৎ হুগলী নদীতে। আবার বদনপুর গ্রামের জিওগ্রাফিক লোকেশনটা লক্ষ্য করুন। খোশলাপুরের পাশের নদী একটা বাঁক সৃষ্টি করেছে, সেই বাঁকের ওপারেই বদনপুর। আমীশ কমিউনিটি থেকে মাঝেমাঝেই লোক নদী পার হয়ে তাই বদনপুরে এসে উঠত। বদনপুর, খোশলাপুর, বাগডাঙা এগুলো সব জলপথে ওয়েল কানেক্টেড। এবং ওই খোশলাপুর থেকে সরস্বতী নদী নেয়ে গঙ্গায় এসে সেখান দিয়ে যাওয়া সম্ভব মায়াপুরেও!"
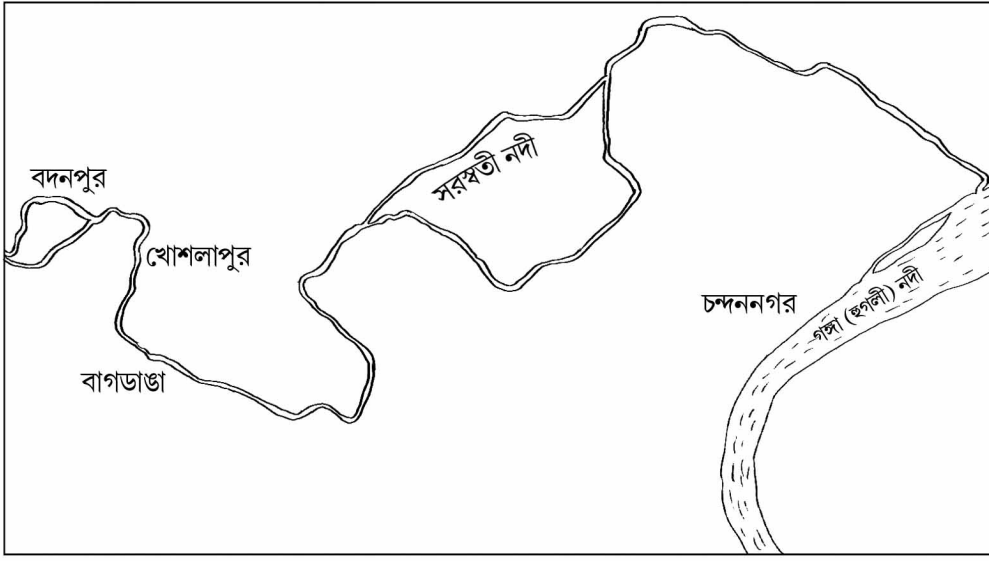
সুনীত বসু এগিয়ে এসে মন দিয়ে দেখছিলেন। বললেন, "এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে এই টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির ভারতবর্ষে একটা গোটা কমিউনিটির সমস্ত লোক এইভাবে লুকিয়ে বসবাস করছে? মানে তাদের ভারতীয় আদমশুমারিতে কোনো হিসেব নেই, তাদের কোনো সরকারি পরিচয়পত্র নেই, তাদের সরকারি খাতায় কোনো অস্তিত্ব নেই? হাউ স্ট্রেঞ্জ!"

রুদ্র বলল, "স্ট্রেঞ্জ হলেও এটা সত্যি, স্যার। আমেরিকার মতো উন্নত দেশকেই দেখুন। আমেরিকায় এরকম বেশ কয়েকটা আমীশ কমিউনিটি আছে, যাদের পপুলেশন লক্ষাধিক। হ্যাঁ, মার্কিন সরকার তাদের অস্তিত্ব জানে ঠিকই, কিন্তু সেভাবে কোনো সরকারি কন্ট্রোল ওইসব কমিউনিটির ওপর নেই। এমনকি পরিচয়পত্রও তারা করাতে চায় না। এই নিয়ে আপনি ইন্টারনেটে অনেক নিউজ পাবেন। এস পি স্যারের মামা গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, মানে যিনি ওই তর্কপঞ্চাননের বংশের দত্তক সন্তান ছিলেন, তিনি নিজেও ওই আমীশদের মধ্যে নাকি কাটিয়েছেন অনেককাল।"

"কিন্তু রাধানাথ রায় তাঁর মামার কথায় ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে বাংলায় এমন কমিউনিটি করেছেন কেন? শুধুমাত্র যারা পালিয়েছে, তাদের মারবেন বলে আর যারা মডার্ন টেকনোলজির সঙ্গে যুক্ত, তাদের ক্ষতি করবেন বলে?" কমিশনারকে বিভ্রান্ত দেখায়,

"এটা কোন যুক্তি হল? তোমার ওই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের দশানন বধ-এর পুনরাবৃত্তি যদি মেনেও নিই, করে লাভটা কী হবে?"

রুদ্র চুপ করে গেল। এই একটা প্রশ্নের সামনে এসে সে প্রিয়মের সামনেও থমকে গিয়েছিল, কমিশনার সাহেবের সামনেও।

ও বলল, "স্যার, বৈদিক সমাজের যতজনের সম্পর্কে জানতে পেরেছি, প্রত্যেকের নাম কৃষ্ণ দিয়ে শুরু বা কৃষ্ণের একশো আটটা নামের একটা। আমার বাড়িতে যে মেয়ে-মা থাকত, তারাও কৃষ্ণভক্ত ছিল। রাধানাথ স্যার সম্ভবত নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করতেন।"

"তো?" কমিশনার বিরক্তমুখে তাকালেন, "নিজেকে কৃষ্ণ মনে করেন বলে খুনখারাপি করবেন কেন? তুমি জানো নব্বইয়ের দশকে উত্তরপ্রদেশে একজন সিনিয়র পুরুষ আই পি এস অফিসার ছিলেন, যিনি নিজেকে রাধা মনে করতেন। শুধু তাই নয়, পুরুষ হয়েও আইজি থাকাকালীন তিনি অফিসে রাধার পোশাকে, গয়না, সিঁদুর পরে আসতে শুরু করেছিলেন। সেইসময়ে এই নিয়ে সারাদেশে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কী যেন নাম ছিল ... হ্যাঁ মনে পড়েছে, ডি কে পাণ্ডা। তিনি নিজেকে 'দুসরি রাধা' বলে পরিচয় দিতেন। সে'সব নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছিল। আমরা তখন ইয়ং। কিন্তু তার সঙ্গে ক্রাইমের সম্পর্ক কী?"

রুদ্র চুপ করে রইল।

কমিশনার চিন্তিতমুখে বললেন, "যাইহোক, তাই বলে চুপচাপ বসে থাকা যায় না। মোটিভ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আপাতত তুমি আর জয়ন্ত বেরিয়ে যাও। আমি তোমায় ফোর্স দিয়ে দিচ্ছি। আর সঙ্গে রাধানাথ রায়ের বডিগার্ড অর্জুনকে নাও।"

"কিন্তু এস পি স্যার তো বডিগার্ড সঙ্গে নিতেন না?"

"না নিলেও অর্জুন একবার নাকি ওঁর সঙ্গে খোশলাপুরের ফার্মহাউজে গিয়েছিল। বলেছে আমার এক স্টাফকে। ও থাকলে সুবিধা হবে। আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছি।" কমিশনার বললেন, "আর বুঝতেই পারছ, কতটা সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে। ইটজ এক্সট্রিমলি ডেলিকেট সিচুয়েশন।"

"ইয়েস স্যার।" রুদ্র বলল, "কিন্তু রাধানাথ স্যার এখন কোথায়?"

সুনীত বসু একমুহূর্ত থামলেন। থমথমে মুখে বললেন, "উনি সম্ভবত নবদ্বীপেই আছেন। আমি ওঁর মোবাইলের লোকেশন ট্র্যাক করেছি। শেষ লোকেশন ওখানেই দেখাচ্ছে। ওখানে কী হতে পারে, রুদ্রাণী?"

"আমি জানি না স্যার!" রুদ্র অস্ফুটে বলল, "তবে যেটা হবে, সেটা ভালো কিছু নয়। এটুকু বলতে পারি!"

অর্জুন দশ মিনিটের মধ্যে ঘরে ঢুকে স্যালুট ঠুকল। সে এস পি স্যারের সামান্য দেহরক্ষী, খোদ কমিশনার কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। ছুটির দিন প্রায় ছুটতে ছুটতে শ্রীরামপর থেকে বাইক নিয়ে এসেছে। মুখচোখে উদ্বেগ স্পষ্ট।

সুনীত বসু সরাসরি প্রশ্ন করলেন, "আপনি রাধানাথ রায়ের সঙ্গে কখনো তাঁর ফার্ম হাউজে গিয়েছেন?"

অর্জুন এমন অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে আরও বিস্মিত হল। অবাকচোখে সে তাকাল জয়ন্তর দিকে। জয়ন্ত আর সে ব্যাচমেট।

জয়ন্ত দুই বড়কর্তার সামনে এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কিন্তু এবার চাপাস্বরে ধমকে উঠল, "স্যার যা জিজ্ঞেস করছেন, তার উত্তর দে না।"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ। একবার গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম বলাটা ভুল হবে। মানে ভুল করে পৌঁছে গিয়েছিলাম।"

"ভুল করে মানে?" কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন।

অর্জুন আরও ঘাবড়ে গেল। ইতস্তত করে বলল, "আমি তখন সবে স্যারের আন্ডারে জয়েন করেছি। জানতাম না স্যার প্রতি মঙ্গলবার রাতে ওই ফার্মহাউজে চলে যান। আর সেইসময় কাউকে সঙ্গে নেন না। কী করব, আমায় আগের গার্ড বলে দেয়নি স্যারকে হঠাৎ বাংলো থেকে নিজে গাড়ি চালিয়ে বেরোতে দেখেই আমি বাইক নিয়ে পিছু নিয়েছিলাম।"

"তারপর?"

"তারপর স্যারের গাড়ির পিছন পিছন পৌঁছে গেলাম সেই ফার্ম হাউজে।"

"সেখানে কী দেখলেন?"

অর্জুন আবার ঘাবড়ে গেল। সম্ভবত সে বুঝে উঠতে পারছে না, তার বলা উচিত কিনা।

রুদ্র ওর অবস্থা বুঝতে পেরে নরম গলায় বলল, "বলুন। আপনার হেজিটেট করার কিছু নেই।"

অর্জুন বলল, "এস পি স্যারের ফার্ম হাউজ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনে লোহার গেট। তার ওপর লেখা সম্বল ফার্ম হাউজ।"

"সম্বল?" ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন সুনীত বসু, "সম্বল ফার্ম হাউজ? এটা আবার কেমন নাম হল? ঠিক দেখেছ?"

"হ্যাঁ স্যার। পরিষ্কার মনে আছে। লাল রঙের সাইনবোর্ড। আমি ঢুকতে যেতেই লোক আটকাল। আমি স্যারের দেহরক্ষী শুনে ঢুকতে দিল। ভেতরে ফুল, ফল, গাছপালা, সবজি তরিতরকারির চাষ। আমি সব ঘুরে ঘুরে দেখছি, হঠাৎ দেখি স্যার আসছেন দেবদত্তর পিঠে চড়ে।"

"দেবদত্তর পিঠে চড়ে মানে?" সুনীত বসু ভ্রূ কুঁচকলেন।

অর্জুন বলল, "এস পি স্যারের ফার্ম হাউজে তো একটা ঘোড়া আছে স্যার। স্যার ওখানে গেলে সেই ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ান। আমার সামনে ঘোড়াটা দু'বার ছটফট করছিল বলে স্যার 'দেবদত্ত, অমন করেনা' বলে আদর করেছিলেন।"

"মাই গড! এগুলো আমরা কিছুই জানি না! বলে যাও।" কমিশনার অবাক চোখে বললেন।

"আমাকে দেখতে পেয়ে স্যার প্রথমে হতবাক হয়ে গেলেন। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে ঘুরিয়ে দেখালেন পুরোটা। ফার্ম হাউজের এলাকাটা বিশাল, কিন্তু তার বেশিরভাগটাই জঙ্গল। ঘন জঙ্গল।"

"সেই জঙ্গলে ঢুকেছিলেন আপনি?" রুদ্র জিজ্ঞেস করল।

"পাগল নাকি?" অর্জুন চোখ বড় বড় করে বলল, "খুব ঘন বন ম্যাডাম। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত বড় জঙ্গল সাফ করেননি কেন। স্যার উত্তর দিয়েছিলেন, বন্য প্রকৃতির সান্নিধ্য তাঁর ভালো লাগে।"

"তারপর?"

"স্যার একজনকে বলে ওই সন্ধেবেলাতেই গাছ থেকে ডাব পেড়ে এনে আমায় খাওয়ালেন। অত মিষ্টি ডাব আমি জীবনে খাইনি। তারপর আমাকে গেটের বাইরে নিয়ে এসে বললেন, আমি যেন শ্রীরামপুরে ফেরত চলে যাই। এই ফার্ম হাউজে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে থাকবেন বলেই তিনি বিয়ে করেননি। প্রতি মঙ্গলবার তিনি এখানে আসেন, আমি যেন আর কোনোদিনও এরকম পিছু নিয়ে বিরক্ত না করি। উনি ঠিকসময়ে ফিরবেন বৃহস্পতিবার ভোরে।"

"তারপর থেকে আপনি কোনোদিনও আর ওখানে যাননি, তাই তো?"

অর্জুন বলল, "আর কেউ যায় স্যার? এস পি স্যার ভীষণ রাগী, আবার আমাকে ওই তল্লাটে দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকত না!"

সুনীত বসু রুদ্রর দিকে তাকালেন। চোখে অনেক জিজ্ঞাসা।

রুদ্র বলল, "কীভাবে আপনি ওই ফার্ম হাউজে গিয়েছিলেন?"

"দিল্লি রোড থেকে বাঁদিকে টার্ন নিয়ে। দোগাছিয়া, বাহির রাণাগাছা, এইসব গ্রাম পেরিয়ে যেতে হয়।" অর্জুন বলল।

"ওকে।" সুনীত বসু বললেন, "আপনি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।"

অর্জুন স্যালুট ঠুকে বেরিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যেতেই রুদ্র বলল, "জঙ্গলটা মনে হচ্ছে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য স্যার!"

সুনীত বসু বললেন, "কীরকম?"

রুদ্র উঠে গিয়ে আবার কম্পিউটারের সামনে বসল। গুগল ম্যাপে মাউস স্ক্রল করে বলল, "দেখুন স্যার। ফার্ম হাউজটার প্রোব্যাবল লোকেশন বদনপুরের সামনে দিয়ে সরস্বতীর যে শাখা বয়ে গেছে তার উলটোদিকে।। ওই জায়গায় সরস্বতী চক্রাকারে ঘুরেছে। আর সেই লুপের মধ্যেই রয়েছে শেখর চৌধুরীর ফার্ম হাউজ।"
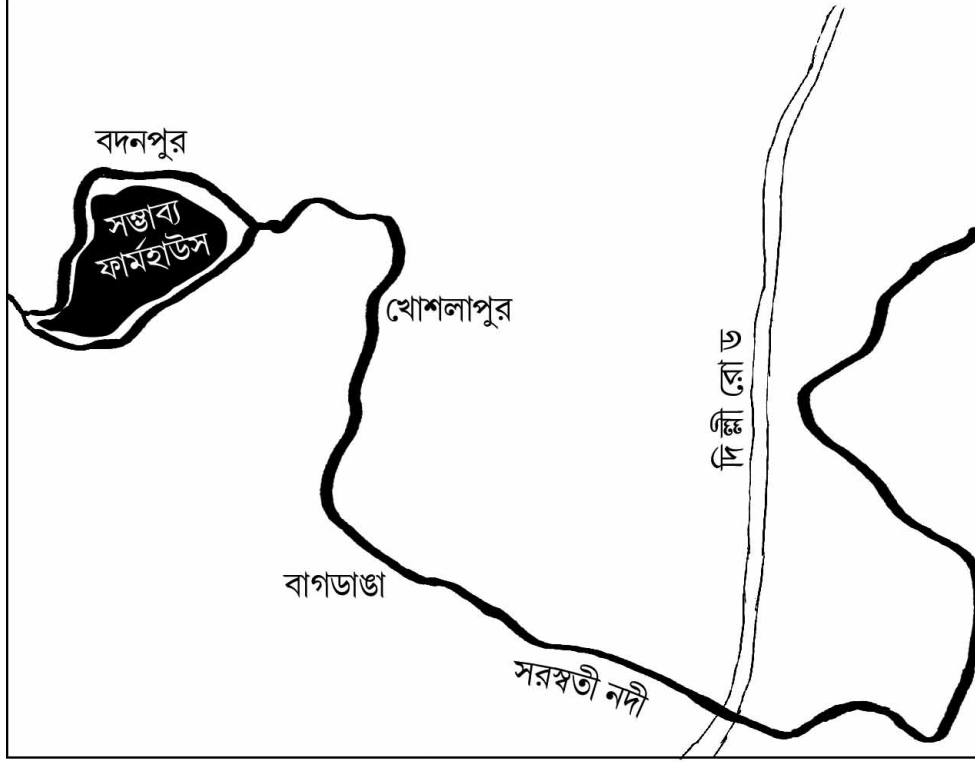
সুনীত বসু ছবিটা দেখছিলেন, ”কিন্তু অর্জুনের কথামতো ফার্ম হাউজের একটুখানি জায়গা বাদ দিলেই পুরোটাই তো জঙ্গল। তাহলে সেখানে ওই আমীশ কমিউনিটি কোথায়?”

”আমীশ তো ক্যাথলিকদের ওই কমিউনিটিকে বলে স্যার।”

”ওই যাই হোক, বাংলার ওই আমীশের মতো যে কমিউনিটি রাধানাথ রায় বানিয়েছেন বলে তুমি মনে করছ, সেটা কোথায়? পুরোটাই তো জঙ্গল।”

এবার জয়ন্ত ম্যাপের দিকে আঙুল তুলল। বলল, ”এও তো হতে পারে, জঙ্গল স্রেফ ফার্ম হাউজের সামনের দিকটাকে আলাদা করে জনসমক্ষে দেখানোর জন্য। হয়ত ওই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের পেছনেই রয়েছে সেই সমাজ। লক্ষ্য করে রেখুন, এরিয়াটার পেছনেই আবার সরস্বতী। আর সেই নদী বেয়ে কিছুদূর গেলেই পড়বে বাগডাঙার সেই আশ্রম। আর পূর্বদিকে সেই নদী বরাবর গেলে পৌঁছে যাওয়া যাবে মূল হুগলী নদীতে।”

সুনীত বসু চুপ করে রইলেন। বুঝতে চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা। তারপর বললেন, ”আর দেরি কোরনা। তোমরা বেরিয়ে পড়ো। আমি ফোর্স দিয়ে দিচ্ছি।”

৫০

জনাপনেরোর দলটা গোটা ক্যাম্পাসটা পাক দিচ্ছিল। দু-হাত ওপরে তুলে মাঝেমাঝেই 'হরেকৃষ্ণ' বলছিল, তারপর আবার হাঁটছিল। তাদের কারুর কারুর হাতে খঞ্জনি। সেগুলোর মিলিত শব্দে বেশ লাগছিল শুনতে।

দলের পেছনে অনেক সাধারণ ভক্তও হাঁটছিলেন, যারা জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এসেছেন এই পুণ্যধামে। উচ্চৈঃস্বরে হরেনাম না করলেও তাঁরা গলা মেলাচ্ছিলেন।

প্রিয়াঙ্কা ঢিমেতালে হাঁটছিল। সঙ্গে লোকেশবাবুর স্ত্রী। লোকেশবাবুর স্ত্রীর নাম কাকলি। তিনি বেশ সাধাসিধে মহিলা। হাঁটতে হাঁটতে মায়াপুরে প্রতিবছর আসার নানা টুকরোটাকরা অভিজ্ঞতার গল্প করছিলেন প্রিয়াঙ্কার কাছে।

"এখন কী ভিড় দেখছ, রাতের বেলা যখন মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে, তখন ভিড় উপচে পড়বে। আমি তো সেই ছোট্টবেলা থেকে বাবার হাত ধরে আসতাম। এখন লোকেশ প্রতিবছর আসতে পারুক না পারুক, আমি ঠিক কাউকে না কাউকে সঙ্গে করে চলে আসি। বছরে দোলপূর্ণিমা আর জন্মাষ্টমী, এই দুটো তিথিতে এখানে না এলে মনটা বড় খারাপ লাগে, জানো!"

স্বামীর সহকর্মীর সঙ্গে কাকলি নিজের মনে বকে চলেছিলেন। প্রিয়াঙ্কাও হু—হা করছিল। ইচ্ছে করেই ও লোকেশবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে হাঁটছে, এতে কেউ লক্ষ্য করলেও সন্দেহ করবে না।

ওর ভেতরটা আফশোসে পুড়ে যাচ্ছে।

ছেলেটা কোথায় গেল? কিছুদূর গিয়ে যেন উবে গেল ভিড়ের মধ্যে। আসলে চারপাশে একই পোশাক, একই ধরনের কিশোর স্বেচ্ছাসেবকের ছড়াছড়ি। প্রিয়াঙ্কা গুলিয়ে ফেলেছে।

ছেলেটা কি ওকে চেনে? ওরা এত কড়া নিরাপত্তায় গোটা ক্যাম্পাস মুড়ে রেখেছে, তবু কি সেই আমীশ সমাজের লোকেরা এখানে সাধারণ লোকদের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে?

একদিকে জনা চার পাঁচ শাড়ি পরিহিতা বিদেশিনী কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে 'হরেকৃষ্ণ' গাইছিলেন। তাদের ঘিরে রয়েছে কিছু স্থানীয় ভক্তের জটলা।

কাকলি সেদিকে এগিয়েও হঠাৎ থেমে গেলেন। বললেন, "আমি একটু বাথরুম যাব। তুমি যাবে?"

"না।" প্রিয়াঙ্কা বলল, "আপনি ঘুরে আসুন। আমি এখানেই থাকব।"

কাকলি মাথা নেড়ে প্রস্থান করতেই প্রিয়াঙ্কা ছেলেটাকে আবার দেখতে পেল। বিদেশিনীদের সেই নাচের দলের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে সেই ধুতি-ফতুয়া। মুখটা ঢলোঢলো, চোখদুটোয় বুদ্ধি ঝকঝক করছে। অন্যদের মতো এর মাথা চকচকে করে কামানো নয়। অল্প অল্প চুল রয়েছে।

ছেলেটার হাতে একটা পেতলের থালা। তার ওপর যে ফুলগুলো রাখা রয়েছে, সেগুলো সম্ভবত প্রসাদী। প্রত্যেক ভক্তের কাছে ধীর মন্দ্র পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

প্রত্যেক ভক্ত সেই থালা থেকে একটু বা দুটি ফুল তুলে নিলে সে আবার চলেছে পরের জনের কাছে।

এদিকটা অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। প্রিয়াঙ্কা চুপিসারে গিয়ে একেবারে পেছনদিকে দাঁড়াল, যাতে ছেলেটা একেবারে শেষে ওর কাছে আসে। ওর আশেপাশে ওই পোশাকের আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ছেলেটা ওর কাছে আসতেই ও মিষ্টি করে হাসল। চাপা গলায় আন্দাজে একটা ফাঁকা প্রশ্ন ছুঁড়ল, ”আমায় চিনতে পারছ তুমি?”

"হ্যাঁ।" লম্বা করে মাথা হেলালো ছেলেটা, "কানুখুড়োর মন্দিরে এসেছিলে না তুমি? তোমার সঙ্গে আরেকজন ছিল। দুজনেই ছেলেদের মতো জামা পরেছিলে। আমি জানলা দিয়ে দেখেছিলাম।"

"ঠিক বলেছ তুমি।" প্রিয়াঙ্কা বলল, "তুমি কানুখুড়োর ওখান থেকে কবে এলে?"

ছেলেটার মুখটা কালো হয়ে গেল। চারপাশ একবার দেখে নিয়ে বলল, "কালই। নিজে থেকে আসিনি গো। জোর করে ধরে এনেছে।"

"জোর করে ধরে এনেছে? কেন?"

ছেলেটা চোখ নামাল। বলল, "গুরুদেবের আদেশ। কানুখুড়োকে খুব মেরেছে গো।"

৫১

রুদ্রর গাড়ি ঝড়ের গতিতে ছুটছিল দিল্লি রোড ধরে। গাড়ি চালাচ্ছে জয়ন্ত। সামনের আসনে বসে রুদ্র টেনশনে বারবার নখ কাটছে। পেছনে রয়েছে রাধানাথ রায়ের দেহরক্ষী অর্জুন ও তিনজন কনস্টেবল।

সঙ্গে আসছে একটা পুলিশ জিপ। তাতে দশজন কনস্টেবল। বাকিদের নিয়ে কমিশনার সুনীত বসু নিজে আসছেন একটু পেছনে।

জয়ন্ত বলল, "কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, আমাদের এই আমীশ সমাজ খুঁজতে যাওয়ার থেকে কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মায়াপুরে থাকা ছিল না? আপনি নেই, ওরা যদি বাই চান্স সিচুয়েশন কন্ট্রোল করতে না পারে, পুরো রেসপন্সিবিলিটি আপনার ঘাড়ে পড়ে যাবে। লোকেশবাবু কি সব সামলাতে পারবেন?"

রুদ্র বলল, "কথাটা তুমি ঠিকই বলছ, জয়ন্ত। কিন্তু কিছু কিছু সময় এমন আসে, যে কিছু করার থাকে না। এটা তো বুঝতে পারছ, মায়াপুরের সঙ্গে ওই সমাজের সবসময় যোগাযোগ রয়েছে। যতই ওরা নতুন টেকনোলজিকে ঘৃণা করুক, নিজের লোকদের এইসব ব্রেইন ওয়াশ করুক, এস পি স্যার নিজে দরকারে যে মোবাইল ব্যবহার করেন, তা আমরা সবাই জানি। আমরা সবাই একই জায়গায় থাকলে এইদিকটায় ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে। সেটাও তো ভুললে চলবে না।"

জয়ন্ত চুপ করে রইল।

"আর লোকেশবাবু সিনিয়র বলে তাঁকে বলে এসেছি, কিন্তু আসল কাজ তো করবে প্রিয়াঙ্কা। প্রিয়াঙ্কা কমপিটেন্ট অফিসার। ওর ওপর আমার ভরসা রয়েছে।" রুদ্র আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফোন বাজতে শুরু করল। কমিশনার সুনিত বসু আবার ফোন করছেন।

"হ্যাঁ স্যার, বলুন। আমরা অন দ্য ওয়ে রয়েছি।"

"রুদ্রাণী, কয়েকটা কথা মন দিয়ে শোনো। রাধানাথ রায়ের দাদা শেখর চৌধুরী গত কয়েক বছর ধরে একটা মোটা টাকা মায়াপুরে ডোনেট করেন। যদিও দাদার নামে, আমি শিওর, এর পেছনে রাধানাথ রায়ই রয়েছেন।"

"হ্যাঁ স্যার।" রুদ্র বলল, "লোকেশবাবুও বলছিলেন, উনি আগে দু'একবার স্যারকে ওখানে দেখেছেন। আপনি কি একবার লোকেশবাবুর সঙ্গে কথা বলবেন?"

"রুদ্রাণী, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। এইবছর গোটা মন্দিরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে যে মহাপ্রসাদ ভক্তদের খাওয়ানো হবে, সেই ভোগ রান্নার কন্ট্রাক্ট পেয়েছে চন্দননগরের বাগডাঙা সরলাশ্রম। এই কন্ট্রাক্টে গ্যারান্টর হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন শেখর চৌধুরী।"

তীব্র এক ঝাঁকুনি। রুদ্রর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল।

"রুদ্রাণী, ক্যান ইউ হিয়ার মি? তুমি তো ওই আশ্রমে গিয়েছিলে, রিপোর্টে দেখলাম।"

রুদ্রর মাথা কাজ করছিল না। তার মধ্যেই ওর মনে হল, এই মুহূর্তে মায়াপুর মন্দিরে কত সংখ্যক ভক্ত রয়েছেন?

দশ হাজার? পনেরো হাজার?

ভোগের প্রসাদে বিষ মিশিয়ে যেভাবে একসঙ্গে এতজনকে হত্যা করা যায়, তেমন কোনো সুযোগ আর কোন পন্থায় আছে কি? এতক্ষণ কেন একবারও এই সম্ভাবনাটা মাথায় আসেনি?

ও উদ্ভ্রান্তের মতো বলল, "স্যার, উইথ ডিউ রেসপেক্ট, আমি আপনাকে একটু পরে ফোন করছি।"

ফোনটা কেটে দিয়ে ও ফোন করল প্রিয়াঙ্কাকে। ওর বুকের মধ্যে জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে।

প্রিয়াঙ্কার ফোন বেজে বেজে কেটে গেল। কেউ তুলছে না। রুদ্র ঘড়ি দেখল। রাত সাড়ে দশটা।

ক'টায় বিতরণ হয় মহাপ্রসাদ?

রুদ্র আবার ডায়াল করল। এবার লোকেশ বাবুর নম্বরে। বেশ কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর ফোন রিসিভ করলেন ভদ্রলোক, "ইয়েস ম্যাডাম!"

"প্রিয়াঙ্কা কোথায়?"

লোকেশবাবু কী বলছেন, ভালো করে শোনাই যাচ্ছে না। পাশেই প্রচণ্ড জোরে চলছে হরিনাম সংকীর্তন। খোল কর্তালের আওয়াজে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

রুদ্র চেঁচিয়ে বলল, "হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? প্রিয়াঙ্কা কোথায়?"

"কে? প্রিয়াঙ্কা ম্যাডাম? উনি আর আমার স্ত্রী একটু প্রধান মন্দিরের দিকে গিয়েছেন। কিছু বলতে হবে, ম্যাডাম?"

রুদ্র বলল, "আপনি ইমিডিয়েটলি ওকে বলুন, রাত বারোটায় যে ভোগ বিতরণ হবে, সেই খাবারের রান্নাঘর যেন সিজ করে। এনশিওর করুন, একজন লোকও, অ্যাই রিপিট একজন লোকও যাতে সেই ভোগ না খায়।"

"কী বলছেন ম্যাডাম?" খোল কর্তালের আওয়াজ ছাপিয়ে লোকেশবাবু প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করছেন, "ওহ এখানে এত আওয়াজ, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না! কী বলছেন, রোগ নির্ধারণ? না, এখানে তো কেউ অসুস্থ নেই!"

রুদ্র বিরক্ত হয়ে ফোনটা কেটে দিল। ঘড়িতে রাত এগারোটা। যত দ্রুত সম্ভব মায়াপুর মন্দিরের রান্নাঘর সিল করতে হবে। কমিশনার স্যারকে ফোন করে নদীয়ার টাস্ক ফোর্স যারা এই মুহূর্তে ওখানে ডিউটি করছে, তাদের বলাটাই ঠিকঠাক হবে।

যথাসম্ভব সংক্ষেপে গোটা বক্তব্য বুঝিয়ে ফোন রাখল ও। ঘড়িতে রাত এগারোটা পনেরো। দিল্লি রোড দিয়ে সাঁই সাঁই করে লরি ছুটে চলেছে। উলটোদিক থেকে আসা গাড়ির সার্চলাইট চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

রুদ্রর বুকের ভেতরটা কেমন করছে। কী অপেক্ষা করছে আজ সেই অজানা ফার্মহাউজের অন্তরালে?

চাকরিতে যোগদানের পর থেকে যে মানুষটিকে দেখে এসেছে কর্মক্ষেত্রে নিজের আদর্শ হিসেবে, সেই মানুষটিই কিনা শেষে অপরাধের মূল নায়ক সাব্যস্ত হয়েছেন?

কিন্তু কেন?

কমিশনার সাহেবের কথায় ‘কেন এতগুলো খুন করাবেন তিনি?’

প্রিয়মের কথায়, ‘মোটিভ কী?’

ভাবতে ভাবতে রুদ্র যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন থেকে ক্ষমা, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র থেকে সরলাশ্রমের ভর্তৃহরি মহারাজ, কানু চক্রবর্তী থেকে আমেরিকার শুভাশিসবাবু, সবাই যেন ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নের মতো আসছিল ওর ভাবনার মধ্যে।

যেন একটা প্রকাণ্ড দরজা। সেই দরজার পাল্লায় লাগানো রয়েছে অসংখ্য ছোটবড় তালা। ওর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা চাবির গোছা। কাজ শুধু সঠিক তালায় সঠিক চাবি লাগানো।

সময় খুব কম। সব তালা ঠিকমতো না খুলতে পারলে খোলা যাবে না দরজা। ঘটে যাবে ভয়ংকর বিপদ।

৫২

হঠাৎ পেছন থেকে জয়ন্তের কথায় রুদ্রর চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। চলন্ত গাড়িতে চমকে তাকায় ও, "কী হয়েছে?"

"ম্যাডাম, অনেকক্ষণ থেকে আপনার ফোন বাজছে!"

সত্যিই তো! ফোন বেজে চলেছে, ও খেয়ালই করেনি। অজানা নম্বর দেখে তড়িঘড়ি রিসিভ করে ও, "হ্যালো!"

"কাজটা ভালো করলে না রুদ্রাণী। তোমার প্রোবেশন পিরিয়ডের মধ্যেই কেরিয়ারটাকে শেষ করে ফেললে!"

এস পি রাধানাথ স্যারের হিমশীতল কণ্ঠে বলা কথাগুলো কানে প্রবেশ করা মাত্র রুদ্র স্থির হয়ে গেল।

রাধানাথ স্যার নিজে ফোন করেছেন ওকে। এটা কোন নম্বর?

ও কিছু বলার আগেই স্যার বললেন, "কী ভাবছ, আমাকে জেলে পুরবে? কোনো প্রমাণ আছে তোমার কাছে? কোর্টে গিয়ে কি তোমার ইতিহাসের গালগল্প শোনাবে? না অন্য কোনো ছেঁদো গল্প জুড়বে?"

রুদ্র স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। যে স্যারকে ও এতদিন দেখে এসেছে, তার সঙ্গে ফোনের ওপারের কণ্ঠস্বরকে যেন মেলাতে পারছিল না কিছুতেই।

শ্রদ্ধার আগলটা যখন ভেঙে যায়, তখন আর মানুষটি শ্রদ্ধেয় থাকেন না। নেমে আসেন নিজেরই স্তরে। কিংবা নিজের থেকেও নীচে।

রুদ্র হেসে বলল, "কেন স্যার? আপনার ফার্ম হাউজের নাম শম্ভল, দেবদত্ত আপনার ঘোড়ার নাম, আপনি তো সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার!"

বিপরীত প্রান্তে রাধানাথ রায় একটু থমকে গেলেন। কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "মানে?"

"মানে তো স্পষ্ট স্যার।" রুদ্র মিহিস্বরে বলল, "আপনি নিজেকে অন্তিম অবতার কল্কি মনে করেন। কল্কির গ্রামের নাম শম্ভল, ঘোড়ার নাম দেবদত্ত। সেইজন্যই তো আপনি এই নামকরণগুলো করেছেন। আপনার হাতেই তো কলিযুগের বিনাশ! আপনিই তো ত্রাতা।"

ওপাশে রাধানাথ স্যার সম্পূর্ণ চুপ। কোনো শব্দ নেই।

রুদ্র বলল, "কিন্তু এই নিরপরাধ লোকগুলোকে মেরে কীভাবে আপনি সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করবেন, স্যার?"

"নিরপরাধ? কারা নিরপরাধ?" রাধানাথ রায় এবার চিৎকার করে উঠলেন, "তোমার ওই স্বপন সরকার? যে নিজে শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণ চাকর রাখার দুঃসাহস করে? না ওই শিবনাথ? যে এই পবিত্র বৈদিক সমাজ ছেড়ে পালিয়ে যায় পাপের জগতে? নাকি ওই ডাক্তার সুবল ভট্টাচার্য, যার আসল রোজগার অ্যাবরশন করে পৃথিবীর আলো দেখার আগেই শিশু খুন করা?"

"এতই যদি পাপের জগৎ হয়, তবে আপনিই বা কেন এখানে থাকেন?" রুদ্রর রাগ ক্রমেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

"আমি কেন থাকি? শুনতে চাও?" ফোনের পর্দা ছাপিয়ে রাধানাথ অট্টহাস্য করে উঠলেন, "চতুর্থ অবতার কে ছিলেন জানো নিশ্চয়ই? নৃসিংহ। পাপী রাজা হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে পৃথিবী তখন জর্জরিত। হিরণ্যকশিপু কৌশলে ব্রহ্মার থেকে বর আদায় করে নিয়েছিলেন। দিনে বা রাতে তাঁকে হত্যা করা যাবেনা, পশু, মানুষ বা দেবতা কেউই তাকে হত্যা করতে পারবে না, এমনকি ভূমিতে বা আকাশেও হিরণ্যকশিপু ছিলেন অবধ্য। তাই সুপুত্র প্রহ্লাদ যখন দুরাচারী পিতার প্রশ্নে বললেন, বিষ্ণু বিরাজমান সবজায়গায়, এমনকি রাজসভার ওই থামেতেও, হিরণ্যকশিপু তখন প্রচন্ড দম্ভে লাথি মেরে ভেঙে চাইলেন সেই থাম। আর সেই থাম ভেঙে আবির্ভূত হলেন নৃসিংহ অবতার। তিনি পশু, মানুষ, দেবতা কোনোটাই নন, মধ্যবর্তী অর্ধ-মনুষ্য অর্ধ-সিংহাকার। তিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থল গোধূলি লগ্নে, হিরণ্যকশিপু ভূমি বা আকাশ, কোথাওই বধ্য নন, তাই নৃসিংহ তাঁকে নিজের জঙ্ঘার ওপর স্থাপন করে নখরাঘাতে বধ করেন।"

রুদ্র শুনছিল। ইচ্ছে করেই ও আরও বেশি দীর্ঘায়িত করতে চাইছিল এই কথোপকথন। নিজের বক্তব্য মিউট করে রেকর্ডার অন করে নিঃশব্দে শুনে চলেছিল ও। রাধানাথ স্যার যে উদ্দীপ্ত স্বরে টানা বলে চলেছিলেন, সেই রাধানাথ রায়কে চেনে না ও। এ যেন সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ!

গাড়ি রুদ্রর নির্দেশমতো দিল্লিরোড দিয়ে সোজা ছুটছিল, এমনসময় পেছন থেকে অর্জুন চেঁচিয়ে উঠল, "বাঁদিক নিন, বাঁ দিক নিন, খোশলাপুরের রাস্তা এইটাই!"

ড্রাইভার বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও রুদ্র সঙ্গে সঙ্গে সামাল দিল, "না। সোজা চলো। দোগাছিয়ার রাস্তা দিয়ে ঢুকবে। বদনপুর হয়ে যাব আমরা।"

জয়ন্ত বলল, "বদনপুর! সে তো ওই ফার্ম হাউজের উলটোদিকে। এই রাতদুপুরে নদী পেরোবেন কী করে ম্যাডাম?"

"কমিশনার স্যার সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। লোকাল থানাও থাকবে। বদনপুরের চণ্ডীমন্দিরের ঘাট পেরিয়ে ওপারে যাব আমরা। নাহলে ফার্ম হাউজ দিয়ে সোজা ঢুকতে গেলে এই রাত্রিবেলা ওই দুর্ভেদ্য জঙ্গল পেরোতে হবে। যা রিস্কি।" কোনমতে কথাগুলো বলে রুদ্র আবার টেলিফোনে মনোযোগ দিল।

রাধানাথ স্যার এখনো বলে চলেছেন, "তাহলে বুঝতে পারছ? যে কারণে নৃসিংহ অবতারকে পাপিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর রাজসভায় উপস্থিত থাকতে হয়েছিল, আমাকেও সেই কারণেই তোমাদের ওই পাঁকে নিমজ্জিত জগতে থাকতে হয়। বৃহত্তর প্রয়োজনে শত্রুর বন্ধু হতে হয়।"

রুদ্র বলল, "কী চান আপনি?"

রাধানাথ স্যার বললেন, "এখনো বুঝতে পারছ না? সব কিছু ধ্বংস করে নতুন করে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করতে। আর এই কল রেকর্ড করে কোনো লাভ নেই। ক্রিপ্টেড সার্ভার থেকে স্পুফ করা এই কল কোথাও ট্র্যাক করা যাবে না।"

"যাক! দরকারে আপনি তাহলে প্রযুক্তি ঠিকই ইউজ করেন! আর ট্র্যাক না করা যাক, মিথ্যে বলাটা বন্ধ করুন, স্যার!" রুদ্র ফিসফিস করে বলল, "ওসব আপনার আমীশ সমাজের ওই ব্রেইন ওয়াশ করা লোকজনকে বোঝাবেন। আপনি তো চান মায়াপুর মন্দিরটা দখল করতে।"

"মানে?" একটু যেন থমকে গেলেন রাধানাথ রায়।

"মানেটা তো খুব সোজা। আজ রাতে মন্দিরের মহাভোগ খেয়ে যে হাজার হাজার মানুষ অসুস্থ হবে কিংবা মারা যাবে, তার দায়টা গিয়ে পড়বে বাগডাঙা সরলাশ্রমের ওপর। যার গ্যারান্টর হিসেবে সই করিয়েছেন দাদা শেখর চৌধুরীকে। যে দাদা ভাইয়ের সব অন্যায়ে সাধ দিয়েছেন শুধুমাত্র স্নেহের বশে। সেই দাদাকেই ফাঁসিয়ে জেলে ঢোকাতে আপনার হাত কাঁপবে না। যে আশ্রমের গোটা প্রপার্টিটা জয়েন্টলি কেনার পরই আপনি খুন করেছেন স্বপন সরকার আর হৃষীকেশ জয়সোয়ালকে। যিনি উইটনেস ছিলেন, সেই ড. সুবল ভট্টাচার্যকেও সরিয়ে দিয়েছেন। আপনার দাদা এমনিতেই এখন মায়াপুর মন্দিরের গভর্নিং বডিতে একজন হোমড়াচোমড়া। এত বড় কাণ্ডের পর বর্তমান প্রেসিডেন্টকে সমস্ত দায়ভার মাথায় নিয়ে সরে যেতে হবে। সরতে হবে আপনার দাদাকেও। সেই পদে ঢুকবেন আপনি। বেশ সুন্দর প্ল্যান। বন্ধু কানু চক্রবর্তী আপনাকে ভালোবাসেন, সেই ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে তাঁকে বাধ্য করেছেন মুখ বন্ধ রাখতে, দাদা শেখর চৌধুরীকেও তাই। অথচ কাজ মিটে গেলে এদের সর্বনাশ করতে আপনার বিবেকে একফোঁটাও বাধবে না। আসলে কল্কি টল্কি কিস্যু না, আপনি একজন প্রচণ্ড স্বার্থপর মানুষ।"

রুদ্র ধীরে ধীরে সত্যি মিথ্যে মেশানো, জানা অজানায় মেলানো কথাগুলো বলছিল।

রাধানাথ স্যার এখনো নবদ্বীপে আছেন না ওই শম্ভল ফার্ম হাউজে, তা ও জানেনা। কিন্তু যেখানেই থাকুন, কথোপকথন দীর্ঘায়িত করে তাঁকে ব্যস্ত রাখলে ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি।

এদিকে গাড়ি এসে পৌঁছেছে বদনপুরের চণ্ডীমন্দিরে। নিস্তব্ধ রাত। দূরে কোথাও শিয়ালের আওয়াজ যেন খানখান করে দিচ্ছে সেই নৈঃশব্দ্য। তবু চণ্ডীমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন থানার ওসি আশুতোষ তরফদার। সঙ্গে বেশ কয়েকজন কনস্টেবল।

রাধানাথ গর্জন করে রুদ্রর কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, রুদ্র ফোনটা কেটে দিল।

গাড়ি থেকে নেমে ওসিকে বলল, "নৌকো?"

"সব রেডি আছে ম্যাডাম।" ওসি আশুতোষ তরফদার স্যালুট করলেন।

রুদ্রর ইনফরমার মিন্টুও এসে হাজির হয়েছে। সে চাপা গলায় বলল, "কানু চক্রবর্তীর সঙ্গে যে ছেলেটা থাকত, তার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল, ম্যাডাম?"

"না।" রুদ্র সংক্ষেপে বলল, "এই ঘাট কি চৌধুরীরাই বানিয়েছিল?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। নীলকণ্ঠ চৌধুরীর ঠাকুরদার আমলে বানানো।"

ওসি এগিয়ে এলেন, "ম্যাডাম, আপনার কথামতো তিনটে নৌকোর অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। আমাদের বাকি ফোর্স ফার্ম হাউজের সামনে দিয়ে ঢুকবে। এদিকে আসুন।"

প্রিয়ম ফোনে সব শুনে বলল, "একজন সিনিয়র আই পি এস অফিসার হয়ে শেষে কল্কি হওয়ার মতো পাগলামি?"

রুদ্র বলল, "পাগলামি বলছ কেন?"

"কারণ মাঝেমাঝেই এরকম একেকজন নিজেকে কল্কি বলে দাবি করে। বিশেষত উত্তরভারতের স্বঘোষিত ধর্মগুরুরা। তবে হ্যাঁ, সেই পাগলামি থেকে এতগুলো মার্ডার, আস্ত একখানা অলটারনেট ইকোনমি গড়ে তুলে অতগুলো লোককে নিয়ে দল গড়ে তোলা, এমন নজির নেই। তবে এমনিতে কল্কি অবতার নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে।"

রুদ্র ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে নিকষ কালো অন্ধকার। মনে হচ্ছে নির্জন এই চরাচর যেন পৃথিবীর বাইরের কোনো জায়গা। নৌকোর মাঝিরা কাজ করছে চুপচাপ।

ও ফিসফিস করে বলল, "কী বিতর্ক? হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী কল্কি অবতার তো এখনো জন্মায়ইনি! রাধানাথ স্যার নিজেকে কল্কি ভেবে সবকিছু ধ্বংস করতে চাইছেন। হয়তো মায়াপুর মন্দিরে পুরো জাঁকিয়ে বসার পরে তাঁর আরও কোন প্ল্যান রয়েছে।"

"বললাম তো, তোমার ওই এস পি স্যারই প্রথম নন, যিনি নিজেকে কল্কি ভাবেন। এটা কি জানো, অনেকে মনে করেন হজরত মহম্মদ আসলে কল্কি অবতার ছিলেন?"

"হজরত মহম্মদ?" রুদ্র অবাক গলায় বলল, "তিনি মুসলিম ধর্মের প্রবর্তক। তিনি হিন্দু অবতার হবেন কেন?"

"কেন'র উত্তর যদি সবসময় থাকত, তবে তো কোনো বিতর্কই কখনো মাথাচাড়া দিত না। একটু দাঁড়াও, এই ব্যাপারে লাইব্রেরিতে একটা বই আছে। কী যেন ভদ্রলোকের নাম, খুব হইহই হয়েছিল বইটা নিয়ে। একবার এয়ারপোর্ট থেকে কিনেছিলাম।" প্রিয়মের কথার মাঝেই রুদ্র সিঁড়ি দিয়ে নামার আওয়াজ শুনল।

প্রিয়ম একতলায় লাইব্রেরি ঘরে যাচ্ছে।

ও ফোনটা কানে চেপে ধরে ঘাটের দিকে এগিয়ে এল। ঘাট অবশ্য নামেই, কোনোকালে বাঁধানো শান ছিল, এখন ভেঙে সব জলে মিশে গেছে। বদনপুর থানার ওসি বেশ কাজের, জোরালো সাত-আটটা টর্চ জ্বেলে রেখেছে তাঁর স্টাফেরা। নাহলে এই অন্ধকারে পিচ্ছিল কাদায় যে কেউ হড়কে পড়ত।

উত্তেজনায় রুদ্র নখ ছিঁড়ছিল। রাধানাথ স্যারের এই কর্মকাণ্ডের পেছনে বৈষয়িক কোনো উদ্দেশ্য নেই বলেই মনে হয়। তবে এইভাবে স্যার যদি মায়াপুর মন্দির দখলও করেন, তারপর কীভাবে তাঁর লক্ষ্যপূরণ করবেন? মায়াপুর মন্দির ক্যাম্পাসের সমাজ, শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতি সবই কি ধীরে ধীরে পালটে যাবে? মুক্তমনা উদারতার বদলে জায়গা দখল করবে মধ্যযুগীয় আমীশ সম্প্রদায়?

কিন্তু দেশে আইন শৃঙ্খলা আছে, গণতান্ত্রিক শাসন আছে, সেসব সামলে কীভাবে স্যার এগোবেন?

পরক্ষণে ওর মনে পড়ে গেল শুভাশিসবাবুর কথাগুলো। আমেরিকার মতো প্রথম বিশ্বের দেশে যদি তারা বহাল তবিয়তে বাস করতে পারে, সরকার যদি তাদের প্রতি নরম মনোভাব নিয়ে চলে, এখানে তা অসম্ভব কেন? এখনো রুদ্র এটাই জানতে পারেনি যে, স্যারের এই বাংলা আমীশ সমাজে কতজন রয়েছে? তবু সেই সংখ্যাটা একলাফে কয়েকগুণ বেড়ে যাবে মায়াপুর দখলের পর। এখনই সমূলে বিনষ্ট করতে না পারলে হয়তো বাংলায় আবার ফিরে আসবে সামন্ত্রতান্ত্রিক শাসন, কুসংস্কার। সরকার তখন চাইলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য সেভাবে দমন করতে পারবে না। সুর নরম করতেই হবে।

প্রায় সাত-আটমিনিট পর প্রিয়মের গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ পেয়েছি। ভদ্রলোকের নাম ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়। তিনি মনে করেন, হিন্দুরা কলিযুগে যে কল্কি অবতার জন্মানোর অপেক্ষায় রয়েছে, হজরত মহম্মদই সেই অবতার। কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন কল্কি অবতারের বাবা-মা, ঘোড়া, গ্রাম, আরও অনেক কিছুই মহম্মদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।"

"কীরকম?" রুদ্র জিজ্ঞেস করল। একটা নৌকো কাদায় আটকে গেছে, মাঝিরা টানাটানি করছে। এখনো কিছুটা সময় লাগবে। তার মধ্যে শুনে নেওয়াই যায়। তাতে টেনশনও কম হবে।

"আমি বই থেকে পড়ছি শোনো। হিন্দুধর্মের পরিভাষায় রসুলকে অবতার বলা হয়। ঈশ্বরের পক্ষ থেকে যাকে অবতীর্ণ করা হয় তিনিই অবতার। সে হিসেবে যিনি সর্ব শেষে আসবেন তিনি অন্তিম অবতার। অন্তিম অর্থ শেষ এবং অবতার অর্থ রসূল অর্থাৎ শেষ রসুল। হিন্দুধর্মে যুগ চারটি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি।"

"আরে এসব জানি। মহম্মদ কেন কল্কি, সেই ব্যাপারে কী লেখা আছে?" রুদ্র বাধা দিয়ে বলল।

"পড়ছি একে একে। শোনো।

১। ঋগ্বেদে লেখা আছে অন্তিম অবতার বা শেষ রসুলের নাম হবে 'নরাশংস'।

নরাশংসং সৃধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমং দিবো ন সদ্মম খস।।[১]

'নরাশংস' —এর অর্থ 'প্রশংসিত ব্যক্তি'। যার আরবী অর্থ হল 'মুহাম্মদ'।

২। অন্তিম অবতারের পিতার নাম হবে 'বিষ্ণুযশা'।

সুমত্যাং বিষ্ণুযশা গর্ভমাধত্ত বৈষ্ণবম[২]

'বিষ্ণুযশা' অর্থ 'মালিকের দাস'। যার আরবী অনুবাদ হল 'আবদুল্লাহ'। আর হজরত মুহাম্মদের পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ।

৩। কল্কিপুরাণে লেখা আছে যে, কল্কি অবতারের মাতার নাম 'সুমতি'।

সুমত্যাং মাতরি বিভো। কন্যায়াংত্বন্নিদেশতঃ।।

'সুমতি'-র অর্থ 'সুবুদ্ধিসম্পন্না'। যার আরবী অনুবাদ 'আমেনা'। আর হজরত মুহাম্মদের মায়ের নাম ছিল আমেনা।

৪। অন্তিম অবতারের জন্মস্থান সম্পর্কে কল্কি পুরাণে লেখা আছে, তিনি জন্ম গ্রহণ করবেন, 'শম্ভল' নামক স্থানে।

শম্ভলে বিষ্ণুযশসো গৃহে প্রদুর্ভবাম্যহম।

‘শম্ভল’ শব্দের অর্থ ‘শান্তির স্থান’। যার আরবী অনুবাদ ‘বালাদুল আমিন’। আর মক্কার আরেক নাম হলো, বালাদুল আমিন। আর হজরত মহম্মদ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

৫। অন্তিম অবতার ‘মাধব মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করবেন।

দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবঃ।

মাধব অর্থ বৈশাখ মাস, বিক্রমী ক্যালেন্ডার মতে বৈশাখকে বসন্তের মাস বলা হয় যার আরবী অর্থ ‘রবি’।

শুক্ল পক্ষ, অর্থাৎ ‘প্রথম অংশ’ যার আরবী অনুবাদ ‘আউওয়াল’। একত্রে হল ‘রবিউল আউওয়াল’ দ্বাদশ তারিখ অর্থাৎ ১২ তারিখ।

হজরত মহম্মদ ‘রবিউল আউওয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।

এরকম আরো ব্যাখ্যা আছে। আবার আরেকটা বইও পড়েছিলাম, যেখানে যিশুখ্রিস্টকে কল্কি অবতার বলা হয়েছে। আসলে হিন্দু ধর্ম হল সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম, তাই পরবর্তীকালে নানা ধর্ম থেকেই তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন বুদ্ধকেও অনেকে নবম অবতার বলেন।”

প্রিয়ম একটানা বলে একটু দম নিল। তারপর বলল, ”তবে নিজেদের যারা এইরকম অবতার টাইপ ভেবে অবসেশানে ভোগে, তারা একরকমের মানসিক রোগগ্রস্থ। তাই তোমাদের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাধানাথ রায়কে আটকানো। এই জাতীয় লোকেরা যখন তখন ভয়ংকর কিছু করে ফেলতে পারে।”

রুদ্র এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল। বিষ্ণুযশা, সুমতী, শম্ভল, সবকিছু মাথায় গেঁথে নিচ্ছিল। বহুকাল আগে ও কল্কি অবতার সম্পর্কে পড়েছিল, এখন আর অত বিশদ মনে নেই।

”আমার মনে হয়, স্যারের মামা ওই গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্যই ছোট থেকে স্যারের এই মগজ ধোলাইটা করেছিলেন। আর এই কারণেই কানু চক্রবর্তী মাঝপথে ফিরে এসেছিল বদনপুরে।” রুদ্র ফোনটা বন্ধ করে এগিয়ে গেল।

সকলে নৌকোয় একে একে উঠছে।

নৌকোয় উঠে মাঝি দাঁড় টানা শুরু করতে করতে আরও পাঁচ মিনিট চলে গেল। এই নিস্তব্ধ রাতে কেউ কোন কথা বলছে না, নিশ্চল প্রেতমূর্তির মতো বসে রয়েছে নৌকোর ওপর।

রুদ্র ছটফট করছিল অজানা এক অস্থিরতায়। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, কল্কি, আমীশ, লক্ষ লক্ষ ভাবনার জাল যেন কিলবিল করছিল, জটলা পাকাচ্ছিল ওর মনের মধ্যে। মনে হচ্ছিল, এত বছর ধরে যে ভয়ংকর উদ্দেশ্যে রাধানাথ রায় গড়ে তুলেছেন ওই আমীশ সমাজ, তা কি এত সহজে বন্ধ করা যাবে?

যদি না করা যায়? যদি এর মধ্যেই মায়াপুর মন্দিরের হাজার হাজার ভক্ত খেয়ে থাকেন ওই মহাভোগ?

রুদ্র ঘড়িতে সময় দেখল। বারোটা বাজতে ঠিক পনেরো মিনিট বাকি। পাক্কা বারোটায় পরিবেশিত হবে মহাভোগ।

কী হচ্ছে ওদিকে?

---

১ (ঋগ্বেদ ১/১৮/৯)

২ কল্কিপুরাণ, ১১/২/১

৫৪

প্রিয়াঙ্কা পাগলের মতো ছুটছিল। ও এতক্ষণ ছিল প্রধান মন্দিরের দিকে।

সেখানে জন্মাষ্টমীর অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান মহা অভিষেক চলছিল। মন্দিরের প্রধান সন্ন্যাসীরা সকলে মিলে নিষ্ঠাভরে আরতি করছিলেন রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিকে। হাজার হাজার অনুরাগী সেই পবিত্র দৃশ্য দেখতে ভিড় করে ছিল সেখানে। হরেকৃষ্ণ-র উচ্চৈঃস্বরে গান আর কলরোলে ওর ফোন বেজে বেজে কেটে যাচ্ছিল, ও টেরই পায়নি।

সেই ভিড়ের মধ্যে সুষ্ঠু পরিচালনা করতে করতে যখন ক্লান্ত, তখন প্রিয়াঙ্কা হঠাৎই দেখতে পেয়েছিল, লোকেশবাবু ভিড় ঠেলে ওর কাছে আসার চেষ্টা করছেন আপ্রাণ। কিন্তু সাধারণ পোশাকের লোকেশবাবুকে কিছুতেই আসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। ভিড়ের মধ্যে তিনি হারিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত।

প্রিয়াঙ্কা নিজেই তখন বেরিয়ে এসেছিল। আর তারপর লোকেশবাবুর মুখে সব শোনামাত্র এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে এসেছিল সেখান থেকে।

ঘড়িতে এখন রাত বারোটা বাজতে ঠিক দশ মিনিট বাকি। প্রিয়াঙ্কার বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে। আর আফশোসে নিজের ওপর রাগে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় মারতে ইচ্ছে হচ্ছে।

একঘণ্টা আগেও যখন সেই অচ্যুত বলে এগারো বারো বছরের বাচ্চা ছেলেটা ওকে নিয়ে যাচ্ছিল রন্ধনশালার দিকে, ও ধারণাও করতে পারেনি ছেলেটা আসলে কী বলতে চেয়েছিল! অথচ একটু চিন্তা করলেই ও বুঝতে পারত।

ছেলেটা তখন হাসিমুখে ধীরপায়ে হাঁটছিল। প্রিয়াংকাও একটু তফাত রেখে পেছন পেছন চলেছিল। ছেলেটা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার বলল, "আজ রাতটার পর এই গ্রামটা পুরো পালটে যাবে, জানো!"

"পালটে যাবে মানে?" প্রিয়াঙ্কা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল। ছেলেটা এই মন্দির ক্যাম্পাসটাকে গ্রাম বলছে কেন? এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে এই ছেলেটা বাংলার ওই আমীশ সমাজের একজন। তার মানে এর মতো আরো অনেক আমীশ সমাজের মানুষ এই ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে সকলের অলক্ষ্যে।

ছেলেটা আর কিছু বলেনি, খুব সন্তর্পণে হেঁটে চলেছিল। হাঁটতে হাঁটতে একসময় ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিল, "আমি যাই। কেমন?"

"কোথায় যাবে তুমি?" প্রিয়াঙ্কা দেখেছিল, ওরা উপস্থিত হয়েছে মন্দিরের ভাঁড়ারঘরের পেছনদিকে। ভোগ রান্নার বিশাল আয়োজন চলছে ভেতরে।

ভেসে আসছে সুগন্ধ। রান্নাঘরের পেছনদিকের এই দরজার বাইরে এদিক ওদিক ফেলে রাখা হয়েছে প্রকাণ্ড আকারের সব কড়াই, হাতা, খুন্তি।

ছেলেটা আরও কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওই দরজা দিয়ে একটা লোককে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখেই ও ফ্যাকাশে মুখে দ্রুত পায়ে ঢুকে গিয়েছিল ভেতরে।

ওহ, প্রিয়াঙ্কা যদি তখন একবারও আন্দাজ করতে পারত যে আসল ব্যাপার লুকিয়ে রয়েছে ওই রান্নাঘরেই!

একদিকে মহা অভিষেক, অন্যদিকে মহাভোগ বিতরণ, এই দুই কারণে মন্দির চত্বর এখন প্রায় ফাঁকা।

প্রিয়াঙ্কা মোবাইলে নদীয়া টাস্ক ফোর্সের একজন অফিসারকে সংক্ষেপে পুরোটা জানাতে জানাতে পৌঁছল ভোজনশালায়।

একজন তরুণ সাধক বাইরে দাঁড়িয়ে তদারক করছিলেন। ও বলল, "ব্যাচ কি শুরু হয়ে গিয়েছে?"

সাধক মিষ্টি হাসলেন। দু'হাত জড়ো করে বললেন, "দুঃখিত, প্রথম ব্যাচে আর একটিও আসন নেই। আপনাকে দ্বিতীয় ব্যাচের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। হরেকৃষ্ণ।"

সাধক সরে যাওয়া মাত্র প্রিয়াঙ্কা দেখতে পেল, বিশাল বড় একটা হলঘর। একটা ছোটোখাট ফুটবল খেলার মাঠ ঢুকে যেতে পারে তার মধ্যে। সেই ঘরে সার সার দিয়ে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা। লম্বা শতরঞ্জি পেতে সেখানে বসানো হয়েছে মানুষদের।

কতজন হবে? প্রিয়াঙ্কা চোখ সরু করে দেখতে লাগল। অন্তত এক হাজার জন তো হবেই। সকলে বসে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছেন আর প্রতীক্ষা করছেন মহাভোগের।

এই তরুণ সাধকের মতো আরও অনেক সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াচ্ছেন গোটা ঘরে। এরা সবাই মন্দিরের নিজস্ব স্বয়ংসেবক। ভক্তরা তো দূর, এঁরাও কল্পনা করতে পারছেন না, এই ভোগবিতরণের পর কী হতে চলেছে।

ইতিমধ্যে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে নদীয়া টাস্ক ফোর্সের বেশ কিছু পুলিশ। প্রত্যেকে সিভিল পোশাকে। প্রিয়াঙ্কা বলল, "এই খাবার পরিবেশন বন্ধ করতে হবে। এখুনি।"

"কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব?" একজন বললেন, "মায়াপুর মন্দিরের মহাপ্রসাদ বলে কথা। আমরা এমন দুমদাম বন্ধ করতে পারি না। অর্ডার লাগবে।"

প্রিয়াঙ্কা চিনতে পারল। ভদ্রলোক নদীয়া পুলিশের একজন অফিসার। ও বলল, "আমাদের কমিশনার কথা বলছেন আপনাদের হায়ার অথরিটির সঙ্গে। অর্ডার চলে আসবে। কিন্তু সেইজন্য দেরি করা যায় না। খাবারে বিষ আছে।"

"অ্যাঁ! সেকি!" ভদ্রলোকের মুখের অভিব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল।

"হ্যাঁ। আমাদের যেভাবে হোক, খাবার পরিবেশন আটকাতেই হবে।"

"আমি এখুনি আমাদের স্যারকে এই মন্দিরের প্রধানকে ফোন করতে বলছি।" ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন।

প্রিয়াঙ্কা ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে ঠিক আর তিন মিনিট বাকি।

খাবারে যদি বিষ সত্যিই থেকে থাকে, সেটা কোন খাবারে? বিষক্রিয়া শুরু হতে কতক্ষণ সময় লাগবে? দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যাচ যখন খাবে, তখনই যদি প্রথম ব্যাচের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে? সেই ঝুঁকি কি ওই বাগডাঙা সরলাশ্রমের লোকেরা নেবে?

৫৫

রুদ্রদের নৌকো যখন ভেসে চলেছে নদীতে, তখন আবার ফোন করলেন রাধানাথ স্যার। সেই একই স্পুফ করা নম্বর।

রুদ্র ফোনটা রিসিভ করেই বলল, "আপনার জন্মদিন কি ১২ই বৈশাখ?"

রাধানাথ স্যার একটু চুপ করে থেকে শ্লেষজড়িত স্বরে বললেন, "কল্কিপুরাণ পড়েছ তাহলে? যাক! কোনো প্রলয় যখন পৃথিবীতে নেমে আসে, তখন তা সকলের বোঝার ক্ষমতা হয় না। আর কেউ কেউ বুঝলেও তা বিশ্বাস করতে চায়না। তুমি হচ্ছ দ্বিতীয় গোত্রের।"

রুদ্র উত্তর না দিয়ে বলল, "কলিযুগ যে শেষ হতে চলেছে, সেটা আপনি কী করে বুঝলেন স্যার?"

রাধানাথ স্যার আবার বললেন, "কলিযুগের যে শেষ উপস্থিত হয়েছে, তা তোমরা কি বুঝেও বুঝছ না? না বোঝার চেষ্টা করছ না? আমার পূর্বপুরুষ জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন নিজেও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার। কিন্তু তোমাদের মতো লোকদের জন্য একশো বারো বছর বেঁচে থেকেও তিনি উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেননি।"

"জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নিজেকে কল্কি অবতার ভেবে সবকিছু ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, এই আজগুবি কথা আপনার মাথায় কে ঢুকিয়েছে? আপনার মামা গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য? যিনি নিজেই সম্পর্কে ওই বংশের পাতানো বংশধর ছিলেন?" রুদ্র মিহি গলায় কেটে কেটে বলল।

"চুপ করো।" আহত সিংহের মতো ফুঁসে উঠলেন রাধানাথ রায়, "যাকে চেনো না, যাকে জানো না, যার নখের যোগ্য তোমরা কেউ নও, তাঁর সম্পর্কে কথা বলার সাহস হয় কি করে?"

রুদ্র বলল, "বেশ। আমরা না হয় চিনি না। কিন্তু আপনি তো একদিকে যেমন তর্কপঞ্চাননের উত্তরসূরি, তেমনই অন্যদিকে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরও উত্তরসূরি। একজন কৃষ্ণভক্ত, অন্যজন শাক্ত।"

"তাতে কী?"

"তাতে এটাই যে, আমার তো মনে হচ্ছে, তর্কপঞ্চানন নয়, আপনার স্বভাবপ্রকৃতি একেবারেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতো। আপনি কি জানেন না যে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাদ ছিল? এবং সেই বিবাদের অন্যতম কারণ ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রক্ষণশীলতা এবং তর্কপঞ্চাননের উদারমনস্কতা? কৃষ্ণচন্দ্র নারীপ্রগতির বিপক্ষে ছিলেন। যে কারণে ঢাকার রাজবল্লভ সেন চেয়েও তাঁর বাচ্চা মেয়ের পুনর্বিবাহ দিতে পারেননি। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন পুরো সম্মতি দিলেও কৃষ্ণচন্দ্রের প্ররোচনায় গোটা

নবদ্বীপের পণ্ডিতকুল রে রে করে উঠেছিল। সেই একই কাজ আপনিও করে চলেছেন। তাও আবার এই একবিংশ শতাব্দীতে। যেখানে সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েরা নিজেদের প্রমাণ করেছে। আপনার লজ্জা করছে না স্যার? যে ছেলেগুলো আপনার ওই নরককুণ্ড থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল, তাদের অবধি আপনি খুন করেছেন। তার ওপর নিজে আইনের একজন রক্ষক হয়ে ইচ্ছে করে ভুল দিকে মিসগাইড করেছেন আমাদের। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাটা একটা গুণ। সময়কে কখনো অস্বীকার করা যায়না। আর যারা তা করতে চায়, যারা ঘড়ির কাঁটাকে স্তব্ধ রেখে বাঁচতে চায়, তারা অসুস্থ, উন্মাদ।"

ফোনের ওপারে শুধুই নিস্তব্ধতা। রুদ্রদের নৌকো এখন প্রায় মাঝনদীতে। রুদ্র কান থেকে মোবাইলটা সরিয়ে চোখের সামনে আনল।

না। লাইন কেটে যায়নি।

রাধানাথ স্যার চুপ করে আছেন কেন?

ফোনটা কেটে গেল কিছুক্ষণ পর। নৌকো একই মৃদুমন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে জল কেটে। বেশ কিছুক্ষণ পর ও ফিসফিস করল, "জয়ন্ত, একটা আলো দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম।" জয়ন্ত বলল, "আগুন জ্বলছে মনে হচ্ছে। এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না সেভাবে।"

"হ্যালো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স। সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান। মঞ্জিল, শুনতে পাচ্ছ?" ওসি আশুতোষ তরফদার তাঁর ওয়াকিটকিতে কথা বলছিলেন, "আমরা অলমোস্ট চলে এসেছি। তোমরা আর ঠিক দশ মিনিট পর ফার্ম হাউজের সামনের দিক থেকে এন্ট্রি নেবে। হ্যালো। হ্যালো।"

ফোনটা রেখে এদিকে তাকালেন আশুতোষ তরফদার, "ফার্ম হাউজের ওদিকটা তো দোগাছিয়া থানার আন্ডারে। ওদের ওসিকে বলে রাখলাম। অসুবিধা নেই। কমিশনারের অর্ডার সব জায়গাতেই এসে গেছে।"

রুদ্র সরু চোখে দেখছিল। ওদের নৌকো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে অদূরের সেই অঞ্চলের দিকে, যাতে এতকাল বাইরের কারুর পা পড়েনি। ইনফর্মার মিন্টু বলছিল, ওরা ছোট থেকে জেনে এসেছে, চৌধুরীদেরই একটা বড় তালুক রয়েছে ওখানে। ব্যাস, ওইটুকুই।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর রাত। ম্লান চন্দ্রালোকে সত্যিই যেন দূরের আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে কিছু শব্দ। সেই শব্দ ভাল করে শুনলে বোঝা যায় শাঁখ ও কাঁসরঘণ্টার।

"কী হচ্ছে ওখানে?" জয়ন্ত উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়। নৌকো মুহূর্তে টলমল করে ওঠে।

দাঁড় টানতে থাকা মাঝি বলে ওঠে, "বাবু! এভাবে উঠে দাঁড়াবেন না। ছোট নৌকো। আমি একা দাঁড় বাইছি। টাল সামলাতে পারব না। এদিকটায় সরু হলেও গভীর আছে সরস্বতী। নোঙর করি, তারপর দাঁড়াবেন।"

জয়ন্ত অপ্রতিভমুখে বসে পড়ল।

রুদ্রর মনের মধ্যে ঝড় উঠছিল।

রাধানাথ স্যার কি এখানেই রয়েছেন?

৫৬

ক্ষমা একটা ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন দেখছিল। একটা উঁচু পাহাড়।

পাহাড় ও কোনোদিনও দেখেনি। কিন্তু মাসির বাড়িতে ছবি দেখত অনেক। মাসি আর মেসোর অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার ছবি।

প্রথম প্রথম ছবি দেখে ও ভয়ে আঁকড়ে ধরত মা'কে। মনে হত, কোন জীবিত মানুষের আত্মাকে ওইভাবে ভেতরে আটকে রাখা হয়েছে কোন তন্ত্রমন্ত্রবলে। মাসি তখন জোরে ধমক দিত।

সেই ছবির কিছু পাহাড় ছিল সাদা। মাসি বলেছিল সেগুলো বরফে ঢাকা। বরফও ও প্রথম মাসির বাড়িতেই দেখেছিল। সেই ঠান্ডা ঘরটার মধ্যে থরে থরে জমে থাকত। কী যেন বলতো সেই ঠান্ডা ঘরটাকে?

হ্যাঁ মনে পড়েছে। ফ্রিজ।

ক্ষমা এখন স্বপ্নতে যে পাহাড়টা দেখছে, তাতে কোনো বরফ নেই। একটা সবুজে ঢাকা পাহাড়। উঁচু-নীচু টিলা। লাল রঙের পথ, এদিক ওদিক কিছু গাছ ছড়ানো ছিটানো।

ক্ষমা আর চলতে পারছে না। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে, "আর পারব না গো মাসি, খুব কষ্ট হচ্ছে। ওই দ্যাখো, আমার মা বসে পড়েছে।"

মাসি তাড়া দিচ্ছে, "এইটুকুতেই হাঁপিয়ে গেলি? তোদের বয়সে আমরা কত ছোটাছুটি করতাম! আরেকটু চল। ওই যে, ওই দূরের লম্বা গাছটা ...!"

বলতে বলতে মাসি অনেকদূরে চলে যাচ্ছে ওর থেকে। ও ভয়চোখে দেখছে। ফুসফুসে অনেকটা বাতাস পূর্ণ করে নিয়ে আবার ছুটছে। চিৎকার করছে, "মাসিইইই! মাসিইইইইই! আমাকে ছেড়ে যেও না! আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে!"

মাসি যেন শুনতেই পাচ্ছে না ওর কথা। হাসতে হাসতে সরে যাচ্ছে আরও দূরে। ক্ষমা প্রাণপণ চেষ্টা করছে জোরে ছুটতে, কিন্তু পারছেনা। কারা যেন তাড়া করছে ওকে পেছনে!

ওর দম আটকে আসছে। মনে হচ্ছে, ওকে কি ওরা মেরে ফেলবে? মাসির থেকে ওকে ওরা জোর করে নিয়ে এল কেন? ওখানে ও কত ভালো ছিল। মেসোর কাছে লেখাপড়া শিখত ঘুরত, বেড়াত।

"ক্ষমা! আর দেরি করিস না! ওঠ শিগগীর!"

হ্যাঁচকা টানে ক্ষমার স্বপ্নটা ছিঁড়ে যায়। দেখে দ্বারিকাদাদা ওকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। ওর হাত আর পা শক্ত করে বেঁধে রাখা ছিল যে দড়ি দিয়ে, সেগুলোকে একটা দা দিয়ে ছিঁড়ছে ক্ষিপ্রগতিতে।

এটা কোথায় শুয়ে রয়েছে ও? চোখ জ্বালা করছে ধোঁয়ায়। ক্ষমা চারপাশে তাকিয়ে চিনতে পারে শ্মশানটাকে। ওদের সেই বৈদিক সমাজের শ্মশান। যেখানে এর আগে একবারই নিয়ে আসা হয়েছিল ওকে।

ওর বর মারা যাওয়ার পর।

দ্বারিকা ব্যগ্রভাবে বলে, "চল ক্ষমা। দেরি করিস না। ওরা তোকে পুড়িয়ে মারবে।"

"কারা?" সাদা চোখে তাকায় ক্ষমা।

দ্বারিকা বলে, "কারা আবার, কেষ্টহরি ঘোষালের ছেলেরা। তোর ভাশুরপো'রা। বুঝতে পারছিস না? যারা তোর মা'কেও মেরেছে?"

"আমার মা'কে মেরে ফেলেছে?" ক্ষমার চোখদুটো কেঁপে উঠল, " কী করে জানলে?"

দ্বারিকা একটু থেমে বলল, "তোকে নিয়ে আসার পরের দিনই তো ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সব পাড়ায় গিয়ে গিয়ে বলছিল। তুই জানিস না?"

ক্ষমা একটা লম্বা হাই তোলে। বলে, "আমার খুব ঘুম পাচ্ছে!"

দ্বারিকা উদ্ভ্রান্তের মতো তাকায় ওদিকে। বৈদিক সমাজ আজ প্রায় পুরুষশূন্য। সকলেই চলে গিয়েছে মাহেন্দ্রমহোৎসবে নারায়ণী সেনা হয়ে। শুধু কেষ্টহরি ঘোষালের ছেলেদের ছোট দলটা রয়ে গিয়েছে। যারা আজ ক্ষমাকে এই শ্মশানে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে।

সহমরণের পবিত্র চিতা থেকে যে উঠে পালায়, সে নাকি মহাপাপিষ্ঠা, তার পাপের গোটা পরিবার নাকি কলুষিত হয়। এত বড় পাপীর বেঁচে থাকা মানে দিনদিন সেই পাপের বোঝা ভারী করা। তাই আজ এই মাহেন্দ্র মহোৎসবের শুভলগ্নেই ক্ষমাকে মেরে ফেলা হবে। ওকে সিদ্ধি জাতীয় কিছু পাতার রস বেঁটে খাইয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। ক্ষমা তাই থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়ছে।

দ্বারিকা ছটফটিয়ে উঠল। এখানে আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। নারায়ণী সেনাদের নিয়ে যে নৌকোগুলো রওনা দিয়েছে, সেগুলো বোধহয় এতক্ষণে গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে। অনেক কৌশলে ও সরে পড়েছিল শ্মশান থেকে, গিয়ে লুকিয়েছিল বাগদিপাড়ায়।

শ্রীহরি কিছু বলে দেয়নি তো? ভাবতে ভাবতে দ্বারিকা টান দিল ক্ষমার হাত ধরে। মেয়েটা ঝিমোচ্ছে, প্রয়োজনে ওকে কাঁধে করে দ্বারিকাকে এখান থেকে পালাতে হবে।

কিন্তু ক্ষমা হঠাৎ স্পষ্টস্বরে বলল, আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।"

"যাবি না মানে?" দ্বারিকা বিস্মিতচোখে ফিসফিস করল, "ওরা তোকে মেরে ফেলবে। মেলা তর্ক না করে আমার সঙ্গে চল।"

"না।" দৃঢ় কণ্ঠে বলল ক্ষমা।

"কেন?"

"আমাকে বাঁচাতে গিয়ে এরমধ্যেই ব্রজেন্দ্রদাদাকে মরতে হয়েছে। আমার মা'ও মরে গিয়েছে। আমার জন্য তোমাকেও আমি মরতে দেব না, দ্বারিকাদাদা। তার চেয়ে আমার মরে যাওয়াই ভালো। সবার জ্বালা জুড়োবে।"

"বোকার মতো কথা বলিসনা ক্ষমা। আমি মরতে যাব কেন? আজ গোটা গ্রামে লোক বলতে গেলে নেই। ব্রজেন্দ্রদাদা'র মতো অবস্থা আমার হবে না। আমি আর তুই সাঁতরে

পার হয়ে যাব এই জরা নদী। একবার ওপারে উঠতে পারলেই ... ব্যস! আর কোনো চিন্তা নেই।" দ্বারিকার গলা উত্তেজনায় কাঁপছিল।

"তারপরেই বা কী হবে?" ক্ষমার গলা ধরে এল, "সেই তো বিধবার জীবনযাপন, সংসারের এঁটোকাঁটা খেয়ে এক কোণে পড়ে থাকা। সে'ও তো মরাই। তার চেয়ে একবারে মরে যাওয়াই তো ভালো, দ্বারিকাদাদা!"

৫৭

কৃষ্ণাষ্টমীর রাতে বৈদিক সমাজের আকাশ কেমন যেন থম মেরে রয়েছে। কালবৈশাখীর আগে যেমন সবদিক চুপচাপ হয়ে যায় তেমনই।

দ্বারিকা দৃপ্ত কণ্ঠে বলছিল, "তুই কি ভাবছিস, এই অন্যায় অবিচার দিনের পর দিন চলবে? দেশে কি আইন শৃঙ্খলা নেই? এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আধুনিক জগতের কাছে সব নোংরামি তুলে ধরব আমি, বের করে দেব ধর্মের নামে এইসব ভণ্ডামি!"

বলতে বলতে দ্বারিকা নিজেই যেন নিজের গলা চিনতে পারে না। মনে হয়, ও নয়, অচ্যুতই যেন কথা বলছে ওর মধ্য দিয়ে।

ক্ষমা বিহ্বলচোখে তাকায়, "সত্যি বলছ?"

"তা নয় তো কী?" দ্বারিকা হঠাৎ গ্রামের ভেতরদিকে মশাল দেখতে পায়, বেশ কয়েকটা মশাল দ্রুতগতিতে নিকটবর্তী হচ্ছে ক্রমশ।

"ওই ... ওই ওরা আসছে! আর দেরি করিস না ক্ষমা। শিগগীর আমার সঙ্গে আয়! ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে!"

ক্ষমা অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল, "তুমি ... তুমি আমাকে আমার মাসির কাছে নিয়ে যাবে গো দ্বারিকাদাদা? মাসির বাড়িতে বিশাল বড় বাগান। আমি অ থেকে ঔ শিখেছিলাম, জানো!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে যাব। একটু কষ্ট করে সাঁতরাবি, সেবারের মতো। তুই পারবি। পারতে তোকে হবেই।" দ্বারিকা আর দেরি করে না, ক্ষমার হাত শক্ত করে ধরে এগোতে থাকে ঘাটের দিকে।

শ্মশানের এঁটেল মাটি সকালের অপর্যাপ্ত বর্ষণে পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। মাথার ওপরে কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ। সেই ক্ষীণ আলোয় দ্বারিকা ক্ষমাকে নিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটছিল। নেশার ঘোরে ক্ষমা মাঝে মাঝেই এলিয়ে পড়ছিল, হাঁটু ভেঙে চাইছিল শুয়ে পড়তে। কিন্তু দ্বারিকা শক্তহাতে ওকে টেনে তুলে নিয়ে ছুটছিল।

শ্মশানে সেই অর্থে ঘাট কিছু নেই। পাড়ে এসে নৌকো থামে। দ্বারিকা ছুটতে ছুটতে একেবারে পাড়ে পৌঁছতেই হিমচোখে দেখল, কেষ্টহরি ঘোষালের লোকেরা পাড়ের সমান্তরালে উলটোদিক দিয়ে ছুটে আসছে।

দ্বারিকা বিভ্রান্ত হল না, ক্ষমার হাতে সজোরে টান মেরে ডানদিক বেঁকে ছুটতে লাগল কৈবর্তপাড়ার দিকে। সেদিকটা একেবারেই অন্ধকার। ঘেঁষাঘেঁষি করে পরপর ঘর, সেভাবে আলোও ঢোকে না। অন্ধকারে কোন কুঁড়েঘরের পেছনে লুকিয়ে পড়তে পারলে ওদের কেউ খুঁজে পাবে না। দ্বারিকা ক্ষমার হাত ধরে সেদিকেই ছুটতে লাগল।

"ওই ওদিকে যাচ্ছে। ধর ধর! ধর শিগগীর!"

"সঙ্গের ছোঁড়াটা কে? নষ্ট মাগীটার নাগর নাকি? হাতে পেলে হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেব!"

পেছনে হিংস্র উল্লাসে ধেয়ে আসছে উন্মত্ত কয়েকজন। যারা মানুষ হলেও ধর্মোন্মত্ততায় পরিণত হয়েছে শ্বাপদে। যাদের যুক্তি বুদ্ধি লোপ পেয়েছে বহুকাল আগেই।

পাড় থেকে কৈবর্তপাড়ার দিকে বেঁকার ঠিক আগের মুহূর্তেই ওদের একজন ধরে ফেলল ক্ষমার মাটিতে লুটোতে থাকা থানের একপ্রান্ত। তার কর্কশ টানে দ্বারিকার হাতের বাঁধন ছেড়ে মাটিতে সজোরে আছড়ে পড়ল ক্ষমা।

দ্বারিকা একটা ঝোপের আড়ালে লুকোতে গিয়েও পারল না, ওকে হিড়হিড় করে বাইরে টেনে আনল দুজন। চাঁদের মায়াবী আলোয় ও দেখল ক্ষমাকে দুপাশে দুজন চেপে ধরে নদীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষমার মুখে গুঁজে দেওয়া হয়েছে তারই কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো। ক্ষমার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে বাইরে। পা-দুটো ছটফট করছে প্রাণপণে।

ওরা কি ওইটুকু নিষ্পাপ মেয়েটাকে নদীতে ডুবিয়ে মারবে? কী দোষ মেয়েটার? স্বামীর মৃত্যুর পরেও সে বাঁচতে চেয়েছিল, সেটাই একমাত্র অপরাধ?

শ্মশান সংলগ্ন অরণ্য থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝি পোকার গুঞ্জন। দূরে জলের শব্দ হচ্ছে ছলাৎ ছলাৎ। দ্বারিকা শরীরের সব শক্তি একত্র করেও দুপাশে দাঁড়ানো কেষ্টহরি ঘোষালের লোকদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারছে না নিজেকে। তাদের একজনের হাতে চকচক করছে ধারালো ছোরা।

বিদ্যুৎ গতিতে যেন ঘটে যাচ্ছে সবকিছু। তার কানে আসছে ক্ষমার চাপা গোঙানি। মুখে কাপড় গোঁজা অবস্থায় শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আর্তনাদ করলে যেমন আওয়াজ হয়।

ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা দ্বারিকার মাথার পেছনদিকে ঝুলতে থাকা টিকিটা ধরে হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে টান দিল।

ব্যথায় দ্বারিকা ককিয়ে উঠতেই ওর বাঁ গালে এসে পড়ল থাপ্পড়।

"এত বড় সাহস তোর? আমাদের বাড়ির বউকে নিয়ে ভাগছিলি?"

ব্যথায় দ্বারিকা চোখে অন্ধকার দেখছিল। মনে হচ্ছিল, প্রচণ্ড সেই চপেটাঘাতে ওর মস্তিষ্কের শিরা ছিঁড়ে গেছে। এখুনি গলগল করে বেরিয়ে পড়বে রক্ত। তবু সেই অবস্থাতেও ও বলতে চেষ্টা করল, "ওইটুকু বাচ্চা মেয়ে আবার বউ কি? ওর জীবনটা তোমরা নষ্ট করছ!"

কথা শেষ হল না, ওর মুখে এসে পড়ল একটা ঘুষি। মুহূর্তে ওর জিভে এসে লাগল রক্তের গরম নোনতা স্বাদ।

বাঁ দিকের লোকটা ওর হাতটা মুচড়ে আরও একটা ঘুষি মারতে উদ্যত হল, কিন্তু নদীর পার থেকে ডাক এল, "ওই বিশু, এদিকে আয়! বাঁধা হয়ে গেছে। কলসিটা কোথায়, খুঁজে পাচ্ছি না।"

বিশু নামের লোকটা ডানদিকের লোকটার হাতে ছুরিটা দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে উঠে গেল। দ্বারিকার বুকের ভেতরটা কাঁপছিল। ক্ষমার হাত পা বেঁধেছে। এবার কি গলায় কলসী বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেবে?

ওর মুহূর্তের জন্য মনে পড়ে গেল ব্রজেন্দ্রদাদার সেই ভয়ংকর মুখটা। কালোপুকুরের একেবারে মাঝখানে বেঁধে রাখা হয়েছিল তাকে। জিভ ক্রমশ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল বাইরে। চোখ ঘোলাটে, মরা মানুষের মতো। গোটা সমাজ কাজে যেতে আসতে বিস্ফারিত চোখে দেখত ন্যাকড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসা তার গোঙানির অমানুষিক আর্তনাদ।

না। কিছুতেই আরেকটা তরতাজা প্রাণকে ও মরতে দেবে না।

মুহূর্তের মধ্যে সর্বশক্তি একত্র করে ডানদিকের লোকটার তলপেট লক্ষ্য করে সে চালাল এক লাথি। লোকটার হাতে ধরে থাকা ছুরিটা গিয়ে পড়ল সামনে। লোকটা প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে বসে পড়তেই দ্বারিকা ছুরিটা তুলে নিয়ে ছুট লাগাল সামনের দিকে।

ক্ষমাকে বাঁচাতেই হবে।

ওই তো, ওই তো ক্ষমার গলায় কলসী বাঁধছে ওরা। ডুবিয়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে নদীর জলে। মেয়েটা মুখে ন্যাকড়া গোঁজা অবস্থায় ছটফট করছে। হাত পা বাঁধা অবস্থায় ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে।

চারটে কালো কালো পাকা মাথা নিবিষ্ট মনে বুনছে হত্যার ষড়যন্ত্র। দ্বারিকা দিগবিদিকজ্ঞানশুন্য হয়ে ছুটে গেল। আহত বাঘের মতো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলোর ওপর। ওর হাতে ধরা ধারালো ধাতব ফলা দেখে সবাই একটু থমকে গেল।

দ্বারিকা আর ভাবল না। আজ ওর শরীরে যেন অচ্যুত ভর করেছে। ক্ষিপ্রগতিতে ও ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল নদীতে।

কিন্তু পারল না। কারণ তার আগেই ওর পিঠে কে যেন আমূল গেঁথে দিয়েছে একটা ধারালো ছোরা। প্রচণ্ড আঘাতে ওর শরীর কাঁপছে, বিবশ হয়ে আসছে মন, লুপ্ত হয়ে আসছে চেতনা!

তবু তারই মধ্যে ও দেখতে পেল, ডানদিকের বাঁক দিয়ে হঠাৎই পারে এসে পড়েছে একটা নৌকো।

সেখান থেকে ঝপাঝপ নামছে কিছু লোক।

কারা এরা? এদের পোশাক আশাক যে একেবারে অন্যরকমের!

হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে গর্জে উঠল একটা কানফাটানো শব্দ। সঙ্গে তীব্র আলোর ঝলকানি।

কেষ্টহরি ঘোষালের লোকেরা পালাচ্ছে দুরদারিয়ে।

দ্বারিকা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

তার আগেই ও জ্ঞান হারাল।

৫৮

সবেমাত্র ভোর হচ্ছে। সূর্যদেব অলস চোখে উঁকি দিচ্ছেন পূর্বদিকে। দূরের সবুজ ধানখেতের আলগুলোয় এখনো লেগে রয়েছে ভেজা শিশিরবিন্দু।

তবে এর মধ্যেই গোটা গ্রাম জেগে গিয়েছে।

খোশলাপুর গ্রামের 'শম্ভল ফার্ম হাউজ' এর প্রধান প্রবেশপথের বাইরে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। সেই জায়গার চারপাশে থিকথিক করছে কৌতূহলী গ্রামবাসীদের ভিড়। ছেলেবুড়ো, বাড়ির বউ, মেয়ে সবাই হাঁ করে দেখছে এদিকে।

দেখবে নাই বা কেন? ওদের এই নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে এত বড় ঢেউ আগে এসেছে নাকি কখনো? অন্তত কুড়িখানা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ফার্মহাউজের গেটের সামনে। তার মধ্যে দু-তিনটের মাথায় দপদপ করছে লাল-নীল আলো।

একটু আগে অবধিও দাঁড়িয়েছিল দুটো অ্যাম্বুলেন্স। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে সে দু'টো গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল। তারপর আবার বেরিয়ে এসে রওনা দিয়েছে শহরের দিকে।

গ্রামবাসীদের সামনে দিয়ে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে, কঠোর নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে গোটা এলাকা। পুলিশের গার্ডরা পাহারা দিচ্ছে সেখানে।

রুদ্র গেটের ভেতরে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতস্বরে কারুর সঙ্গে কথা বলছিল। ওর সারা শরীর ঘামে ভিজে সপসপ করছে। চুল উসকোখুসকো। পুলিশ উর্দির শার্ট এদিক ওদিক উঠে রয়েছে, কালো বুট কাদামাখা। প্যান্টের নীচের দিকেও কাদা শুকিয়ে শক্ত হয়ে লেগে রয়েছে।

মুখেচোখে রাতজাগা ক্লান্তির ছাপ।

"কমিশনার স্যার ছিলেন, একটু আগে বেরিয়ে গেলেন। আমাদের পুরো অপারেশন সাকসেসফুল ... না, খোঁজ চলছে ... ওকে!"

নৌকো করে বদনপুর থেকে এসে বাংলার এই গোপন আমীশ সমাজে ওরা যখন ঢুকেছিল, তখন ঘড়িতে রাত প্রায় বারোটা।

এখন বাজে ভোর পাঁচটা। এই সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা একটানা চলেছে ওদের অপারেশন।

সত্যি বলতে কি, ওদের নৌকোটা যখন নদীর বাঁক পেরিয়ে এপারে আসছিল, তখনই ওরা বুঝতে পেরেছিল ডাঙায় কিছু একটা চলছে। কিছু লোকের ধস্তাধস্তি, সঙ্গে একটা চাপা গোঙানি।

রুদ্র আর দেরি করেনি। ডাঙায় নামার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে দু'বার ফায়ার করেছিল। জয়ন্ত, আশুতোষ তরফদার ও অর্জুন গিয়ে উদ্ধার করেছিল রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকা ছেলেটাকে।

ছেলেটার তখনও সংজ্ঞা ছিল। ইশারায় বারবার দেখাচ্ছিল জলের দিকে।

ক্ষমাকে যখন নদী থেকে তুলে আনা হল, ততক্ষণে তার নাকমুখ দিয়ে অনেক জল ঢুকে গিয়েছে।

পুলিশের জোরালো টর্চলাইটে ক্ষমার চোখবোজা মুখটা দেখে বিস্ময়ে স্থবির হয়ে গিয়েছিল রুদ্র। পুলিশ উর্দিতে থেকেও ওর গলার কাছটা দলা পাকিয়ে উঠেছিল।

তবে বেশি ভাবার সময় ছিল না। দ্রুত গতিতে ওরা ঢুকে পড়েছিল গ্রামের মধ্যে।

আর তারপরের দু'ঘণ্টায় আবিষ্কার করেছিল এক সম্পূর্ণ আলাদা জগত। যে জগতের কোন অস্তিত্ব বাইরের পৃথিবীর জানা নেই।

শুভাশিসবাবু আমেরিকার আমীশ সম্প্রদায় প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ওরা নিজেরাই শস্য উৎপাদন করে, পশুপালন করে, বিনিময় প্রথায় জীবন নির্বাহ করে। অর্থনীতির সংজ্ঞা অনুযায়ী একেবারে প্রাইমারি বা অ্যাগ্রো ইকোনমিতেই ওরা আটকে রেখেছে নিজেদের। যে কোনো রকম পরিবর্তনকে ওরা মনে করে স্খলন।

রুদ্র অবাক বিস্ময়ে দেখেছিল কীভাবে সার সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাটির কুঁড়েঘর। কীভাবে সুপরিকল্পিতভাবে রয়েছে শস্যখেত, পুকুর, মন্দির। স্বনির্ভর অর্থনীতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলার এই আমীশ সমাজ।

ওরা একের পর এক বাড়িতে ঢুকেছে, নির্দয় সার্চ করে তোলপাড় করেছে, বেরিয়ে এসেছে। ততক্ষণে কমিশনার পাঠানো ফোর্স ফার্ম হাউজের সামনে দিয়ে এসে জঙ্গল টপকে ঢুকেছে এদিকে। পুরুষ, মহিলা, সবাইকে সার দিয়ে দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে এক খোলা মাঠে।

গোটা অপারেশন চলাকালীন একটা বড় মন্দিরের সামনে আবক্ষ এক মূর্তি দেখে অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে চিনতে ভুল হয়নি ওর।

কিন্তু কোথায় দণ্ডমুণ্ডকর্তা?

কোথায় রাধানাথ রায়?

জয়ন্ত এগিয়ে এল দ্রুত পায়ে, "ম্যাডাম, সদর হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল। ছেলেটা নিয়ে যাওয়ার আগেই কোল্যাপ্স করে গিয়েছে।"

"সেকি!" রুদ্র অবাক হয়ে যায়।

"হ্যাঁ। পিঠের ইনজুরিটা যে খুব ডিপ ছিল। বেচারা!" জয়ন্ত বলল।

রুদ্র কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না। কিছুক্ষণ পর রুদ্ধস্বরে বলে, "আর ক্ষমা?"

"ওর কন্ডিশন কিছুটা স্টেবল। ফুসফুসে অনেকটা জল ঢুকেছে। সে'সব পাম্প করে বের করা হচ্ছে।" জয়ন্ত বলল।

"ক্ষমাকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলেটা প্রাণ দিল!" রুদ্র অস্ফুটে বলল।

"হ্যাঁ। সেটাই মনে হচ্ছে।" জয়ন্ত বলল, "আচ্ছা, ওদিকের কোনো আপডেট পেলেন?"

রুদ্র বলল, "হ্যাঁ। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কথা হল। দুর্দান্তভাবে পুরো ম্যাটারটাকে বের করে এনেছে ও। নদীয়া পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে প্রায় দুশোজনকে। প্রত্যেকেই বাগডাঙা সরলাশ্রমের তরফ থেকে গিয়েছিল কিচেন ম্যানেজমেন্টের কাজে। মন্দিরের মহাপ্রসাদের স্যাম্পল ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। আমি হাড্রেড পার্সেন্ট শিওর, পয়জন মিলবেই।"

জয়ন্ত চিন্তিতভাবে বলল, "সবই তো হল। কিন্তু এস পি স্যার কোথায়? মায়াপুর মন্দির চত্বর, এই গোটা শম্ভল ফার্ম হাউজ, সব জায়গাই তো তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কেউই তো কোনো খোঁজ দিতে পারছেনা।"

রুদ্র চুপ করে রইল। জয়ন্তর কথায় কোনো ভুল নেই। বাগডাঙ্গা সরলাশ্রমের সেই ভর্তৃহরি মহারাজকেও কাল রাতে উদ্ধার করা হয়েছে এই ফার্ম হাউজের পূজামণ্ডপ থেকে। বালিগঞ্জ থেকে আটক করা হয়েছে মৃন্ময়ী টেক্সটাইলসের মালিক শেখর চৌধুরীকেও।

ওদিকে মায়াপুর মন্দিরে যাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের ছবি তুলে প্রতিটা থানায় সার্কুলেট করছে প্রিয়াঙ্কা। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশধর মধুময় ভট্টাচার্য এর মধ্যেই নির্ভুলভাবে শনাক্ত করেছেন ব্রিজেশ তেওয়ারির দোকানে কিছুদিন কাজ করে যাওয়া কানাইকে।

কমিশনার সুনীত বসু স্যার আরো উইটনেস জোগাড় করছেন। কেসে কোনো ফাঁক রাখতে চান না তিনি।

কিন্তু রাধানাথ রায় যেন উবে গিয়েছেন। স্যারের নিজস্ব নম্বর বা কাল রাতের সেই অচেনা নম্বর, কোনটাকেই ট্র্যাক করা যাচ্ছে না।

জয়ন্ত আরো কি বলতে যাচ্ছিল, রুদ্র অর্জুনকে দেখতে পেল। জঙ্গলের মাঝের একমাত্র শুঁড়িপথ দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে আসছে। ভেতরে গোটা কমিউনিটির লোকজনকে ভেতরে একটা বড় মাঠে দাঁড় করানো হয়েছে। চলছে পরপর ইন্টারোগেশন। মহিলার সংখ্যাই প্রায় নিরানব্বই শতাংশ। যাদের মধ্যে গরিষ্ঠভাগই কোনোদিনও বাইরের জগতটাকে দেখার সুযোগ পাননি। যারা এক অসুস্থ অনুশাসনের মধ্যে থাকতে থাকতে ভুলে গিয়েছেন স্বাধীন জীবনের মর্ম। রুদ্র কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও ওখানেই ছিল।

অর্জুন এদিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে একটা লোক। তার পরনে এই কমিউনিটির বাকিদের মতোই ধুতি ফতুয়া।

"ম্যাডাম, এর নাম বাসুদেব। যেবার আমি স্যারের পিছুপিছু এসেছিলাম, একেই দেখেছিলাম স্যারের পিছুপিছু ঘুরতে। তখন অবশ্য জামাপ্যান্ট পরে ছিল, এই ধুতি ফতুয়ার ভেক ধরেনি।" অর্জুন কথাটা বলেই লোকটার দিকে কড়া চোখে তাকাল, "এই বল, স্যার কোথায়?"

বাসুদেব লোকটা মধ্যবয়সি। মুখচোখে ভয়ের ছাপ। বলল, "আমি জানি না। আমি তো রাতের বেলাটা এই বাইরের দিকের ফার্মহাউজে থাকতাম, গুরুদেব আদৌ কাল এখানে ছিলেন কিনা, তাও জানি না!"

অর্জুন আবার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, রুদ্র ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "শেষ কবে গুরুদেবকে দেখেছ তুমি?"

বাসুদেব ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "আজ্ঞে, গতপরশু। যেদিন সবাই এখান থেকে মাহেন্দ্রমহোৎসবে গেল। সেদিনই গুরুদেব এসেছিলেন।"

অর্জুন ভ্রূ কুঁচকে কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, রুদ্র বলল, "উনি কোন দিক দিয়ে বেরিয়েছিলেন? নদীপথে না এদিক দিয়ে?"

"তা বলতে পারব না দিদি। আমি এদিকে ছিলাম।" বাসুদেব আড়ষ্ট গলায় বলল।

রাধানাথ স্যার রুদ্রকে আবার ফোন করলেন ঠিক দশ মিনিট পর। অর্জুন আর জয়ন্ত দুজনেই তখন চলে গিয়েছে গ্রামের ভেতরের দিকে।

"বলেছিলাম না রুদ্রাণী, কল্কি অবতারকে আটকানো অত সহজ নয়!"

রুদ্র চমকে এদিক ওদিক দেখল। রাধানাথ স্যার কি ওকে দেখতে পাচ্ছেন? এই ফার্ম হাউজের মধ্যেই কোথাও সবার অলক্ষ্যে বসে নজর রাখছেন ওদের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর?

কিন্তু তা কী করে হয়? এই ফার্ম হাউজ তো ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে চষে ফেলা হয়েছে এর মধ্যে!

"আটকেছি তো স্যার!" শান্ত গলায় রুদ্র বলল।

"সে তো সাময়িক। আজ পর্যন্ত কল্কিকে কেউ মারতে পারেনি। এমনি জরা, ব্যাধিও কাবু করতে পারেনি। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নিজে শতায়ু হওয়ার পর অন্তর্জলি যাত্রায় স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন। আমার আমার মামা প্রথম গুরু গোপালকৃষ্ণ মহারাজও অনশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আমি যদি বুঝি আমার কাজ ফুরিয়েছে, আমিও তাই করব।"

"আবারও ভুল করছেন স্যার! জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত ছিল সম্পূর্ণ আপনার বিপরীত। তিনি ছিলেন অনেক উদার। আর আপনাদের এই চক্রান্ত তো আমাদের ফোর্স পুরোপুরি ফাঁস করে দিয়েছে।"

"সে তো প্রথমে শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল জিতেছিল রাবণ। কিন্তু সেই কি অন্তিম পরিণতি? তোমার মতো এমন তুচ্ছ বাধা আসবে যাবে, মাঝেমধ্যেই মাথাচাড়া দেবে। তাই বলে কলিযুগের অবসানকে তো রোধ করা যায় না। পরম গুরু পারেননি, প্রথম গুরু পারেননি, আমি যদি নাও পারি, আমার পরিবর্তে আরেকজন কল্কি তৈরি হবে। সে না পারলে আর একজন। আটকাতে পারবে না। আমাদের বৈদিক সমাজের এই সংকল্প একদিন না একদিন, কোনো না কোনো মহোৎসবের দিনে সফল হবেই।"

রুদ্র চুপ করে গেল। যে জেগে ঘুমোয়, তাকে নতুন করে জাগানো যায় না। রাধানাথ স্যারের যুক্তিবুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন।

ও ইশারায় অর্জুনকে দ্রুত নম্বরটা লিখতে বলল। কিন্তু তার আগেই রাধানাথ স্যার বললেন, "কাল রাতেই তো বললাম, এই নম্বর ট্র্যাক করে কোনো সুবিধা করতে পারবে না। ক্রিপ্টেড সার্ভার দিয়ে স্পুফ করা এই কল। অত কাঁচা কাজ রাধানাথ রায় করে না। এবার বানচাল করেছ তো কী হয়েছে, ফিরে আমি আসবই। অশুভশক্তির পরাজয় ঘটবেই।"

"অশুভ শক্তি কে স্যার?" রুদ্র বলল, "আপনি কি আদৌ ভেবে দেখেছেন? নাকি মামার মগজ ধোলাইতে পরিণত হয়েছেন আজ্ঞাবহ রোবটে? আপনার লজিক অনুযায়ীও

যদি ভাবি, সত্য যুগে লড়াই ছিল দেবতা ও অসুরদের মধ্যে। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। একটা দেবলোক, অন্যটা পাতাললোক। পাতাললোক ছিল অশুভশক্তি।"

"তো? অশুভশক্তি অসুরেরা তো পরাজিত হয়েছিল দেবতাদের কাছে!"

"ত্রেতা যুগে এলেন শ্রীরামচন্দ্র। লড়াই তখন দুই ভূখণ্ডের মধ্যে। ভারত ও লঙ্কা অর্থাৎ সিংহল। সেখানে আপনার কথা অনুযায়ী অশুভশক্তি লঙ্কারাজ রাবণ।"

"এখানেও তাই রাবণ হেরে গিয়েছিল।"

"দাঁড়ান স্যার, বলতে দিন। তারপর দ্বাপর যুগ। মহাভারতে আমরা দেখলাম একই পরিবারের দুই জ্ঞাতির মধ্যে যুদ্ধ। কৌরব বনাম পাণ্ডব। অশুভ শক্তি কৌরব। আর এখন কলি যুগ। শুভ-অশুভ গণ্ডি আরো সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এখানে তো মানুষের মধ্যেই শুভ অশুভ লুকিয়ে আছে স্যার। আমরা প্রত্যেকে দ্বৈত সত্তার অধিকারী। শুভ সত্তাটা বলে মানুষকে ভালোবাসতে, দয়া, মায়ামমত্বে সম্পৃক্ত হতে। অন্যদিকে অশুভ সত্ত্বা মাঝেমাঝেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তখন হিংসা, রাগ, পরশ্রীকাতরতা আমাদের অন্ধ করে দেয়!"

রুদ্র একটা লম্বা দম নিল। বলল, "আপনি যদি সত্যিই বিষ্ণুর দশম অবতার হতেন স্যার, আপনি বুঝতে পারতেন, কলি যুগে কেউ কারুর শত্রু নয়। প্রত্যেকের শত্রু তার ভেতরের এই অশুভ দিক। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই প্রতিটা যুগে অশুভ শক্তি অনেক বেশি ক্ষমতাধর হয়েও হার মেনেছে শুভ শক্তির কাছে। কলিযুগে কেন তা হবে না স্যার? কেন আমাদের ভেতরের হিংসা, সংকীর্ণতা হেরে যাবে না ভালোবাসার কাছে? বিশ্বাস করুন স্যার, এর সঙ্গে সমাজের রক্ষণশীলতা, মেয়েদের পরাধীন থাকা, বা ঈশ্বরসাধনার কোনো সম্পর্ক নেই!"

ফোনটা হঠাৎ কেটে গেল সশব্দে। রুদ্রর গলাটা ধরে এসেছিল। কয়েকজন মানুষের ভুল মানসিকতার জন্য শিবনাথ বিশ্বাসের মেয়েটা কোনোদিনও ওর বাবার সঙ্গ পেল না। কিছুজনের ধর্মীয় সংকীর্ণতার জন্য মহম্মদ তারেকের বউ আমিনা বিয়ের পরই তার স্বামীকে হারাল। কয়েকজনের অন্ধ বিশ্বাসের জন্য ক্ষমার মতো মেয়েরা জীবনের মানেটাই বুঝতে পারল না। মল্লিকাদি'র মতো কয়েকজন মানুষ ঝরে গেল নীরবে।

পুলিশে জয়েন করেও নিজের আবেগ পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে এখনো ততটা পেশাদার হয়ে উঠতে পারেনি রুদ্র। এইঘটনাগুলো ওকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয়। ভেতরে ভেতরে ভেঙে দেয়।

"ম্যাডাম! স্যার এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

জয়ন্তর ডাকে চমকে পেছন ফিরল রুদ্র।

জয়ন্তর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিয়ম। মুখচোখ উদ্বিগ্ন।

"তুমি! তুমি কী করে এলে এখানে?" রুদ্র চোখের জল মুছে এগিয়ে গেল প্রিয়মের দিকে।

প্রিয়ম বলল, "কাল রাতের পর তো তোমার আর কোনো খবর পাচ্ছিলাম না, ফোনেও পাচ্ছি না। টেনশনে সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। তারপর ভোরের দিকে জয়ন্তকে ফোনে পেলাম। তারপর ওর থেকে ডিরেকশন নিয়ে নিয়ে বাইকে চলে এলাম। তুমি ঠিক আছ তো?"

"হ্যাঁ।" রুদ্র বলল, প্রিয়ম তুমি জানো, ক্ষমা ...!"

"শুনেছি।" প্রিয়ম মাথা নাড়ল, "তোমাদের আরেকটু দেরি হলে ...!"

"ছোট থেকে কানু চক্রবর্তী আর চৌধুরীবাড়ির শঙ্কর ছিল হরিহর আত্মা। বড় ভালোবাসত কানু তার বন্ধুকে। দুজনে যখন বাড়ি ছেড়ে পালাল, সুগন্ধা মামার কথামত শঙ্কর নাম পালটে 'রাধানাথ' হয়ে ভরতি হল মায়াপুরের স্কুলে।

"কানু যত বড় হতে লাগল, রাধানাথের প্রতি এক অদ্ভুত অধিকারবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল ওকে। এক কিশোরবেলার অভিমানী প্রেমিকের মতোই ও আগলে রাখতে লাগল রাধানাথকে। মামা গোপালকৃষ্ণ ও তাঁর অনুরাগী গোপাল ব্যানার্জি বা এদের কথায় রাধানাথ যখন একটু একটু করে পালটে যাচ্ছে, সরে আসতে চাইছে মায়াপুরের অহিংস বৈষ্ণব মত থেকে, আলাদা করে গড়ে তুলতে চাইছে এক বাহিনী, তখন অনেক বারণ করেছে কানু। প্রথমে অনুনয় বিনয়, তারপর তিরস্কার।

"রাধানাথ শোনেনি। ছোট থেকেই সে যেমন মেধাবী, তেমনই একগুঁয়ে। বন্ধুর সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেছিল ও।

"প্রাণের প্রিয়বন্ধুর থেকে ক্রমাগত দুর্ব্যবহারে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে কানু একসময় পালিয়ে আসে সেখান থেকে। চলে আসে নিজের গ্রাম বদনপুরে। নিজের কৃষ্ণভক্তি ত্যাগ করে সে আবার ফিরে গেল শক্তির উপাসনায়। কিন্তু চাইলেও রাধার প্রতি তার ভালোবাসাকে সে মুছে ফেলতে পার লনা। এই ভালোবাসা কি শুধুই বন্ধুত্ব না কোন বিশেষ আকর্ষণ, আমি জানি না! শত প্রতিকূলতাতেও 'রাধা'র প্রতি ভালোবাসায় ভাঁটা পড়েনি তার। আর এই ভালোবাসাকেই হাতিয়ার করে দিনের পর দিন রাধানাথ রায় বন্ধুর মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। ওর বৈদিক সমাজের একেবারে উলটোদিকে হওয়ায় কখনো কখনো কেউ পালিয়ে বদনপুর চলে গেলেও জোর করে আবার ফেরত আনিয়েছেন তাকে। তবে, অচ্যুত বলে ছেলেটাকে ফেরত আনার সময় কানু চক্রবর্তী বাধা দেয় সম্ভবত নিজেও বছরের পর বছর সব জেনেশুনে আর মেনে নিতে পারছিল না। সে বাধা দেওয়ায় তাকে আক্রমণ করে রাধানাথ রায়ের লোকেরা।"

রুদ্র একটানা বলে থামল।

"এটা কি কানু চক্রবর্তীর স্টেটমেন্ট?" কমিশনার সুনীত বসু জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ। রাধানাথ রায়ের পালিয়ে যাওয়ার খবর শুনে নিজেই সে সব বলেছে থানার ওসিকে।" রুদ্র বলল।

শম্ভল ফার্ম হাউজ দ্রুত সিল করা হচ্ছে। একেবারে বাইরের দিকে চেয়ার পেতে বসে রয়েছে ওরা। দুপুর পেরিয়ে রোদ পড়ে এসেছে। সারাদিন আজ এখানেই কেটেছে সবার। প্রিয়াঙ্কা, লোকেশ ব্যানার্জি ও বীরেন শিকদারও মায়াপুর থেকে এসে পৌঁছেছেন একটু আগে।

দূরে পুলিশের হোমগার্ডরা দ্রুততার সঙ্গে জঙ্গল কেটে একটা চওড়া পথ তৈরি করছে, যা দিয়ে যাওয়া যাবে ওপাশে বাংলার নিষিদ্ধ আমীশ সমাজে। কাজ প্রায় শেষের দিকে।

কমিশনার বললেন, "শেখর চৌধুরীও মোটামুটি একই কথা বলেছেন। ভাই বহুবছর নিখোঁজ থাকার পর ফিরে এলে তিনি তাকে ফেরাতে পারেননি। বাইরে ভাইয়ের কোন

অস্তিত্বই স্বীকার করতেন না। দেখাতেন, কোনো যোগাযোগ নেই। কেউ সেভাবে জানতও না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতেন ভাইকে।”

প্রিয়াঙ্কা বলল, স্যার, যে ছেলেটা আমাকে হেল্প করল, সেই অচ্যুতকে কিন্তু আর খুঁজে পাইনি।”

”কেন সে কোথায় গেল?”

”জানি না স্যার।” প্রিয়াঙ্কা কাঁধ ঝাঁকাল, ”শ্রীহরি বলে একটা ওরই বয়সি ছেলে বলল, মহাভোগ বিতরণের আগেই গুরুদেব ওকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন।”

”রাধানাথ রায় যে ওই ঘটনার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও মায়াপুরে ছিলেন, তা আমি জানি। কিন্তু কোথায় গেলেন?”

প্রিয়াঙ্কা বলল, ”তা বলতে পারব না স্যার। তবে অচ্যুত ছিল ওদের চতুস্পাঠীর সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছাত্র।”

”তবে কি ওকেই রাধানাথ স্যার তৈরি করতে চান পরবর্তী কল্কি রূপে?” রুদ্র বলল।

”হতে পারে।” কমিশনার বললেন, ”আমাদের কাজ তাই এখানেই শেষ নয়। যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে রাধানাথ রায়কে।”

রুদ্র একটা নিশ্বাস ফেললো। তারপর বলল, ”স্যার, আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে।”

”কী, বলো।” কমিশনার বললেন, ”একজন প্রোবেশনার হয়ে তুমি যেভাবে পুরো ব্যাপারটাকে সামলেছ, উই আর এক্সট্রিমলি প্রাউড অফ ইউ! জেলাশাসক নিজেও বারবার নাম করছেন তোমার। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তোমায় পেয়ে গর্বিত, রুদ্রাণী। তুমি আর তোমার টিমের সবাইকে এইজন্য অ্যাওয়ার্ডেড করা হবে।”

”থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।” রুদ্র একবার প্রিয়মের দিকে তাকাল। প্রিয়ম আলতো ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিতে ও বলল, ”স্যার, ক্ষমা তো এখনো হাসপাতালে। ও সেরে উঠলে আমরা ওকে দত্তক নিতে চাই। অফিশিয়ালি।”

কমিশনার সুনীত বসু বললেন, ”কিন্তু তা কী করে পসিবল? গোটা কমিউনিটির সবাইকেই তো এখন পুরো কেস চলার সময় বারবার কাজে লাগবে।”

”লাগুক না স্যার।” রুদ্র বলল, ”তদন্তের প্রয়োজনে যতবার ডাকা হবে, ও নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু এমনিতে ও আমার কাছেই না হয় থাকুক। ওর মা নেই। আমি ওকে আমাদের মতো করে বড় করে তুলব।”

”বেশ। আমি চেষ্টা করব। ডি এম কী বলেন দেখি!”

আনন্দে ঝলমল করে উঠল রুদ্রর মুখ।

লম্বা লম্বা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে পড়ন্ত সূর্যের আলো। সেই নরম আলোর ওম ভিজিয়ে দিচ্ছে ওকে। ধুয়ে দিচ্ছে গত কয়েকদিনের অত্যধিক পরিশ্রম।

যখনই ভাবছে, ক্ষমা আবার একটা উচ্ছল প্রজাপতির মতো খেলে বেড়াবে বাংলোর বাগানে, আনন্দে নেচে উঠছে ওর মন।

মুখে হাসি, চোখে জল নিয়ে রুদ্র প্রিয়মের হাতের ওপর হাত রাখল। অস্ফুটে বলল, ”ওর একটা নতুন নাম হবে। অজেয়া। কেমন?”

* * *

লেখকের নাতিদীর্ঘ কৈফিয়ত

প্রায় দুই বছর পর আত্মপ্রকাশ করল রুদ্রাণী প্রিয়ম সিরিজের নতুন উপন্যাস। বলতে দ্বিধা নেই, ২০১৬ সালের প্রথম দিকে ভুটানের প্রেক্ষাপটে 'ঈশ্বর যখন বন্দী' উপন্যাসে যখন প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম রুদ্রাণী ও প্রিয়মকে, তখনও ভাবিনি তারা এত বিপুলভাবে পাঠক মহলে গৃহীত হবে। 'ঈশ্বর যখন বন্দি' আমার লেখা শুধু প্রথম উপন্যাস নয়, পরিণত বয়সের সর্বপ্রথম সাহিত্যকর্ম। সাধারণত বাংলা সাহিত্যে লেখকরা প্রথমে কিছুদিন ছোটগল্প লিখে হাত মকসো করেন, তারপর রয়েসয়ে শুরু করেন উপন্যাসের কাজ। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা কাকতালীয়ভাবেই সম্পূর্ণ বিপরীতগামী।

যাইহোক, 'ঈশ্বর যখন বন্দি' লেখার সময় ধারণা ছিল না যে, রুদ্র-প্রিয়মকে আবার এবং বারংবার ফিরিয়ে আনতে হবে। শুরু থেকে লেখার সময় একটা বিষয় মাথায় ছিল, 'গোয়েন্দা' বা 'থ্রিলার' নয়, ইতিহাস-বিজ্ঞানের মিশেলে নতুন স্বাদের 'অভিযান' বা অ্যাডভেঞ্চার লিখতে হবে। ব্যোমকেশ-ফেলুদা নস্ট্যালজিয়ার পর বাঙালি পাঠককে আর নতুন গোয়েন্দা চরিত্র উপহার দিয়ে লাভ নেই, আর পেশাদার গোয়েন্দাদের সীমাবদ্ধতা এখন কমবেশি সকলেরই জ্ঞাত। তাই গোয়েন্দা নয়, প্রথম থেকেই চেয়েছিলাম একজন সাধারণ মানুষের যুক্তি বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে টানটান গল্প বলতে। এবং সেইজন্য সচেতনভাবেই নির্বাচন করেছিলাম একজন নারীকে। এ'যাবত হাতেগোনা কিছু মহিলা গোয়েন্দা বাংলা সাহিত্য পেয়েছে বটে, কিন্তু এখন সমাজের অন্তর্নিহিত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণে, যতটা সমাদর তাদের প্রাপ্য ছিল, তা তারা পায়নি।

আমি পূর্বসূরীদের থেকে শিক্ষা নিয়েছি, তাই আরো একটা 'মেয়ে গোয়েন্দা' তৈরি করে সেই ঝুঁকি আর নিইনি। রুদ্রাণী গোয়েন্দা নয়, তার গল্পও কোন ডিটেকটিভ কাহিনী নয়। রুদ্র পাশের বাড়ির শিক্ষিত স্বাবলম্বী ন্যাকামিবর্জিত মেয়েটির মতই সাধারণ একটি তরুণী। এখনকার অধিকাংশ জুটির লিঙ্গসাম্যের ফর্মুলা মেনে, তার জীবনসঙ্গী প্রিয়ম 'স্বামী' কম, 'পার্টনার' বেশি। তাদের দুজনের চাকরির টানাপোড়েন, সাংসারিক ওঠানামার মাঝেই যখন রুদ্র মুখোমুখি হয় কোন সমস্যা, ভীরু 'সাতেপাঁচে না থাকা' নাগরিকের মত পাশ কাটিয়ে না গিয়ে সে মোকাবিলা করতে চায়। এটুকুই।

এই প্রাথমিক ভিত্তির ওপরেই লেখা হয়েছিল রুদ্র প্রিয়ম সিরিজের পরবর্তী দুই উপন্যাস 'নরক সংকেত' এবং 'অঘোরে ঘুমিয়ে শিব'। দুটোরই বিষয়বস্তু ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সংবেদনশীল প্রেক্ষাপটে আঁকা। গত সাড়ে তিন বছরে অন্যান্য লেখা নেহাত কম লিখিনি, কিন্তু রুদ্র প্রিয়ম সিরিজের অনুরাগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রমবর্ধমান। আমি হয়ত লিখতে না চাইলেও সিরিজের নতুন উপন্যাস নিয়ে তাঁদের দাবী আসতেই থাকে।

এদিকে সমস্যায় পড়েছি আমি। একেবারে আইন-অপরাধের বাইরের পেশায় সংযুক্ত থাকা একজন মানুষকে বারবার কোন সমস্যার মধ্যে যুক্তিসম্মতভাবে 'ইনভল করা' খুবই কঠিন ব্যাপার, এদিকে না লিখেও উপায় নেই। বইমেলা থেকে কর্মক্ষেত্র, এমনকি বিদেশেও যেখানে গিয়েছি সেখানেই সম্মুখীন হতে হয়েছে 'পরবর্তী রুদ্র-প্রিয়ম কবে আসছে' জাতীয় প্রশ্নের।

স্বয়ং স্যার আর্থার কোনান ডয়েল পাঠকের দাবীতে মৃত হোমসকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়ে ছিলেন, সেখানে আমি তো নগণ্য মাত্র! তাই কোন উপায়ান্তর না দেখে রুদ্রাণীকে এবার একটি শক্তপোক্ত এবং প্রাসঙ্গিক পেশায় নিযুক্ত করতে হল, যাতে সে অবলীলায় একটার পর একটা অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে। তার বয়স এখনো দুই দশক অতিক্রম করেনি, তাই পাঠক এই ধৃষ্টতা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, এই আশা রাখি।

আমেরিকার আমীশ সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ব্রাত্য। লক্ষাধিক মানুষ যে এই একবিংশ শতাব্দীতেও সম্পূর্ণভাবে আধুনিকতা বর্জন করে নিজেদের মধ্যে বিনিময় প্রথায় বসবাস করতে পারেন, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম এভাবেই চলতে থাকে, তা সত্যিই অভাবনীয়। ইন্টারনেট তো দূর, বিদ্যুৎ বা মোটরগাড়ি পর্যন্ত তাঁদের কাছে বর্জনীয়। সম্প্রদায়ের শিশু কিশোররা অবধি বড় হয়ে ধর্মীয় শিক্ষায়, বয়ঃসন্ধির পর আর থাকে না কোন বিদ্যালাভের সুযোগ।

আমীশ সম্প্রদায়কে নিয়ে একটা বড়সড় কাজ করার বাসনা বেশ কিছুদিন ধরেই পোষণ করছিলাম। বই, বিবিধ গবেষণাপত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ছাড়াও পরিকল্পনা ছিল তাঁদের সঙ্গে সশরীরে গিয়ে সাক্ষাতের। যদিও তাঁরা আধুনিক সমাজকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলেন, তবু একটি গোপন সূত্রে দেখা করার দারুণ সুযোগও উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ভিসা থেকে যোগাযোগ, সব আয়োজনের পরেও আকস্মিক পৃথিবীব্যাপী মহামারির প্রাদুর্ভাব তাতে জল ঢেলে দিল।

ইচ্ছা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে মানুষের কাছে তুলে ধরারও। বড় ব্রাত্য, বড় অবহেলিত তিনি আজ! এই উপন্যাস লেখার আগে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ত্রিবেণীর বাড়িতে বারবার গিয়েছি। তাঁর বর্তমান বংশধর শ্রী সুশান্ত ভট্টাচার্য তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের পূর্ণ সম্মান রেখে আতিথেয়তায় ও সহায়তায় সমৃদ্ধ করেছেন আমাকে। বিস্মিত হয়েছি এমন একজন অসামান্য প্রতিভাকে বাঙালি কী করে ভুলে গেল, সেই ভেবে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থই বলেছিলেন, ‘বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি’।

ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বসতবাড়ির ঠাকুরদালানে আমি ও বর্তমান বংশধর শ্রী সুশান্ত ভট্টাচার্য

এই প্রাসঙ্গিক থ্রিলার উপন্যাসে তাই ওঁর স্মৃতিতর্পণের আকাঙ্ক্ষার লোভ আমি ছাড়তে পারলাম না।

তাই ‘গ্লানির্ভবতি ভারত’ আমার দুটো ইচ্ছাই পূরণ করল বলা যায়। পাঠকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হল কিনা, তা বলবেন তাঁরাই। নির্দ্বিধায় জানাতে পারেন আমার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট www.authordebarati.com এ।

ভাল থাকুন। পৃথিবী দ্রুত সুস্থ হোক।

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ। আমাদের মধ্যে শুভচিন্তার উদয় হোক।

‘গ্লানির্ভবতি ভারত’ লিখতে আমি যে যে গ্রন্থ/গবেষণাপত্রের সহায়তা নিয়েছি, তার একটা প্রায় সম্পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হল :

১. Life in an Amish community, Katherine Wagner

২. An Amish Paradox : Diversity and Change in the World's Largest Amish Community, Charles Hurst and David McConnell

৩. Plain Diversity : Amish Cultures and Identities, Steven M. Nolt and Thomas J. Meyers

৪. New York Amish : Life in the Plain Communities of the Empire State, Karen M. Johnson-Weiner

৫. A History of the Amish, Steven Nolt

৬. Becoming Amish : A Family's Search for Faith, Community and Purpose, Jeff Smith

৭. The Riddle of the Amish Culture, Donald B. Kraybill

৮. The East India Company and Hindu Law in Early Colonial Bengal, Nandini Bhattacharyya Panda

৯. Kalki Avatar & Hazrat Muhammad, Pundit Ved Prakash Upadhyay

১০. কল্কী পুরাণ

১১. Hindu Gods and Goddesses, Bansal, Sunita Pan

১২. Hymns of the Rigveda, Griffith

১৩. রঘুবংশ (চতুর্দশসর্গ), ডঃ অনিল চন্দ্র বসু।

১৪. মহাভারতম, ডঃ অনিলচন্দ্র বসু।

১৫. ঈশোপনিষদ, যুধিষ্ঠির গোপ।

১৬. সূর্যসুক্ত

১৭. যজুর্বেদ

১৮. কৌষিতকী আরণ্যক

১৯. শতপথ ব্রাহ্মণ

২০. বৃহদারণ্যকোপনিষদ, অধ্যাপক দাস, ঘোষ, গোস্বামী।

২১. জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, উমাচরণ ভট্টাচার্য।

২২. মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ডঃ অলোককুমার চক্রবর্তী।

২৩. 'মধ্যযুগে বাঙ্গলা' : শ্রী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪. 'প্রাক-পলাশী বাংলা' (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭) : সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়।

২৫. ত্রিবেণীর সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও তাঁর প্রতিকৃতি, নারায়ণ দত্ত।

২৬. রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য।

২৭. নবদ্বীপ মহিমা, কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী।

২৮. মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়।

২৯. বৃহৎ বঙ্গ, দীনেশচন্দ্র সেন।

৩০. বাংলার ইতিহাস (নবাবী আমল), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩১. বাদশাহী আমল, বিনয় ঘোষ।

৩২. পলাশীর যুদ্ধ, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

৩৩. মুর্শিদাবাদ কাহিনী, নিখিলনাথ রায়।

৩৪. প্রাচীন কলকাতা পরিচয়, হরিহর শেঠ।

৩৫. সিরাজদ্দৌল্লা, অক্ষয় কুমার মৈত্র।

৩৬. কলিকাতা দর্পণ, রাধারমণ মিত্র।

৩৭. আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী (১৯৫৭)—অতুল সুর।

৩৮. ভগবদগীতা।

ইত্যাদি।